মুহাম্মাদ কুতুব

কেন এই অধঃপতন?

উম্মাহর অধঃপতনের ইতিহাস ও কারণ

ইফতেখার সিফাত
অনূদিত



tauhiderdak.com

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে
নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হউন ~

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

কেন এই অধঃপতন?

উম্মাহর অধঃপতনের ইতিহাস ও কারণ

tauhiderdak.com

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

বই | কেন এই অধঃপতন?
মূল | মুহাম্মাদ কুতুব
অনুবাদক | ইফতেখার সিফাত
প্রকাশক | রফিকুল ইসলাম

tauhiderdak.com

কেন এই অধঃপতন?

উম্মাহর অধঃপতনের ইতিহাস ও কারণ

মুহাম্মাদ কুতুব

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

tauhiderdak.com

কেন এই অধঃপতন?

মুহাম্মাদ কুতুব

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪৫ হিজরি / আগস্ট ২০২৩ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৫২৮ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

tauhiderdak.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

'মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন' এই শিরোনামে আমরা অনেক আলাপ-আলোচনা শুনি এবং দেখি। এটা আসলে আমাদের কাছে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে। এক হলো, মুসলিমরা অধঃপতিত অবস্থায় আছে। আর দ্বিতীয় হলো, তাদের এই অধঃপতন থেকে উত্তরণ হওয়া জরুরি। কিন্তু অধঃপতন থেকে উত্তরণ লাভের জন্য জরুরি হলো, অধঃপতনটাকে জানা এবং বোঝা। কীভাবে আমাদের অধঃপতন হলো, আমাদের ত্রুটি কোথায়, কারা আমাদের অধঃপতন কামনা করে, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা এবং সেই অনুযায়ী কাজের পরিকল্পনা সাজানো। বক্ষ্যমাণ বইটি পাঠককে এই বিষয়গুলোর উত্তর সম্পর্কে জানাবে।

লেখক মূলত বইটিতে আমাদের অধঃপতনের দুটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একটি দিক হলো, মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণভাবে মুসলিমরা কোন সব ভুল করেছে এবং নিজেদের কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে ত্যাগ করেছে। আরেকটি দিক হলো, এই অধঃপতনের ক্ষেত্রে বহিরাগত শত্রুরা কীভাবে কাজ করেছে এবং আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রগুলোকে টার্গেট করে ধ্বংস করেছে। মূলত যেকোনো অধঃপতনেরই এই দুটি দিক থাকে। যেকোনো কিছুর অধঃপতনকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে হলে উল্লেখিত দুটি দিককেই জানা ও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আর মুহাম্মাদ কুতুব ﷺ তাঁর বিখ্যাত বই 'ওয়াকিউনাল মুআসির' বইয়ে এই কাজটিই করেছেন। পাঠকের হাতে থাকা 'কেন এই অধঃপতন?' বইটি মূলত এরই সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত অনুবাদ।

এই বইটিকে বলা যায় লেখকের মাফাহিম ও জাহিলিয়াত বইদুটির সম্পূরক রচনা। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা সংক্ষেপণ ও পরিমার্জনের পন্থা অবলম্বন করেছি। অধঃপতনের আলোচনার পর ইসলামি বিপ্লব নিয়ে লেখক প্রায় ২০০ পেইজের মতো আলোচনা করেছেন। সেখানে বেশকিছু আলোচনার পুনরাবৃত্তি ও অপ্রাসঙ্গিকতা থাকার কারণে সেই অংশের অনুবাদ যুক্ত করিনি; বরং সেই অংশ থেকে করণীয় সম্পর্কে একটি সারাংশ বের করে কয়েক পেইজে সেটা আমরা নিজেদের ভাষায় যুক্ত করে দিয়েছি উপসংহার হিসেবে।

tauhiderdak.com

মুহাম্মাদ কুতুব হলেন সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম, আধুনিক দ্বীনহীন সভ্যতাকে জানতে এবং এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন গড়ে তুলতে যাদের পাঠ করা জরুরি। বলা যায়, তিনি এই সারির লিডিং লিস্টেই থাকবেন। কিছু দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও লেখকের ব্যাপারে অনুবাদক এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে থাকি।

মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বপ্রথম লেখকের জন্য দুআ করি। তিনি আখিরাতে লেখকের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন এবং মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

তারপর দুআ করি, বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমতকে আল্লাহ দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন এবং উম্মাহকে বইটির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত করুন। আমিন।

– ইফতেখার সিফাত

tauhiderdak.com

মুহাম্মাদ কুতুব হলেন সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে অন্যতম, আধুনিক দ্বীনহীন সভ্যতাকে জানতে এবং এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন গড়ে তুলতে যাদের পাঠ করা জরুরি। বলা যায়, তিনি এই সারির লিডিং লিস্টেই থাকবেন। কিছু দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও লেখকের ব্যাপারে অনুবাদক এই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে থাকি।

মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বপ্রথম লেখকের জন্য দুআ করি। তিনি আখিরাতে লেখকের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন এবং মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

তারপর দুআ করি, বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমতকে আল্লাহ দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন এবং উম্মাহকে বইটির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত করুন। আমিন।

- ইফতেখার সিফাত

tauhiderdak.com

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা ⁞ ০৯

সোনালি প্রজন্মের আদর্শ ⁞ ২১

মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি ⁞ ৪২

এক. ইমানের সততা, কুরআন-সুন্নাহ থেকে আন্তরিকভাবে আহরণ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একনিষ্ঠতা ⁞ ৪৪

দুই. সঠিক অর্থে এক উম্মাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা ⁞ ৬০

তিন. বাস্তব জীবনে ইসলামি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা ⁞ ৭৬

চার. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নৈতিকতা ⁞ ৯১

পাঁচ. প্রতিশ্রুতি পূরণ করা ⁞ ১০৩

ছয়. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ⁞ ১০৯

সাত. ইসলামি সভ্যতার জাগরণ ⁞ ১২৭

ইসলামি সভ্যতার স্বতন্ত্রতা ⁞ ১৩৫

অধঃপতনের গতিপথ ⁞ ১৪৩

যেখান থেকে সূচনা ⁞ ১৪৯

উমাইয়া শাসনামল ⁞ ১৪৯

আব্বাসি শাসনামল ⁞ ১৫৮

উসমানি শাসনামল ⁞ ১৮২

অধঃপতনের পদরেখা ⁞ ১৮৯

১. বিশ্বাসগত অধঃপতন ⁞ ১৮৯

২. জ্ঞান, সভ্যতা, অর্থনীতি, সামরিক, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক পতন ⁞ ১৯৭

৩. ক্রুসেড যুদ্ধ ও উপনিবেশ ⁞ ২০৬

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ⁞ ২১৬

tauhiderdak.com

শিক্ষাব্যবস্থা ⁞ ২১৭

ফরাসি হামলার ভূমিকা ⁞ ২১৯

মুহাম্মাদ আলির ভূমিকা ⁞ ২৬৬

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ও তাদের অনিষ্টতা সৃষ্টির মাধ্যমসমূহ ⁞ ২৩৮

এক. শিক্ষা-সিলেবাস ⁞ ২৪০

দুই. প্রচারমাধ্যম ও মিডিয়া ⁞ ২৫৭

তিন. নারী-স্বাধীনতার ইস্যু ⁞ ২৭০

চার. চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র ⁞ ৩০০

পাঁচ. রাজনৈতিক ক্ষেত্র ⁞ ৩০৯

সেক্যুলার নেতৃত্বের উত্থান ও ধর্মীয় নেতৃত্ব-শূন্যতা ⁞ ৩১৪

ইউরোপীয় সংবিধান ও মূলনীতি আমদানি ⁞ ৩২৮

সামরিক বিদ্রোহ ও সমাজতন্ত্রকে ইসলামের সাথে যুদ্ধে ব্যবহার করা ⁞ ৩৪০

উপসংহার ⁞ ৩৫৪

tauhiderdak.com

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের ভূমিকা

মুসলিম-বিশ্ব এখন ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সময় পার করছে। এই সময়টাকে আমরা ইহুদিদের দিগভ্রান্তির সময়ের সাথে তুলনা করতে পারি। পূর্বে মুসলিম-বিশ্ব বহু বিপদ-সংকটে পতিত হয়েছে; বরং কঠিন দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছে। কখনো মুসলিমরা তাদের ভূমির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে, কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা-হীনতায় ভুগেছে, আবার কখনো বাড়িঘর ও সম্পদশূন্য হয়েছে। তবে ইতিহাসে তারা কখনো বর্তমান সময়ের মতো ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হয়নি।

ইসলামের সূচনালগ্নে ইরতিদাদের ফিতনা ছিল নিঃসন্দেহে এক তীব্র আঘাত। যা নবগঠিত রাষ্ট্রকে অঙ্কুরেই ধ্বংসের উপক্রম করেছিল। কিন্তু আল্লাহর নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত কারোর মনে এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ জন্ম নেয়নি যে, বিজয় শুধুই মুসলিম-রাষ্ট্রের হবে, জাজিরাতুল আরবের মুরতাদদের নয়। কেননা, মুসলিমরা যে সত্যকে গ্রহণ করেছে, এর প্রতি ইমান, রবের সাথে সম্পর্কের গভীরতা এবং দ্বীনের প্রতি তাদের ইখলাস ছিল বাতিলের প্রতি মুরতাদদের বিশ্বাসের চেয়ে বহু গুণ বেশি। এ ছাড়া মুরতাদদের অবস্থানের পেছনে তাদের প্রবৃত্তি ও নফসের চাহিদা ব্যতীত কোনো সত্যিকার আদর্শ-মূল্যবোধ ছিল না।

অন্যদিকে মুরতাদদের সাথে যুদ্ধে সাহাবিদের উৎকণ্ঠা এবং আবু বকর ﵁-কে বিলম্বের পরামর্শ দেওয়া এ জন্য ছিল না যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করবেন কি না তা নিয়ে তাঁরা সন্দিহান ছিলেন; বরং তাঁরা বিলম্ব করতে চাচ্ছিলেন; যাতে যুদ্ধের জন্য পর্যাপ্ত সেনা সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু আবু বকর ﵁-এর মজবুত ইমান ও দ্বীনকে জমিনে বিজয়দানের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদার প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং আল্লাহর আদেশের বিরোধীদের ওপর নির্ধারিত শাস্তি প্রদান না করে ছেড়ে রাখতে অস্বীকার করা, এগুলো সাহাবায়ে কিরাম ﵃-এর অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে তাঁরা আবু বকর ﵁-এর পেছনে সারিবদ্ধ হন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন।

tauhiderdak.com

উসমান ﷺ-এর হত্যার ফিতনা এবং একে কেন্দ্র করে আলি ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ-এর মাঝে সংঘাত ছিল মুসলিমদের ও মুসলিম-রাষ্ট্রের জন্য চরম সংকট, যে রাষ্ট্র তখনও সূচনালগ্নেই ছিল এবং চতুষ্পার্শ্বের পুরো বিশ্বের শত্রুতা বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তখনকার ঘটনাচক্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে এর সমাপ্তি নিয়ে কারও সন্দেহ থাকবে না; কেননা, বিরোধ যত গভীর বা এর প্রভাবে মুসলিমসারিতে ফাটল সৃষ্টি হোক, মূল বিরোধ ছিল ইসলামকে জমিনে প্রতিষ্ঠা করা নিয়ে, স্বয়ং ইসলাম নিয়ে নয়। সেখানে এই প্রশ্ন ছিল না যে, ইসলাম কি মুসলিমদের জীবনাদর্শ হবে, না ভিন্ন কিছু। তেমনই সেই সময় অন্য কোনো জাতির মাঝে সত্যের কোনো অংশ ছিল না বা কোনো কাফির জাতির নিজেদের জীবনাদর্শের প্রতি মুমিনদের তাদের দ্বীনের প্রতি ইমানের তুলনায় অধিক বিশ্বাসী ছিল না। আর আল্লাহ তাআলার নীতি অনুযায়ী সৈন্যসংখ্যা, সরঞ্জাম ও যুদ্ধের পরিকল্পনার পূর্বে এটাই হচ্ছে মূল উপাদান, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জয় বা পরাজয় নির্ধারিত হয়। যদিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসবাব গ্রহণের আদেশ প্রদানের ভিত্তিতে এগুলো ফলাফলের পাল্লাকে প্রভাবিত করে এবং এগুলো চিরন্তন নীতির অংশ, তবে শুধু বস্তুগত আসবাব দ্বারা ফলাফল নির্ধারিত হয় না।

ক্রুসেড যুদ্ধ ও তাতারদের আক্রমণ ছিল মুসলিমদের জীবনে বিশাল এক আঘাত। তখন কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছে যে, এই হামলাগুলো পুরো মুসলিম-বিশ্বকে হয়তো পতন ঘটিয়ে ফেলবে এবং জমিনের বুক থেকে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু বাস্তব ফলাফল ছিল ভিন্ন, সর্বশেষ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য এসেছে। প্রথমে পরাজয় ও শেষে বিজয়, দুটোই আল্লাহর নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ, যার কখনো ব্যতিক্রম হয় না।

তখন মুসলিমদের অবস্থা ছিল অনেক খারাপ। তাদের মাঝে অপরাধ, বিদআত, ভ্রষ্টতা ও বিচ্ছিন্নতা চরম আকার ধারণ করেছিল। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের সাহায্য ও জমিনে তা প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত ছিল। তাই শত্রুবাহিনী মুসলিম-ভূমিতে আক্রমণ করে তাদের খিলাফতের পতন ঘটায়। কিন্তু ইসলামি আকিদার অগ্নিশিখা তখনও তাদের অন্তরে প্রজ্বলিত ছিল; যদিও তাতে অবহেলা, নেতিবাচকতা ও দুনিয়ার প্রবৃত্তির ধুলোর আস্তর পড়েছিল। কিন্তু যখনই যোগ্য নেতৃত্ব এসে সঠিক ইসলামে ফিরে আসার আহ্বানের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দিকে আনার চেষ্টা করেছেন, তখন তাদের ইমানের অগ্নি জ্বলে উঠেছে। অতঃপর এর ফলশ্রুতিতে বিজয় এসেছে।

tauhiderdak.com

যখন সালাহুদ্দিন এসে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুতির কারণে পরাজিত হয়েছ; তাই সঠিক পথে ফিরে আসা ব্যতীত কখনোই বিজয়ী হবে না'... যখন ইবনে তাইমিয়া এসে গোমরাহ ও ভ্রষ্টদের ভ্রান্তি থেকে আকিদা পরিশুদ্ধ করার দাওয়াহ দিয়েছেন... যখন কুতুজ ময়দানে এসে চিৎকার দিয়েছেন, 'ওয়া ইসলামাহ!' আর মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ জনতা তাদের অনুসরণ করে তাদের বিশ্বাস ও আচরণে আল্লাহর সাথে সততা রক্ষা করেছে, তখনই বিজয় এসেছে। মুসলিমরা তাদের চেয়ে বহু গুণ বেশি কাফির ও মুশরিকদের ওপর জয়ী হয়েছে।

আন্দালুসের বিপর্যয় ছিল মুসলিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ। যা তাদের বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য, পারস্পরিক সংঘাত, একে অপরের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার বাহিনীকে সাহায্য করা ও তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা এবং দুনিয়ার বৈধ-অবৈধ ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আপতিত হয়েছে।

আন্দালুস পরবর্তী সময়ে ইসলামের ছায়ায় ফিরে আসেনি, তবে সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়নি। কেননা, ঠিক যে সময় আন্দালুসে ইসলামের ছায়া মুছে গেছে, তখন সেখানে আরেক নতুন শাসনের উদয় হয়েছে। যারা একাধারে চার শতাব্দী যাবৎ মুসলিমদের শক্তি-শাসন রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এবং ক্রুসেড-বিশ্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভিয়েনা ও পিটার্সবার্গ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের হাতে ইউরোপ ও এশিয়ার লক্ষ-কোটি মানুষ মুসলিম হয়েছে।

কিন্তু মুসলিমদের বর্তমান বিপর্যয় পূর্বের সবগুলো থেকে কঠিন ও ভয়াবহ। আমার এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, এটাও একসময় কেটে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা আবারও মুসলিমদের দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তবে বর্তমানে আমাদেরকে এই বিপর্যয়ের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে হবে; যাতে বুঝতে পারি, এই বিপদ কেন পূর্বের সবগুলো থেকে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং সেই সাথে এটা থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে জানতে পারি। তখন আমরা মুক্তির উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব।

যখন ক্রুসেড যুদ্ধের প্রথম ধাপ শুরু হয়েছিল, যা প্রায় দুই শতাব্দী (১০৯৬-১২৯১) যাবৎ চলমান ছিল এবং যার পূর্বে-পরে তাতারদের হামলা হয়েছিল, তখন মুসলিমরা সঠিক ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায়-ভ্রান্তি, বিদআত ও আসবাব গ্রহণের অনীহা ইত্যাদি সমস্যায় নিমজ্জিত ছিল; কিন্তু মৌলিক ইসলাম নিয়ে তাদের অন্তরে কোনো প্রশ্ন ছিল না। ইসলামের আকিদা, জীবনবিধান ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে কোনো ভিন্নমত ছিল না; এমনকি যখন তারা ক্রুসেড ও তাতারদের সামনে পরাজিত হয়েছে, তা এ

tauhiderdak.com

ছিন্ন হয়ে গেছে। যা এই দুটোকে বিপরীত অবস্থানে নিয়ে গেছে। ফলে যে দুনিয়া চায়, সে আখিরাত পরিত্যাগ করে; আর যে আখিরাত চায়, সে (ভুল পদ্ধতিতে) দুনিয়া ত্যাগ করে। এবং দুটোর কোনো একটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

আর আল্লাহর জমিন আবাদ করার দায়িত্ব তখনই পরিত্যাগ করেছে, যখন আখিরাতের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করেছে। ফলে মানুষের ওপর দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, রোগবালাই জেঁকে বসেছে এবং তারা সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে পিছিয়ে গেছে। এসব থেকে ভয়ংকর বিষয় হলো, তারা এটা মনে করছে যে, এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনিবার্য তাকদির, যেখানে তাদের সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই।

এসব কিছু ছাড়াও মানুষের জীবন আধ্যাত্মিকতা-শূন্য হয়ে গেছে। পুরো জীবনটা এখন কিছু প্রথায় পরিণত হয়েছে, যা শুধু প্রথা হিসেবে রক্ষা করা হচ্ছে। এ জন্য নয় যে, এটা জীবন্ত এক জীবনাদর্শের অংশ। ফলে এখন ইবাদত হচ্ছে কিছু প্রথা, আচরণ হচ্ছে প্রথা, নারীর পর্দা হচ্ছে প্রথা, সম্ভ্রম রক্ষা হচ্ছে শুধুই প্রথা—যেখানে আল্লাহর ইবাদতের ব্যাপারে সচেতন অনুভূতি বা জীবনাদর্শের বুঝ বা অনুভূতি নেই।

তাই মুসলিমদের এহেন করুণ হালতে যখন নব্য ক্রুসেডহামলা হয়েছে, তখন তারা অধঃপতিত হয়েছে এবং ভ্রষ্টতার সামনে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে নব্য ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে মুসলিমদের বীরত্বের বহু ঘটনা সংরক্ষিত রয়েছে, যারা সতেরো শতক থেকে মুসলিম-ভূমিগুলোর ওপর আক্রমণ করে যাচ্ছে; চাই তা হোক উত্তর আফ্রিকাতে বা মধ্য আফ্রিকায় বা নীলের উপকণ্ঠে (মিশর ও সুদান) বা হিন্দ, মালাউ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন বা মধ্য এশিয়াতে, যেখানে রুশের ক্রুসেডশক্তি দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

কিন্তু এসব ছিল পরাজয় ও লাঞ্ছনার বীরত্ব, যারা আত্মসমর্পণের পূর্বে শেষ আঘাত করেছে মাত্র। কেননা, ততদিনে মুসলিম-সমাজের মানুষের সঠিক আকিদা-বিশ্বাস মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেছে। তাদের সামনে পরাজয় ও আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না।

ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়, যাদের সাথে মুসলিমদের সভ্যতার অধঃপতনের সময় সাক্ষাৎ হয়েছে। যে মিশ্রণের ফলে মুসলিমদের আত্মিক

tauhiderdak.com

পরাজয় ঘটেছে এবং তারা পশ্চিমাদের চিন্তাধারা ও শাসনব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে তাদের মতোই দ্বীন, আখলাক ও ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেছে।

সভ্যতার বিভাজনের ব্যাপারে এই কথাগুলো সত্য। তবে যদি এ ধারণা করা হয় যে, এটাই মুসলিমদের আত্মিক পরাজয় ও পশ্চিমাদের সামনে ভেঙে পড়ার মূল কারণ, তাহলে তা বাস্তব সত্যের কাছাকাছি তো নয়ই; বরং তা হবে চরম পর্যায়ের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। কেননা, এই চিন্তাগুলো মুসলিমদের পরাজয়ের সঠিক কারণকে ঢেকে ফেলে, তেমনই মুক্তির সঠিক মাধ্যম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

মুসলিমরা প্রথম যুগে বেদুইন গ্রাম্য জীবনযাপন করত, যাদের কাছে তাদের পার্শ্ববর্তী সভ্যতাগুলোর মতো বস্তুগত বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত মাধ্যম ও উপাদান ছিল না। তাই যদি তারা বস্তুগত ও বিজ্ঞানের উন্নত সভ্যতা প্রত্যাশা করত, তাহলে তাদের জন্য আবশ্যক ছিল ডানের ও বামের প্রাচীন পারস্য ও রোম থেকে তা গ্রহণ করা।

তারা বাস্তবেও এমনটাই করেছে; কিন্তু কখনো তাদের মাথা ভিন্ন জাতির সামনে নত করেনি। কখনোই কাফিরদের সভ্যতার প্রতি মুগ্ধতা অনুভব করেনি; বরং তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ। কারণ, তারা ছিল মুমিন।

তাদের পার্শ্ববর্তী কাফির ও পৌত্তলিকদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের প্রবল প্রয়োজন ছিল; কিন্তু এই প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা কখনো কাফিরদের সামনে নিজেদের তুচ্ছ মনে করেনি। তা এ জন্য নয় যে, কাফিররা তাদের থেকে নিকৃষ্ট; বরং তারা এটা জানত এবং অনুভব করত যে, সম্মান শুধু তাদেরই প্রাপ্য; কেননা, সকল সম্মান শুধুই আল্লাহ তাআলা, রাসুল ও মুমিনদের জন্য। কাফির ও পৌত্তলিকদের কোনো সম্মান নেই; যদিও তারা দুনিয়ার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

যখন তারা অন্যদের থেকে কিছু গ্রহণ করেছে, তখন গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ইমানের ছোঁয়ায় মর্যাদার উচ্চ অবস্থান ছিল স্পষ্ট। যা দুটি মূল বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত হয়েছে :

প্রথমত, তাদের থেকে সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান গ্রহণের প্রয়োজনের প্রবল চাপেও তাদের অন্তর কখনো শত্রুদের সামনে পরাজিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, তারা শত্রুদের থেকে যা পেয়েছে, সব গ্রহণ করেনি; বরং তারা বুঝেশুনে শুধু যেগুলো প্রয়োজন মনে হয়েছে, সেগুলোই গ্রহণ করেছে এবং এটা নিশ্চিত করেছে, যেন সেখানে ইসলামের আকিদা-বিধানের বিরোধী কিছু না থাকে। আর যেগুলোকে

tauhiderdak.com

তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বা ইসলামের চিন্তা-বিশ্বাসের বিপরীত মনে হয়েছে, তা সব ত্যাগ করেছে। যার স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, তারা গ্রিকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে; কিন্তু তাদের প্রসিদ্ধ রূপকথার গল্পগুলো গ্রহণ করেনি। কেননা, সেগুলোয় তারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত পৌত্তলিক জাহিলিয়াত দেখতে পেয়েছে, যা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত নয়; এগুলো বরং ধ্বংস করাই কাম্য।

কিন্তু শেষ বা আধুনিক সময়ে তাদের থেকে আহরণের পুরো পদ্ধতিই পালটে গেছে। এখানে মূল সমস্যা দাতা ও গ্রহীতার মাঝে সভ্যতার বিরোধ নিয়ে নয়, যা প্রথম দৃষ্টিতে সাধারণভাবে মনে হয়; বরং এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে কাফিরদের থেকে সভ্যতার মাধ্যম গ্রহণের পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে মূল সমস্যা।

প্রথম যুগে মুসলিমরা ছিল মর্যাদাবান; যদিও তারা গ্রহণ করেছে। কেননা, ইমানের দ্বারা সম্মানিত হয়ে তাদের জীবন ও অবস্থানকে উচ্চাসনে সমাসীন করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে এসে মুসলিমদের আকিদা নষ্ট হয়ে ধূলির নিচে চাপা পড়ে গেছে। ফলে সেখানে কোনো সম্মান বাকি থাকেনি; বরং পরাজয় ও অধঃপতন ঘটেছে। তারা পশ্চিমাদের থেকে বাছবিচার ছাড়া সব গ্রহণ করেছে। কোনটা উপকারী বা মন্দ এবং কোনটা ইসলামের পক্ষে বা বিরোধী, তা যাচাই করা ব্যতীতই। কেননা, ইসলাম তখন এসব আধুনিক মুসলিমের মূল লক্ষ্য ছিল না। তাদের কাছে এর কোনো বিশেষ এমন অবস্থান ছিল না যে, ইসলাম থেকে তারা সঠিক বিশ্বাস গ্রহণ করে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে।

এখন যুগের পরিবর্তন হচ্ছে। মুসলিমদের জীবন থেকে শেষ শতাব্দীর বীভৎস চেহারা সরে যেতে শুরু করেছে এবং ইসলামের নতুন বসন্তের আগমন ঘটছে। মানুষরা বিশেষ করে শিক্ষিত যুবকরা ইসলামে ফিরতে শুরু করছে। তারা স্বচ্ছ সমস্যামুক্ত ইসলাম পালনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশ্বের যত জায়গায় ইসলাম কখনো শাসন করেছে, সেখানে ইসলামি পুনর্জাগরণ হচ্ছে। যুবকরা এমন দিনের জন্য অপেক্ষা করছে, যেদিন ইসলাম বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হবে, যেদিন মুসলিমরা পশ্চাৎপদতা থেকে ফিরে এসে সত্যিকার ইসলামকে জমিনে স্থাপন করবে। যা হবে আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদার বাস্তবায়ন—

tauhiderdak.com

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানাবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলিফা বানিয়েছিলেন; তিনি তাদের জন্য যে (ইসলাম) দ্বীনকে পছন্দ করেছেন, তা তাদের জন্য অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং ভয়ের পর এর পরিবর্তে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।'[৪]

চলার পথে অনেক বাধা আসে, যা অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে; কিন্তু এগিয়ে যাওয়াকে কখনো থামিয়ে দিতে পারে না।

বর্তমানে একদিকে মানুষ সঠিক ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং চিন্তাধারা ও আচরণে দ্বীনের বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। অন্যদিকে চিন্তাযুদ্ধের দ্বারা মানুষকে, বিশেষত যুবকদেরকে সামগ্রিক ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পশ্চিমাদের অনুসরণের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। সব চারিত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান করা হচ্ছে। এ ছাড়া ইসলামের ওপর বহু আঘাত আসছে, সর্বত্র দ্বীনের দায়ি ও মুজাহিদদের দমন করা হচ্ছে। তাদের পথে সর্বাত্মকভাবে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এসব সত্ত্বেও বহু সুসংবাদ রয়েছে, যেগুলো আমার মতে এই বাধাগুলো থেকেও বড়ো। কেননা, মুসলিম-বিশ্বের সর্বত্র আজ যে ইসলামি নবজাগরণ হচ্ছে, তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা, যার বহু নিদর্শন রয়েছে। এটা একদিকে জায়ানবাদী ক্রুসেডারদের প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ মুসলিম উম্মাহকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার বহু প্রচেষ্টার পর হচ্ছে, অন্যদিকে মানবজাতি আজ ঐতিহাসিক ক্ষণে দণ্ডায়মান। তারা অন্তঃসারশূন্য বস্তুবাদী সভ্যতা থেকে হতাশ হয়ে নতুন মুক্তির পথের সন্ধান করছে।

সুতরাং মুসলিমরা ততদিন পর্যন্ত তাদের বিপর্যয় থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের ওপর থেকে পরাধীনতার শিকল ছিন্ন হবে না এবং তারা বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে

৪. সুরা আন-নুর, আয়াত নং ৫৫।

tauhiderdak.com

বিশ্ব-শাসনের মসনদে ফিরে আসতে পারবে না, যতদিন না তারা আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত দ্বীনের দিকে সঠিক ও সততার সাথে ফিরে আসবে। তেমনই মানবজাতি তাদের সমস্যা ও জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত হতে পারবে না আল্লাহর দেখানো পন্থা গ্রহণ করা ব্যতীত, যা আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের জন্য নাজিল করেছেন।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'আমি স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমার রাসুলদের পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড দিয়েছি; যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।'[৫]

কিন্তু বিষয়টা ফুলবিছানো পথে সহজে আনন্দের সাথে হয়ে যাবে না; বরং এটা এমন কঠিন যাত্রা, যেখানে পথ কাঁটা, অশ্রু, রক্ত ও শাস্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। যেখানে মুসলিমরা ইসলামের সকল শত্রুর বিরুদ্ধে, তাদের সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে; যতদিন না ইসলামের দ্বিতীয় অপরিচিত (গরিব) যুগ শেষ হয়ে আবার জমিনে প্রতিষ্ঠিত হয়—যেমনটা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে, তা আবারও শুরুর মতো অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে; তাই গুরাবাদের (অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।'[৬]

فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي

'অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, যারা আমার পরে মানুষ আমার যেসব সুন্নাহকে নষ্ট করেছে, তা সংশোধন করবে।'[৭]

এই কিতাবে আমরা ইসলামের প্রথম সোনালি যুগ থেকে বর্তমান খড়কুটোয় পরিণত হওয়া পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করব। যে ব্যাপারে হাদিসে এসেছে,

.....

৫. সুরা আল-হাদিদ, আয়াত নং ২৫।

৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪৫।

৭. সুনানুত তিরমিজি, হাদিস নং ২৬৩০।

tauhiderdak.com

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ،...

'খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্রিত হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে।' একজন বলল, 'সেদিন কি আমাদের সংখ্যায় কম থাকার কারণে এরূপ হবে?' তিনি বললেন, 'বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটার ন্যায়।...'[৮]

আমি এখানে ইসলামকে বাস্তব জমিনে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকারী যুবকদের কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কেন এই পথ দীর্ঘ হয়েছে? কেন বিজয় আসতে বিলম্ব হচ্ছে? দ্বীনের দাওয়াতের মানহাজ কী? সঠিক পথ কোনটা?

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ

'আমি শুধু চাই আমার সাধ্যানুযায়ী সংস্কার করতে । (তবে) আমার সাফল্য কেবল আল্লাহর সাহায্যেই আসতে পারে।'[৯]

বক্ষ্যমাণ বইয়ে যা কিছু সঠিক, সেগুলো শুধুই আল্লাহর তাওফিকে এসেছে। আর যেখানে ঘাটতি রয়েছে, আমি মনে করি আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, বাকি আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান চাই। আল্লাহর কাছে দুআ করি, যাতে তিনি ইসলামের জন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তিদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

- মুহাম্মাদ কুতুব

.....

৮. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং ৪২৯৭।

৯. সুরা হুদ, আয়াত নং ৮৮।

tauhiderdak.com

tauhiderdak.com

সোনালি প্রজন্মের আদর্শ

যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (خَيْرُكُمْ قَرْنِي) 'তোমাদের মধ্যে আমার প্রজন্মই সর্বোত্তম।'[১০]

যারা আল্লাহ তাআলার এই বাণীর পূর্ণরূপে উপযুক্ত—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

> 'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'[১১]

তারা ছিল এমন প্রজন্ম, যেখানে আদর্শ ও বাস্তবতার সম্মিলন ঘটেছে। ফলে ইসলামের আদর্শগুলো বাস্তবে প্রয়োগ হয়েছে এবং মানুষের বাস্তবতা দৃষ্টান্তের স্তরে পৌঁছে গেছে। কেননা, বাস্তব আদর্শ বা আদর্শের বাস্তবতা এই দ্বীনের মূল বৈশিষ্ট্য।

এই দ্বীন এমন কোনো রুহানি আদর্শ পেশ করে না, যা বাস্তবায়ন করা কঠিন। যেখানে মানুষের প্রয়োজন ও বস্তুগত অবস্থানকে উপেক্ষা করে এবং মানুষকে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে আকাশে ঝুলিয়ে রাখে—যেমনটা হিন্দু, বৌদ্ধ ও পাদরিরা করে থাকে। আবার অন্যদিকে শুধু শারীরিক ও দুনিয়াবি বিষয়ে মগ্ন রেখে মানুষকে এসব প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ করে ফেলে না; যার ফলে সে সেখানে আটকে গিয়ে উত্তম আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হবে; বরং এই দ্বীন একই সাথে দুই পার্শ্বকেই ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যতার সাথে গ্রহণ করে। যার ফলে তার মধ্যে এমন আদর্শ ফুটে ওঠে, যা বাস্তবতাকে অবহেলা করে না এবং এমন বাস্তবতা গ্রহণ করে, যেখানে আদর্শকে ত্যাগ করা হয় না। যার সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটেছে ইতিহাসের একমাত্র অদ্বিতীয় সেই সোনালি যুগে।

.....

১০. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ২৬৫১।

১১. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

সেই প্রজন্মের মানুষগুলোর ব্যাপারে জানা আমাদের জন্য অতীব জরুরি; যেন বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের অবস্থান জানতে পারি এবং সেই প্রজন্মের সাথে তুলনা করে ইসলাম থেকে আমাদের দূরে বা নিকটে থাকাটা পরিমাপ করতে পারি।

তবে সেই মহান প্রজন্মের উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো জানার পূর্বে আমাদের সেসব উপাদানের ব্যাপারে জানতে হবে, যেগুলো তাদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছে। যার ফলে তারা ইতিহাসে সেই উচ্চাসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছে।

আরব ছিল শতধা বিক্ষিপ্ত, যারা কোনো বিষয়েই একমত হতো না; অথচ তাদের মাঝে ঐক্যের সকল উপাদান মজুত ছিল—যেমন এক ভূমি, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, একই ইতিহাস, একক স্বার্থ। জাহিলি সমাজবিজ্ঞান মতে, এগুলোই একটি জাতি গড়ে তোলে। অথচ এসব উপাদান নিয়ে শত শত বছর পার হওয়ার পরেও সেখানে কোনো শক্তিশালী জাতি জন্ম নেয়নি; বরং তারা ছিল যুদ্ধবাজ গোত্রে বিভক্ত, যারা লড়াই ও প্রতিশোধ নিয়েই জীবন পার করত। এ ছাড়া জাহিলিয়াতই তাদের নিঃশেষ করে দিচ্ছিল।

সেখান থেকে ইসলাম এসে তাদের উদ্ধার করেছে। শুধু ব্যক্তি বা গোত্র হিসেবে নয়; বরং এমন এক উম্মাহ হিসেবে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলাই ইতিহাসের সর্বোত্তম জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

> ‘তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।’[১২]

কিন্তু কীভাবে এ মহান জাতি গঠিত হয়েছে, কোন উপাদানগুলো তাদের ওপর প্রভাব ফেলেছে, তা আমাদের বুঝতে হবে। এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের মূল গঠন সেটাই ছিল, যা এই মহা ঘটনার পূর্বে একই ভূমিতে কয়েক শতাব্দী যাবৎ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কোনো একটা জিনিস তাদের মধ্যে জাদুর মতো কাজ করেছে; যার ফলে এই ব্যক্তিদের থেকে মাত্র কয়েক বছরে অদ্বিতীয় এক জাতি বের হয়ে এসেছে। তাহলে সেই আশ্চর্যজনক জিনিসটা কী, যা এই মহান প্রজন্মকে গড়ে তুলেছে?

১২. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

মৌলিকভাবে নিঃসন্দেহে এটা ছিল কুরআন, সেই মহান কিতাব, যা মানবজাতিকে রবের হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য নাজিল হয়েছে,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

'নিশ্চয়ই এই কুরআন সর্বাধিক সঠিক পথ দেখায়।'[১৩]

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

'এই কুরআন তো আমার কাছে মূল গ্রন্থে (লাওহে মাহফুজে) সংরক্ষিত আছে। নিশ্চয়ই তা সুমহান, প্রজ্ঞাপূর্ণ।'[১৪]

কুরআন মানুষের অন্তরে কী প্রভাব ফেলে? এটা কি মনুষ্যত্বকে পরিবর্তন করে ভিন্ন এক জীবে পরিণত করে? কখনোই না; বরং তা মানুষের জন্যই নাজিল হয়েছে; যাতে মানুষ তাদের ফিতরাতের দিকে ফিরে, যা দিয়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আল্লাহর স্বাভাবিক রীতি (মেনে চলো), যে অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'[১৫]

ধরুন, লোহাকে যদি চুম্বকের সাথে ঘর্ষণ করা হয়, তখন এর মূল উপাদান পালটে যায় না; বরং এর পরমাণুর গঠনকে বিন্যাস করে এর মধ্যে তড়িৎ চুম্বকীয় নতুন শক্তি সৃষ্টি হয়, যা পূর্বে ছিল না। তেমনই আল্লাহর কিতাবে নাজিলকৃত দ্বীন মানুষের অন্তরে একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে এর গঠনকে বিন্যাস করে। ফলে পূর্বের পথভ্রষ্টতা থেকে সুগঠিত এক শক্তিতে পরিণত হয়।

তবে এই কিতাবের কোন বিষয়টা এই শক্তির উৎস, যা পথভ্রষ্ট মানুষকে পরিশুদ্ধ মানুষে পরিণত করে? এটা কি ভাষার অলৌকিকত্ব? না বর্ণনার জাদু? বা অর্থের স্পষ্টতা? এটা কি আখিরাতের বর্ণনা ও অবস্থার বিবরণ, যা অন্তরকে প্রকম্পিত করে?

---

১৩. সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং ৯।

১৪. সূরা আজ-জুখরুফ, আয়াত নং ৪।

১৫. সূরা আর-রুম, আয়াত নং ৩০।

tauhiderdak.com

না এর আইন-বিধান, নির্দেশনা ও নীতিমালা? এটা কি এর ঘটনাবলি, দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা? না সেখানের বারংবার আল্লাহর মর্যাদা ও আলৌকিক ক্ষমতার আলোচনা? নিঃসন্দেহে এ সবগুলোই। কেননা, কুরআনের প্রতিটা শব্দের উপযুক্ত নিদর্শন ও প্রভাব রয়েছে।

তবে আমরা ভুল করব না যদি বলি, কুরআনের সবচেয়ে বিস্তৃত আলোচিত বিষয় হচ্ছে উলুহিয়্যাহ বা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আলোচনা। যদিও প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে, কুরআনে—বিশেষত মাক্কি সুরায়—এই বিষয়টাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, এখানে মুশরিকদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য মিথ্যা ইলাহ বিশ্বাস করত। তাই এটাই উচিত যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি গুরুত্বারোপ করা হবে; যাতে তা মুশরিকদের বিশ্বাসে পরিণত হয়।

কিন্তু কুরআনে মাদানি সুরাগুলোতেও এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়া, বিশেষ করে মুমিনদের প্রতি সম্বোধিত বাণীতে—যারা ইমান এনেছে এবং তাদের অন্তরে ইমান স্থির হয়েছে; এমনকি তারা মুসলিম জাতি ও ইসলামি রাষ্ট্রও গঠন করেছে এবং মুসলিম বাহিনী গড়ে তুলেছে, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে—এসব কিছু অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, তখনও এই বিষয়ের সমপরিমাণ গুরুত্ব অবশিষ্ট ছিল; যদিও সম্বোধিত ব্যক্তিরা মুমিন। তখন এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সম্বোধিত ব্যক্তিরা কুরআনকে অস্বীকার করছে; বরং এটা হচ্ছে মানব অন্তরের চাবি, যা দ্বারা কল্যাণের সকল দরজা খুলে যায়। তার মধ্যে কল্যাণ জন্ম নেয়। সে কল্যাণের ওপর গড়ে ওঠে। তার থেকে কল্যাণকর বিষয় বের করে আনে। অন্তরের জন্য এমন আর কোনো চাবি নেই, যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সমকক্ষ হবে।

অন্তর যখন অস্বীকারকারী হয়, তখন এই বিষয় দ্বারা সম্বোধন করা হয়; যাতে তা সত্য ও কল্যাণের জন্য উন্মুক্ত হয়। আর যখন অন্তর মুমিন হয়, তখনও সম্বোধন করা হয়; যাতে ইমান গভীরভাবে প্রোথিত হয়। কেননা, এটাই একমাত্র পাথেয়, যা ছাড়া ভিন্ন কোনো পাথেয় নেই। এই আয়াতের দিকে লক্ষ করুন—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং তিনি যে কিতাব তাঁর রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন, এর প্রতি ইমান আনো।'[১৬]

১৬. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ১৩৬।

tauhiderdak.com

এখানে মুমিনদেরই ইমানের আদেশ করা হচ্ছে! অথচ তারা সেসব বিষয়ে ইমানদার, যা দ্বারা ইমান আর্জিত হয়! এর কারণ, যাতে তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের অন্তরের ইমানের প্রতি সতর্ক থাকে।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ওপর ইমান সেসব মুশরিকের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করেছে; ফলে তাদের থেকে নতুন এক জাতির জন্ম হয়েছে। অতঃপর তা মুমিনদের অন্তরে প্রভাব ফেলেছে; ফলে তারা অতুলনীয় প্রজন্মে পরিণত হয়েছে, যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে।'[১৭]

সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে অন্তরের চাবি। অন্তর যখন সঠিক দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর নুরের হিদায়াত লাভ করে, তখন এটা দ্বারা পথ খুলে যায়। কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে গোলাম। যেখানে শুধু ইবাদতের দিক পরিবর্তন হয়। আর তার প্রভুর প্রকৃতি অনুযায়ী তার জীবনপদ্ধতি পরিবর্তিত হয়।

যখন আল্লাহ তাআলা মাবুদ হবে, তখন তার জীবন আল্লাহ তাআলার পথে পরিচালিত হবে, যেখানে হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে। আর যখন কারও মাবুদ অন্য কিছু হবে, তখন তার জীবনপদ্ধতি সেটার চাহিদামাফিক হবে; চাই তা রাখঢাক ছাড়া সরাসরি প্রবৃত্তি হোক বা এমন প্রবৃত্তি, যা বিভিন্ন স্লোগান, শিরোনাম ও পর্দা দ্বারা আবৃত। তবে ভিন্ন ভিন্ন সুরতের সকল জাহিলিয়াতই মূল উৎসে এক, তা হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ। হয়তো তা কোনো একক ব্যক্তির চাহিদা বা কিছু মানুষের সমষ্টির চাহিদা বা সকল মানুষের সামষ্টিক চাহিদা—সবগুলো দিনশেষে হাওয়া বা মনের চাহিদা ও প্রবৃত্তি।

একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত জীবনবিধানই মানুষের অন্তর ও কার্যক্রমকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। কেননা, তা এমন দয়ালু মহাজ্ঞানী সত্তার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাদের কল্যাণের বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত। যাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, যাঁর কাছ থেকে কিছুই গোপন নয়। তিনি মানুষের সেসব কাজের ফল সম্পর্কে জানেন, যা বহু বছর পরে

১৭. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

প্রকাশিত হয়; অথচ হয়তো মানুষটি তার জীবদ্দশায় তা জানতে পারবে না। এই দ্বীন এমন ন্যায়বান শাসকের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত, যাঁর ফায়সালা কখনো প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী, যাঁর হুকুমে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রয়োজন প্রভাব ফেলে না। এসব ছাড়াও তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি একমাত্র মানুষের জন্য জীবনবিধান প্রণয়নের অধিকারী; কেননা, তিনি তাদের ও সমগ্র জগতের স্রষ্টা। তিনি যেহেতু সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনিই আদেশ-বিধানের কর্তা।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تبارك اللهُ ربُّ العالمين

'জেনে রাখো, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। আল্লাহ মহিমান্বিত, যিনি সারা জাহানের পালনকর্তা।'[১৮]

মানুষ আল্লাহর পথে স্থির হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে সততা ও ইয়াকিনের সাথে জানবে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই। সে নিজেকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করবে; যখন বিশ্বাস করবে, তিনি মহা শক্তিধর রিজিকদাতা। তিনি উপকার ও ক্ষতির মালিক। তিনি জীবন ও মৃত্যুদাতা। তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের পরিচালক। শুধু তাঁর ইচ্ছাই এখানে বাস্তবায়িত হয়। তিনি ছাড়া অন্যকিছু বাস্তবতার কোনো কিছুরই অধিকারী নয়। তারা বাহ্যত যেসব কিছুর অধিকারী, সেগুলো শুধুই আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির বলে।

মানুষ যখন এসব মেনে নেবে, তখনই আত্মসমর্পণ করবে। আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। তাঁর ইচ্ছা ও তাকদির গ্রহণ করবে। তাঁর আদেশ ও নিষেধ মান্য করবে। তাঁর দ্বীনকে জীবনের পথ-পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করবে।

তবে এই দ্বীন জমিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মানুষের তা প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহ বা নিজেদের এর সামনে সঁপে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকদির এটাই যে, সকল মানুষ একই জাতিতে একত্রিত হবে না।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ - إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

'আপনার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি সব মানুষকে অবশ্যই এক জাতি করতে পারতেন; কিন্তু তাতেও তারা মতভেদ করতেই থাকবে। তবে

১৮. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ৫৪।

tauhiderdak.com

যাদেরকে আপনার প্রভু অনুগ্রহ করেন, তাদের কথা ভিন্ন। এ জন্যই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।'[১৯]

এখানে এমন অনেকে থাকবে, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ওপর ঈমান আনবে না। একে অপছন্দ করবে, দ্বীন ও দ্বীনের ধারকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং এর জীবনবিধানকে বাধা দেবে। তাই জমিনের বুকে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হলো, এই কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাধ্যমে কাফিরদের সাথে জিহাদ করা, যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে অপছন্দ করে।

আল্লাহর দ্বীন জমিনে প্রতিষ্ঠার জিহাদে মানুষ বিপদের সম্মুখীন হবে, মৃত্যুর মুখোমুখি হবে, দুনিয়ার উপভোগ থেকে বঞ্চিত হবে; তাই মানব অন্তর এই জিহাদের ভয়াবহতা সহ্য করা ও বিভিন্ন বিপদসংকুল পথে প্রবেশের জন্য আবারও বিশ্বাস করা প্রয়োজন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই জীবন-মৃত্যুদাতা, তিনি উপকার বা ক্ষতির মালিক, তিনিই রিজিক হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। অন্যথায় এ পথের প্রথম ধাক্কায় তার পা পিছলে যাবে। বিপদের এক মুহূর্তেই তার অন্তরের অভ্যন্তরীণ ইমান নড়ে যাবে যে, আল্লাহ তাআলাই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাকদির পরিবর্তন করেন এবং তিনিই কল্যাণ বা মন্দ বা জীবন বা মৃত্যু বা রিজিক বৃদ্ধি ও হ্রাস নির্ধারণ করেন। সঠিক পথ থেকে সে বিচ্যুত হবে এবং ভ্রষ্টতায় পতিত হবে। তবে যাকে আল্লাহ আপন দয়ায় রক্ষা করেন, তার ইমান স্থির হয় এবং নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে যায়।

তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ই হচ্ছে জিহাদের আসল প্রস্তুতি ও ইদাদ, যেমন পূর্বে তা ছিল ইসলাম ও আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণের মূল ভিত্তি।

এমনকি যুদ্ধবিহীন সন্ধির সময়ে, প্রশান্তি ও আরামের মাঝেও কিছু বোঝা মানুষের অন্তরকে সঠিক পথে অবিচলতা থেকে বাধাগ্রস্ত করে। সেগুলো হলো কামনাবাসনার বোঝা, যা মানুষের কাছে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'নারী, সন্তানাদি, স্বর্ণ-রৌপ্যের অঢেল সম্পদ, ছাপযুক্ত (সুন্দর) ঘোড়া, গবাদিপশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কাম্যবস্তুর আকর্ষণ মানুষের জন্য

১৯. সুরা হুদ, আয়াত নং ১১৮-১১৯।

tauhiderdak.com

মনোহর করা হয়েছে। এসব হলো পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী।'[২০]

মানুষের অন্তর এসব আকর্ষণ ও প্রলোভনের চাপের সামনে টিকে থাকতে পারবে না, যদি না ইয়াকিনের সাথে ইমান আনে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আর এই দুনিয়াই জীবনপথের সামাপ্তি নয়।

আল্লাহর প্রতি ইমান যখন মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়, তখন সেখানে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি তৈরি হয়, যা তাকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে উপযুক্ত করে তোলে। সে যখন এই বিশ্বাস করে যে, এই দুনিয়াই সবকিছুর সমাপ্তি নয়; বরং তাকে আবারও পুনরুত্থিত করা হবে, হিসাব-নিকাশ করা হবে, সুখ বা শাস্তি দেওয়া হবে—তখন এটাই তার জীবনের সব নীতি-ভারসাম্য, মূল্যবোধ ও ধরন পরিবর্তন করে ফেলে। ফলে তখন দুনিয়ার আনন্দ-উপভোগ তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য থাকে না এবং সে দুনিয়া নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকে না।

অন্যদিকে জাহিলিয়াতের ক্ষেত্রে ঠিক এমন ঘটনাই ঘটে। মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে, এই দুনিয়াই তার জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের একমাত্র সুযোগ, প্রতিটা দিন তার থেকে চলে যাচ্ছে, যা আর ফিরে আসছে না, তখন তার কাছে 'বাস্তবসম্মত' যুক্তি এটাই মনে হয় যে, এই সুযোগ চলে যাওয়ার পূর্বে এই সংক্ষিপ্ত জীবনে যত সম্ভব আনন্দ ভোগ করে নিতে হবে। তখন তার কাছে হালাল-হারামের কোনো মূল্য থাকে না; বরং প্রাপ্ত সুযোগ যেকোনোভাবে ভোগ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ফলে সে পশুর মতো ভোগ ও পানাহারে লিপ্ত হয়ে যায়।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

'যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো খেতে থাকে। তাই জাহান্নামই তাদের ঠিকানা।'[২১]

কিন্তু যখন সে পুনরুত্থান ও প্রতিদান, চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শাস্তির প্রতি ইমান আনবে—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا - وَالَّذِينَ آمَنُوا

২০. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৪।

২১. সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং ১২।

tauhiderdak.com

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

'যারা আমার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করবে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আগুনে পোড়াব। যখনই তাদের চামড়াগুলো দগ্ধ হবে, তখনই আমি অন্য চামড়া দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেবো; যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আমি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ। এবং আমি তাদেরকে নিবিড় ছায়ায় প্রবেশ করাব।'[২২]

তখন তার পক্ষে আনন্দ-উপভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি ব্যতীতই আল্লাহ তাআলা-প্রদত্ত সীমায় অটল থাকা সহজ হবে। কেননা, তখন তার এটা জানা থাকবে যে, দুনিয়াতে তার যত চাহিদা ও ভোগের বিষয় আল্লাহর আনুগত্যের কারণে সে ত্যাগ করছে, সেগুলো একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে না; বরং সে এই ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রতিদান প্রত্যাশা করছে; ফলে এর পরিবর্তে জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভ করবে। তখন সে হিসেবে লাভবান হবে এবং তার অন্তর আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়ার এই তুচ্ছ চাহিদা ত্যাগের ফলে আফসোস করবে না। অন্যদিকে প্রবৃত্তির পিছে ছোটার ফলে ভয়াবহ শাস্তির কল্পনায় সে নিশ্চিত হবে যে, এই চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকাই তার জন্য লাভজনক চুক্তি। পশুর মতো ভোগবিলাসে মত্ত থাকা কোনোভাবেই উচিত নয়। আর এ থেকেই তার মাঝে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি শক্তিশালী হবে, যা আল্লাহর ওপর ইমান থেকে অর্জিত হয়।

আর তাই জমিনে মানবজাতির জন্য জীবনবিধান নিয়ে প্রণীত কিতাবের পুরো অংশজুড়েই আল্লাহ ও আখিরাতের ইমান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনে যত নির্দেশনা, বিধান ও আদেশ বর্ণিত হয়েছে, সব আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ইমানের সাথে সম্পৃক্ত। যে দুটো এই কিতাবের মূল দুটি আলোচ্য বিষয়।

এটা আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিষয়গুলো ও মানবমনে এগুলোর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান নয়। আমি এই বিষয়ে আলাদা পুস্তক রচনা করেছি, সেখানে দেখুন।

.....

২২. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ৫৬-৫৭।

tauhiderdak.com

তবে আমি এখানে দৃষ্টান্ত পেশ করা ব্যতীত সেই মহান প্রজন্মের গড়ে ওঠার পেছনের উপাদানগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব; যাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে যত নির্দেশনা, ইঙ্গিত, আইন-বিধান রয়েছে, সেগুলোই ছিল ইতিহাসের সেই সোনালি প্রজন্মের অন্তরকে গড়ে তোলার সবচেয়ে বড়ো ও মহা উপাদান।

যখন আমরা কুরআনের আলোচনা করব, তবে নিঃসন্দেহে সুন্নাহর বাণী আসবে, কারণ তা আল্লাহর কিতাবের পূর্ণতা ও ব্যাখ্যা।

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

'আর আমি আপনার কাছে স্মরণিকা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি; যাতে মানুষের কাছে যা নাজিল করা হয়েছে, তা তাদেরকে পরিষ্কার করে বোঝাতে পারেন।'[২৩]

কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলোই সুন্নাহতে আলোচিত হয়েছে, শুধু কিছুটা তারতম্যের সাথে। যেখানে কুরআন বিস্তারিত আলোচনা করেছে, সেখানে হাদিসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসেছে। আবার যেখানে কুরআনে সংক্ষিপ্ত আছে, সেখানে হাদিসে বিস্তারিত এসেছে। যেমন উলুহিয়্যাহ বা তাওহিদের বিষয়ে কুরআনে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে, যেখানে এর সবদিক ও সব অংশ আলোচিত হয়েছে। মানুষের অন্তরে সব দরজা দিয়ে প্রবেশ করা হয়েছে। যেমন মহব্বত, ঘৃণা, ভয়, আশা, অনুভূতি, মানসিক, প্রত্যক্ষ ইমান ও গাইবের ওপর ইমান ইত্যাদি। মানুষকে তার সর্বহালতে সম্বোধন করা হয়েছে। তার আগমন-প্রস্থান, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, উঁচু-নিচু, স্থির ও চলা, শান্তি-বিপর্যয়, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা এবং একাকিত্ব ও একত্রিত সর্বাবস্থায়।

কুরআনে যেহেতু তাওহিদের বিষয়ে বিস্তারিত এসেছে, তাই সুন্নাহতে সংক্ষিপ্ত এসেছে; যদিও ইমানের বুঝ অনুধাবনের জন্য বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে মানুষকে ইমানের ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে এবং ইসলামি সমাজে এই সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে। তবে তা কুরআনের তুলনায় স্বল্প।

কুরআনে শরিয়তের বিধান-সম্পর্কিত বিষয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এসেছে। যেখানে সুন্নাহতে এই বিষয়ে এত বিস্তারিত এসেছে যে, আপনি মানুষের আচরণের প্রতিটা মুহূর্তের হালাল বা হারামের ব্যাপারে স্পষ্ট আলোচনা পাবেন। এ ছাড়াও কুরআন

২৩. সুরা আন-নাহল, আয়াত নং ৪৪।

tauhiderdak.com

যেখানে আখিরাতের বিভিন্ন দৃশ্যের বর্ণনা দীর্ঘ করেছে, বিপরীতে সুন্নাহতে তারগিব-তারহিবের আলোচনা বেশি এসেছে। অর্থাৎ জান্নাতের নিকটবর্তী আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে এবং জাহান্নামের কাজ থেকে ভয় দেখিয়েছে।

তাই আমরা যখন এই অদ্বিতীয় প্রজন্মের গড়ে ওঠার পেছনে কুরআনের প্রভাব নিয়ে বলি, তখন একই সময়ে সুন্নাহর আলোচনাও করি। তবে আমরা এখানে আরেকটি উপাদান যোগ করছি, যা সেই প্রজন্মকে কঠিনভাবে প্রভাবিত করে মানসিকতা উন্নত করে শক্তির সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যায় এবং সেই উঁচু চূড়ায় তাদেরকে অবিচল রাখে। তা ছিল, তাদের মাঝে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্বয়ং উপস্থিতি। এতে সন্দেহ নেই যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে থাকা ব্যক্তিদের ওপর এই উপস্থিতির বিশাল প্রভাব ছিল; যার ফলে তাঁরা এত উন্নত মর্যাদায় পৌঁছাতে পেরেছিলেন—যেখানে মানবজাতির অন্য প্রজন্ম পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি ছিলেন সমগ্র মানবজাতির পুরো ইতিহাসে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও মহান ব্যক্তিত্ব। এখানে তাঁর মহত্ত্বের বিস্তারিত বর্ণনার সুযোগ নেই। তিনি এমন ব্যক্তিত্ব, যার অভ্যন্তরে বহু ব্যক্তিত্বের ধারক ছিলেন এবং এমন মহান, যিনি বহু মহত্ত্ব ধারণ করেছিলেন। যেগুলো থেকে শুধু একটি যদি কোনো ব্যক্তির মাঝে থাকে, তাহলে তাকে ইতিহাসের মহানদের মাঝে গণ্য করা হয়। তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে এসব পূর্ণমাত্রায় একত্রিত হওয়ার পরে অবস্থা একটু কল্পনা করুন। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম যোগ্য শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামরিক কমান্ডার, আত্মিক পরিশুদ্ধ, স্বামী, পিতা, সঙ্গী ও দায়ি। এসব ছিল পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে একটি থেকে অন্যটি বেশি-কম নয়। তেমনই ছিল সামগ্রিক ও অবিচ্ছিন্ন। (তবে সবার আগে তিনি ছিলেন একজন নবি ও রাসুল।)

তিনি যেমন ইতিহাসের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন, তেমনই তাঁর প্রভাবও ইতিহাসে দৃষ্টান্তহীন ছিল। আবু সুফইয়ান ﵁ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসুলের মহত্ত্বের একটি দিক ও এর গভীর প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি এমন কাউকে দেখিনি, যাকে মানুষ তেমনভাবে ভালোবাসে, যেভাবে মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাঁকে ভালোবাসে।' এটা ছিল সূক্ষ্ম সত্য সাক্ষ্য। তাঁকে যে ভালোবাসত, তার মাঝে সীমাহীন ভালোবাসা জন্ম নিত।

যাঁরা তাঁকে ভালোবেসেছেন এবং তাঁর নিকট বাস করেছেন, তাঁদের ওপর প্রভাব নিঃসন্দেহে ছিল অনেক গভীর। ফলে তাঁরা কুরআন থেকে সুধা পান করতে পেরেছেন

tauhiderdak.com

এবং তাঁদের জন্য উচ্চস্তরে পৌঁছা ছিল অনেক সহজ। কেননা, কুরআনের মর্মবাণীর কোনো সীমা নেই। কিন্তু কুরআন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পাত্রের পরিমাণ অনুযায়ী দান করে। তাই এই মহান মানুষের সঙ্গে থেকে যখন অন্তর প্রশস্ত ও আত্মা স্বচ্ছ হবে, তখন কুরআনের রুহ থেকে পান করার পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআনকে ধারণ করা ও সে অনুযায়ী আমলের যোগ্যতা বেড়ে যাবে।

একবার এক সাহাবি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন, তাঁরা যখন রাসুলের সাথে থাকেন, তখন তাঁরা এমন হালতে থাকেন, যা তাঁদের প্রাত্যহিক জীবন ও কাজে ফিরে গেলে থাকে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

'যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ—তাঁর শপথ, যদি তোমরা আমার কাছে ও জিকিরের সময় যে হালতে থাকো, তাতে স্থায়ী হতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানজালা, কিছু সময় (রবের ইবাদতের জন্য) আর কিছু সময় (পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় হবে)।' (এ কথাটা তিনি তিনবার বললেন)[২৪]

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, রাসুল ﷺ-এর সাহচর্যের প্রভাব তাঁর কাছ থেকে বের হওয়ার পরেই শেষ হয়ে যেত। কারণ, এমন প্রভাব বিলীন হওয়া সম্ভব নয়; বরং এটা ছিল সাহাবিদের অন্তরে সরাসরি সাহচর্যের গভীর প্রভাবের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি; এমনকি তাঁরা অনুভব করতেন যে, রাসুলের সাহচর্যে তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছেন। সাঁতার কাটার সময় পানির ওপর ভাসমান ব্যক্তি যেমন নিজের শরীর হালকা অনুভব করে, তেমনই সেই মহান সত্তার রুহের আলোক রশ্মির ফলে তাঁদের অন্তরগুলো স্বচ্ছ হালকা হয়ে উঁচু স্তরে উঠে যেত। তাই যখন তাঁরা দৈনিক জীবনের বাস্তবতায় বেরিয়ে আসতেন, তখন সেই রশ্মি দুর্বল হয়ে যেত, যা তাঁদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই তাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য ও স্বাভাবিক জীবনের মাঝে পার্থক্য অনুভব করতেন। তবে ইতিহাসের বাস্তবতা বলে যে, এই সাহচর্য কখনোই তাঁদের অন্তর থেকে শেষ হয়ে যায়নি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে

২৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৭৫০।

tauhiderdak.com

বের হওয়ার পর পরিবর্তনের অনুভূতি অন্য কিছু নয়; বরং তা ছিল আরও অধিক সাহচর্যের প্রতি তীব্র আগ্রহের ফল। কিন্তু তা কখনোই সেই শক্তি হারিয়ে যাওয়া ছিল না। তাঁরা রাসুলের সাথে এমনভাবে লেগে ছিলেন, যা মানব ইতিহাসের পূর্বে কখনোই দেখা যায়নি।

তা সত্ত্বেও আমরা এটা বলছি না যে, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতি এই দ্বীন জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য শর্ত। কারণ, এটা যদি শর্ত হতো—যা ছাড়া ইসলাম দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে না—তাহলে রাসুলুল্লাহর ওফাতের পর মানুষকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রদান করা হতো না।

বরং আমরা বলছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সিরাত ও সুন্নাতের মাধ্যমে আমাদের মাঝে এমনভাবে উপস্থিত, যার মাধ্যমে ইসলাম দুনিয়াতে কোনো কমতি ছাড়া পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। তবে আমরা শুধু বাস্তবে ঘটে যাওয়া অবস্থা ব্যাখ্যা করছি। তা হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সহচরদের মাঝে এমন উত্তমভাবে গড়ে ওঠা ব্যক্তিদের পর্যাপ্ততা, যা ইতিহাসে কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটেনি; যদিও ইসলামের ইতিহাসের প্রতি যুগেই এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যারা তাদের মতো মহান ছিলেন।

সেই অদ্বিতীয় প্রজন্মের ওপর তৃতীয় যে উপাদানের প্রভাব অনস্বীকার্য, তা হলো নব উত্থানের প্রভাব। কেননা, প্রত্যেক নব উত্থানই হয়ে থাকে অধিক উদ্যম, প্রাণচঞ্চল এবং অন্যসব প্রজন্মের চেয়ে বেশি কার্যকরী।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি থেকে এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায়; বরং বাহ্যিক বস্তুগত বিষয় দ্বারাই তা বোঝা সম্ভব। যেমন পরীক্ষাগারে নতুন প্রস্তুতকৃত অক্সিজেনের কার্যকারিতা বাতাসে উপস্থিত অক্সিজেনের চেয়ে বেশি হয়। অথচ দুটোর মূল গঠন হুবহু একই—তেমনই যারা নতুন যুগের সূচনা করে বা নব উত্থান হয়, তারা অন্য যে কারও থেকে বেশি উদ্যমী ও কার্যকরী হয়। এটা দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—

প্রথমত, ইসলামে যেভাবে জাগরণ ঘটে, সেখানে মানুষের গঠনকে নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়; ফলে তাঁরা বাস্তবেই নতুন মানুষে পরিণত হয়। যাদের শক্তি থাকে সংরক্ষিত এবং কার্যকারিতা থাকে অনেক—যেমনভাবে পরীক্ষাগারের অক্সিজেনের হয়।

দ্বিতীয়ত, নবগঠিত প্রজন্ম যেসব প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে, তা হয় সবচেয়ে কঠিন ও বিপদসংকুল। যেকোনো চ্যালেঞ্জ সর্বদাই জাগ্রত অন্তরে শান দেয় এবং তা থেকে সর্বোচ্চ শক্তি বের করে নিয়ে আসে। তাই যদি দুটো বিষয় একত্রিত হয়—নব

tauhiderdak.com

উত্থান ও কঠিন প্রতিকূলতা—তখন আমরা সেসব ব্যক্তির বিশাল কর্মক্ষমতা কল্পনা করতে পারি, যারা বাস্তব জীবনে অবদান রাখবে।

সেই সাথে আরও যুক্ত করা যায়, নব জন্মের ব্যক্তিরা নতুন নিয়ামতকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করতে সক্ষম। কেননা, তাঁরা পূর্বে জাহিলিয়াতের অধীনে বাস করেছে, পরে ইসলামে এসেছে। তাই তাঁরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জাহিলিয়াত থেকে ইসলামে আসার মহত্ত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন। যেমন উমর ﵁ বলেছেন, 'যে জাহিলিয়াত বোঝেনি, সে ইসলামকে বুঝতে পারবে না।' অর্থাৎ যারা ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মাঝে পার্থক্য বোঝে না, তারা ইসলামকে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবে না। তাই এ ব্যক্তিরা নতুন কাঠামোকে সব ত্রুটি থেকে মুক্ত, অক্ষত ও নিরাপদ রাখার ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহী হয়। কারণ, তারা এটাকে একটা একটা ইট বসিয়ে নির্মাণ করেছে। এর নির্মাণে বহু কষ্ট ও বিপদ সহ্য করেছে। তারা দিনের পর দিন এটা গড়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করেছে, একসময় তা পরিপূর্ণ হয়েছে। তাই তারা এতে কোনো অবহেলা সহ্য করে না বা ত্রুটি মেনে নিতে পারে না। এটা তাদের অনুভূতির গভীরে মিশে গেছে; ফলে তারা এর এবং এটি তাদের জীবনের মূল অংশে পরিণত হয়েছে। তারা একে নিজের অস্তিত্বের মাঝে অনুভব করতে শুরু করেছে।

সুতরাং এ মহান প্রজন্ম ইসলামের প্রতি অনেক আগ্রহী ছিল; যেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় তারা যা গড়ে তুলেছে, তা সর্বপ্রকারের ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকে।

এ ক্ষেত্রেও আমরা বলছি না যে, এটা জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকীয় শর্ত। কারণ, যদি এমনই হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা প্রথম প্রজন্মের পরবর্তী মানুষদের দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিতেন না। তবে আমরা এখানে শুধু সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি, যা ছিল অদ্বিতীয়।

এ আলোচনা আমাদেরকে একটি প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়, যার উত্তর বের করা জরুরি। কেননা, কিছু ব্যক্তি যখন সেই অদ্বিতীয় প্রজন্মের দিকে লক্ষ করে, অতঃপর পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মাঝে বিচ্যুতি দেখতে পায়, তখন তাদের অন্তরে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় এবং তারা বলে, 'ইসলাম শুধু রাসুলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে স্বল্প সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, অতঃপর তা বিলীন হয়ে গেছে।' তখন প্রাচ্যবিদ ও তাদের শিষ্যরা এসে এটাকে আরও নিশ্চিত করে; যাতে মানুষের অন্তরে ইসলাম পুনরায় বাস্তব জীবনের শাসনে ফিরে আসার ব্যাপারে হতাশা জন্ম নেয়।

tauhiderdak.com

যদি সেই প্রজন্মের পুনরাবৃত্তি সম্ভব না হয় বা অন্তত বর্তমান পর্যন্ত যে পুনরাবৃত্তি হয়নি, তাহলে এর ফায়দা বা মূল্য কী? ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য এর ভূমিকা কী? এটা কি শুধুই এমন কিছুর স্মৃতি, যা কখনো ফিরে আসবে না? যদি পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হয় এবং সেই প্রজন্মের গড়ে ওঠার পেছনে বিশেষ কিছু অবস্থা থাকে, যা এতে গভীর প্রভাব ফেলেছে—যেমন তাদের মাঝে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতি এবং সে প্রজন্মের অন্তরের নব উত্থানের প্রভাব—তাহলে কীভাবে সেই যুগের মতো আকর্ষণীয়ভাবে আবারও ইসলাম বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠার আশা করা যায়?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

সেই অদ্বিতীয় প্রজন্মের কোন জিনিসটা পুনরাবৃত্তি অসম্ভব বা অন্তত এখনো পুনরাবৃত্তি হয়নি? সেটা কি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা দ্বারা বাস্তব বিশ্বে ইসলামের অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হবে, না সেই সুউচ্চ স্তর, যেখানে সেই প্রজন্ম এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল?

এ ছাড়া সেই প্রজন্মের গড়ে ওঠার সময় যে বিশেষ অবস্থা বিরাজমান ছিল, যাকে আমরা বলছি পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়, সেটার ভূমিকা আসলে কী? এই অবস্থার প্রভাবে কি সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সৃষ্টি হয়েছে, যা দ্বারা জমিনে ইসলামের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, না এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবায়নে সেই প্রজন্ম সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে পেরেছেন?

আমি মনে করি বিষয়টা আপনাদের সামনে অনেক স্পষ্ট হয়ে গেছে।

মোটকথা, যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বাস্তব বিশ্বে ইসলামের অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হয়, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহরিত। অর্থাৎ মুসলিমদের জীবনে সর্বদা বিদ্যমান দুটো উপাদান থেকে। যা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও ক্ষমতায় সংরক্ষিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমকে হিফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তা সংরক্ষণ করব।'[২৫]

.....

২৫. সুরা আল-হিজর, আয়াত নং ৯।

tauhiderdak.com

তেমনই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী নবিদের বাণী থেকে শুধু সেসব সংরক্ষিত আছে, যা কুরআনুল কারিম ও রাসুলের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এই দুটো উৎসের মাঝেই মুসলিম ব্যক্তি, মুসলিম জামাআত, মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম-রাষ্ট্র গঠনের জন্য সকল প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে—ইতিহাসের যে যুগেই মুসলিমরা তা গঠন করা ও এর জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করার সংকল্প করুক। আর সেই বিশেষ অবস্থায় যে প্রজন্ম গঠিত হয়েছে, তা ছিল ইসলামি অস্তিত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবায়নের সুউচ্চ স্তর—যে স্তরে আর কোনো প্রজন্ম পৌঁছাতে পারেনি।

তবে এখানে প্রশ্নের আরেকটি অংশের উত্তর বাকি আছে, যদি সেই প্রজন্মের মতো উচ্চ স্তরে পৌঁছা অসম্ভব হয়—কেননা, তা বিশেষ এক পরিবেশে জন্ম নিয়েছে, যা পুনরাবৃত্তির যোগ্য নয়—তাহলে ইসলাম ও মুসলিমদের জীবনে এর মূল কী? এটা শুধুই কাল্পনিক স্বপ্ন, যা মাঝে মাঝে স্মরণ করে স্বাদ নেওয়া হবে?

কখনোই না! বরং এটা আল্লাহর ইচ্ছায় বাস্তবায়িত হয়েছিল; যাতে তাঁরা মুসলিমদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়ে থাকে, যা তাঁরা বাস্তব জগতে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। যখন তারা প্রচেষ্টা করবে, তখন সত্যই তাঁরা উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে; যদিও সামগ্রিকভাবে সেই প্রজন্মের স্তরে পৌঁছাতে হয়তো পারবে না। তবে ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত যে, প্রতি যুগেই এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন, যারা সেই উচ্চ স্তরে পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন। তারা হচ্ছেন এমন ব্যক্তি, যাদের অন্তর ইসলামের নুরে আলোকিত হয়েছে; ফলে তারা রাসুলের ব্যক্তিত্ব ও সিরাত থেকে সেভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যেভাবে সাহাবিগণ প্রত্যক্ষ সহাবস্থানের মাধ্যমে আহরণ করেছেন। তারা নিজেদের অন্তরের গভীরে নব উত্থানের অনুভূতি লালন করেছেন, যেভাবে প্রথম যুগের ব্যক্তিরা করেছেন; ফলে সাহাবিদের মতোই গভীর থেকে কুরআন ও সুন্নাহর সুধা পান করেছেন এবং নিজেদের মাঝে তাঁদের মতোই তা বাস্তবায়ন করেছেন।

প্রত্যেক যুগেই এমন কিছু ব্যক্তি ছিলেন—যদিও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে তাঁরা ছিলেন অধিক—কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলিমরা যখন চেষ্টা করবে, তখন উঁচু স্তরে উঠে যাবে; যদিও তাঁদের মতো মর্যাদার স্তরে পৌঁছাতে না পারে। কেননা, প্রচেষ্টা মানুষকে ঊর্ধ্বে উঠিয়ে আনে, অন্যদিকে স্থবিরতা নিচে নিক্ষেপ করে। ভারত্বের ফলে মানুষ সর্বদা নিচের দিকে আকর্ষিত হয়, যদি ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা না করে—

tauhiderdak.com

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

'কালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎ কাজ করে, একে অপরকে সত্যের (সত্য গ্রহণের) উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।'[২৬]

তাই ইসলাম ও মুসলিমদের জীবনে সেই অদ্বিতীয় প্রজন্মের বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

কারণ, বাস্তব জগতে এই অনন্য দৃষ্টান্ত কেবল স্বপ্ন, কল্পনা বা স্লোগান নয়; বরং এমন বাস্তবতা, যা সর্বদাই ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আগ্রহীদেরকে তাদের সংকল্প বাস্তবে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগাবে। এই পথে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করার জন্য প্রেরণা দেবে। অতঃপর যখন তারা দুনিয়ায় ইসলামের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবায়ন করবে, তখন তারা প্রথম প্রজন্মের মতো উন্নত স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম না হলেও শুধু ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো একেবারে প্রাথমিক ধাপে বাস্তবায়ন করাও হবে ইতিহাসে সব জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে বিশাল পদক্ষেপ, আধুনিক জাহিলিয়াতও যার অন্তর্ভুক্ত; বরং আধুনিক জাহিলিয়াত এর শুরুতেই রয়েছে। তবে ওপরের স্তরগুলো মর্যাদার ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে যাবে, যেখানে পৌঁছার জন্য সকলেই অতিরিক্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করবে, তবে তা আবশ্যকীয় দায়িত্ব হিসেবে নয়; বরং প্রত্যেকে তার সাধ্য অনুযায়ী ওঠার চেষ্টা করবে, যেখানে স্বল্প কিছু ব্যক্তি চূড়ায় পৌঁছাবে, আর বাকিরা কাছাকাছি স্তরে উঠে আসবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মুসলিমদের আদেশ করেছেন; যাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাতের আলোকে নিজেদের গড়ে তোলে এবং সেই অদ্বিতীয় প্রজন্মের পদাঙ্ক অনুসরণে নিজেদের তাঁদের সাথে মিলিত করে—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

'বস্তুত তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ, এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের (সাক্ষাতের) আশা রাখে এবং

২৬. সুরা আল-আসর, আয়াত নং ১-৩।

tauhiderdak.com

আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।'[২৭]

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

'যারা এই মুহাজিরদের আগে এ নগরীতে (মদিনায়) বাস করেছে এবং ইমান এনেছে (অর্থাৎ আনসারদের জন্যও)। তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে, তারা তাদের ভালোবাসে; তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে কোনো চাহিদা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর (তাদের) অগ্রাধিকার দেয়। আর মনের কার্পণ্য থেকে যাদের মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, "হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের যে ভাইয়েরা আমাদের আগে ইমান এনেছে, তাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের অন্তরে মুমিনদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, আপনি তো স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু।"'[২৮]

তবে আমরা আরও এক ধাপ বেড়ে বলব...

বর্তমান ইসলামি জাগরণ-কার্যক্রম হচ্ছে সেই অদ্বিতীয় প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে নিকটবর্তী; যদিও তা হুবহু সেই পরিমাণ পূর্ণতা ও সমপর্যায়ের দৃঢ়তা লাভ করেনি—তবে অন্য যেকোনো প্রজন্মের তুলনায় অধিক নিকটবর্তী।

এর কারণ হলো, ইসলাম তার ইতিহাসের দ্বিতীয় অপরিচিতির যুগে বাস করছে, যে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

'ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছে, তা আবারও শুরুর মতো

২৭. সুরা আল-আহজাব, আয়াত নং ২১।
২৮. সুরা আল-হাশর, আয়াত নং ৯-১০।

tauhiderdak.com

অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে; তাই গুরাবাদের (অপরিচিতদের) জন্য সুসংবাদ।'[২৯]

দ্বিতীয় অপরিচিতি যদিও প্রথম যুগের অপরিচিতির সর্বদিকের সাথে হুবহু সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তবে নিঃসন্দেহে মৌলিক বহু ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। যার মধ্যে প্রধান হলো, বর্তমানে আল্লাহর দ্বীন মানুষের জীবন-পরিচালনার কর্মপন্থা নয়। যার জন্য মানুষকে আবার নতুন করে ইসলামের দিকে আহ্বান করা প্রয়োজন। তা এ জন্য নয় যে, মানুষ প্রথম যুগের মতো কালিমা মুখে উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে; বরং তারা এখন কালিমার মূল দাবি বাস্তবায়নে অস্বীকার করে, তা হলো, আল্লাহর শরিয়াহর শাসন কায়িম ও আল্লাহর দ্বীনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা; যদিও পুরো বিশ্বে শত কোটির বেশি মানুষ মুখে কালিমা উচ্চারণ করে। এটাই হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় অপরিচিতির বাস্তবতা, যা আজ বিরাজমান; যদিও কোটি-কোটি কুরআন ছাপা হচ্ছে, শত-শত মিডিয়া থেকে কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনের আলোচনা প্রচারিত হচ্ছে, হাদিস-কুরআনের পাঠ প্রদান করা হচ্ছে এবং যে ইচ্ছা তা শ্রবণ করতে পারছে।

অপরিচিতির যুগে শুধু মানুষের মাঝে বিদ্যমান বিষয়কে সংশোধনের তুলনায় নব জন্ম ও উত্থান কার্যক্রম বেশি হয়। কেননা, বর্তমানে লক্ষ-কোটি মানুষ যে খড়কুটার মতো বাস করছে, যেদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিত করেছেন—

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ،...

'খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্রিত হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে।' একজন বলল, 'সেদিন কি আমাদের সংখ্যায় কম থাকার কারণে এরূপ হবে?' তিনি বললেন, 'বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটার ন্যায়।...'[৩০]

২৯. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪৫।
৩০. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং ৪২৯৭।

tauhiderdak.com

মুসলিমদের এই খড়কুটার মতো ভেসে যাওয়ার অবস্থা শুধু ওয়াজ, বয়ান, নির্দেশনা বা মসজিদ, মিডিয়া, বই ও বৈঠকে দ্বীনি আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক শিক্ষা পেশ করার দ্বারা পরিবর্তন হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন তাদেরকে বেষ্টন করে রাখা জাহিলিয়াত থেকে বের করে আনা, তাদের অনুভূতিতে 'বাস্তবায়নের দায়িত্বে'র দ্বারা চাপ সৃষ্টি করা এবং সত্যিকার ইসলামের ওপর নতুনভাবে গড়ে তোলা; যাতে তারা ইসলাম বাস্তবায়নের মিশন থেকে বসে থেকে তা নিয়ে শুধু 'আলোচনা' বা 'চিন্তা করা' বা 'আকৃষ্ট হওয়া' বা 'আকাঙ্ক্ষা'র মাঝেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং বাস্তবেই ইসলামকে সাথে নিয়ে জীবনযাপন করে।

বর্তমান ইসলামি জাগরণে এটাই ঘটছে। ইসলামের অপরিচিতির মাঝে নব উত্থান। যার ফলে এই জাগরণে প্রথম প্রজন্মের গড়ে ওঠার পেছনে কার্যকরী দুটো বিশেষ উপাদানের একটি উপাদান বাস্তবায়িত হয়েছে, যা গত ১৩ শতাব্দীর মাঝে পুনরাবৃত্তি হয়নি। নব জাগরণের ব্যক্তিদের অন্তরে এই উপাদানের পূর্ণ কার্যকারিতা প্রকাশিত হবে এবং তারা দ্বিতীয় অপরিচিতি দূর করার জন্য কঠিন মেহনত করবে, যেভাবে প্রথম জামাআত ইসলামের প্রথম অপরিচিতি দূর করার চেষ্টা করেছেন।

আর মানুষের মাঝে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতি এমন বিষয়, যা স্বাভাবিকতই কিয়ামতের পূর্বে পুনরাবৃত্তি হবে না। তবে আমরা এটা নিশ্চিত ধারণা করতে পারি যে, যারা এই নব জন্মের সত্যিকার গভীর প্রভাব অন্তরে ধারণ করে বাস করবে, তারা ইসলামের বাস্তবতার মূল বিষয় ছেড়ে আনুষঙ্গিক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে যাবে না এবং তারা আল্লাহর জমিনে এ দ্বীনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নতুন করে মানুষের বাস্তব জীবনে দ্বীনের শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য গুরাবারা যে ময়দানে ব্যস্ত রয়েছেন, তা থেকে দূরে থাকবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত ও সুন্নাহ থেকে তাদের অন্তরে হক এমনভাবে প্রজ্বলিত হয়, যেন তারা প্রথম প্রজন্মের মতো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে তা গ্রহণ করছে এবং তাঁর সাথে জীবনযাপন করছে। আর সিরাত ও সুন্নাহর সাথে এমন সহাবস্থান তাদেরকে প্রথম প্রজন্মের মতো উঁচু স্তরে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে; যদিও সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে সহজেই সেখানে পৌঁছাতে পেরেছেন।

প্রথম সারমর্ম হলো, বর্তমান ইসলামি জাগরণ হচ্ছে সেই অদ্বিতীয় প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য ধারণের সবচেয়ে নিকটবর্তী; যদিও একেবারে হুবহু একই পরিমাণ ও স্তরে উন্নীত হবে না, তবে কাছাকাছি স্তরে পৌঁছাবে। ফলে বাস্তবেই তা এমন দৃষ্টান্ত পেশ করবে, যা সেই স্তরে পৌঁছে যাবে এবং মানুষ নতুনভাবে তা স্মরণ করবে; চাই তা হোক

tauhiderdak.com

আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষেত্রে বা আল্লাহর পথে জিহাদে সততায় বা দুনিয়ার সব চাহিদা থেকে ঊর্ধ্বে উঠে আল্লাহর প্রতিদানের আশায় সন্তুষ্টচিত্তে শাহাদাতের জন্য এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে বা এমন শাস্তিতে অবিচলতায়, যা শরীর ও অন্তর সহ্য করতে পারে না।

দ্বিতীয় সারমর্ম : সেই অদ্বিতীয় প্রজন্ম, যারা ইসলামের বাস্তবতা ও আদর্শ পূর্ণ প্রয়োগ করেছে, তা শুধু স্মৃতিচারণের জন্য অস্তিত্বে আসেনি; বরং তাঁরা এসেছিল; যাতে প্রতি প্রজন্মের মুসলিমরা তাঁদের স্তরে ওঠার জন্য চেষ্টা করে। যদি তারা চেষ্টা করে, তাহলে উন্নত হবে এবং পতন থেকে রক্ষা পাবে; চাই তারা সামষ্টিকভাবে সেই উঁচু স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হোক বা না হোক।

তৃতীয় সারমর্ম : সেই প্রজন্মের মাঝে যে স্বতন্ত্র বিষয় রয়েছে, তা ইসলামের মৌলিক কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। কেননা, মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতি প্রজন্মের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত এবং সব প্রজন্মের জন্য সম্ভব এবং জমিনে সঠিক ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক। মানুষ যদি সেগুলো পালনে ত্রুটি করে, তাহলে জিজ্ঞাসিত হবে এবং আল্লাহ তাআলার হক ও তাদের অধিকারে অবহেলার ফলে গুনাহগার হবে; এমনকি জমিনে তাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া এগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল।

বরং সেই প্রজন্মের স্বতন্ত্র বিষয় হচ্ছে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক উঁচু স্তরে পৌঁছা। এই স্তর আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর ফরজ করে দেননি। তিনি তাদের ওপর শুধু সর্বনিম্ন স্তর আবশ্যক করেছেন, যা ব্যতীত জীবন সঠিক হয় না। আর উঁচু স্তরগুলো ঐচ্ছিক রেখেছেন, যা কেউ পালনে সক্ষম হবে, যখন সে ইসলামের ওপর সঠিকভাবে গড়ে উঠবে, হকের নুরে আলোকিত হবে, আল্লাহ তাআলার এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তাঁকে দেখছে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এমনভাবে অনুকরণ করবে, যেন তাঁর সাথে বাস করছে।

মানুষ যদি এই দ্বীনের সর্বনিম্ন স্তর বাস্তবায়ন করে, তাহলেই তাদের জীবন এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে যে, ইতিহাসের যেকোনো জাহিলিয়াত ও বিশেষত বর্তমান জাহিলিয়াত তাদেরকে বিচ্যুত করতে ব্যর্থ হবে। আর যখন এর ঊর্ধ্বের স্তর বাস্তবায়িত হবে, তখন তা দুনিয়ার জান্নাত হবে, যা সেই অদ্বিতীয় প্রজন্মের হাতে একবার বাস্তবায়িত হয়েছিল। যা সর্বদাই মুসলিমদের জন্য সুন্দর স্বপ্ন হয়ে থাকবে, প্রতি যুগেই তারা তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাবে।

tauhiderdak.com

মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি

সামনের অধ্যায়গুলোয় আমরা মুসলিম উম্মাহর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার চেষ্টা করব, যা সেই সোনালি যুগে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে।'[৩১]

তবে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, আমরা এখানে ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি আলোচনা করব, যা প্রতি প্রজন্মের জন্যই আবশ্যক, তবে সে অদ্বিতীয় প্রজন্মের অনন্য বাস্তবায়নের দৃষ্টান্তের আলোকে। এই আলোচনায় দুটো বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। তবে মূল বিষয় হলো মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো; কেননা, ইসলামের অস্তিত্ব এর ওপর নির্ভরশীল। তাই যখন মুসলিমরা ধাপে ধাপে এগুলো থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখন তাদের ওপর বর্তমানের অবস্থা আক্রান্ত হয়েছে। যা আমরা এই কিতাবে উল্লেখ করব।

এখানে মুসলিম উম্মাহর প্রধান সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। কেননা, এটা এগুলো নিয়ে গবেষণার বই নয়। তাই আমরা এখানে কিছু বাছাইকৃত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বইয়ের উপযুক্ত করে আলোচনা করব।

সেসব বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা যেগুলো বাছাই করেছি—

এক. ইমানের সততা, কুরআন-সুন্নাহ থেকে আন্তরিকভাবে আহরণ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একনিষ্ঠতা।

দুই. সত্যিকার অর্থে উম্মাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।

তিন. বাস্তব জীবনে ইসলামি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা।

চার. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নৈতিকতা।

পাঁচ. প্রতিশ্রুতি পূরণ করা।

.....

৩১. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

অতঃপর আমরা মুসলিম উম্মাহর আরও দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব, যা প্রথম যুগে বাস্তবায়িত হয়নি; বরং পরবর্তী প্রজন্মে এসে তা পাওয়া গেছে। কেননা, এই দুটোর জন্য জমিনে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পরেও দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। সেগুলো হলো, ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের মিশন এবং ইসলামি সভ্যতার আন্দোলন। যে দুটো পরে এসে বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে এগুলোর প্রাথমিক ভিত্তি নিঃসন্দেহে সেই প্রথম প্রজন্মের জীবনেই রচিত হয়েছে, যারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস লিখেছে। কেননা, পরবর্তী সব প্রজন্মই প্রথম যুগের জীবনাদর্শে প্রভাবিত ছিল, শুধু মুসলিম-বিশ্বের অভ্যন্তরেই নয়; বরং পুরো দুনিয়াজুড়ে।

tauhiderdak.com

এক.

ইমানের সততা, কুরআন-সুন্নাহ থেকে আন্তরিকভাবে আহরণ এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে একনিষ্ঠতা

এগুলোর সবটিই উম্মাহর মূল বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করেই সর্বোত্তম প্রজন্ম গড়ে উঠেছে, যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

> 'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'[৩২]

প্রথম প্রজন্মের এই গুণে গুণান্বিত হওয়া আমাদের কাছে আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এটা সেই উম্মাহর জন্য আবশ্যক, কুরআন যাদেরকে অস্তিত্বে এনেছে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ যাদের জীবনের প্রতিটা কর্মকে নির্ধারণ করে দিয়েছে; বরং প্রথম প্রজন্মের অবাক করা বিষয় হলো, এই গুণাবলি নিজেদের ও জীবনের বাস্তবতায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা বিস্ময়কর উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন।

ইমানের সততা

কুরআনের সব আহ্বান হচ্ছে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন করা,

أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

> 'জেনে রাখো, খাঁটি দ্বীন কেবল আল্লাহরই।'[৩৩]

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

---

৩২. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

৩৩. সুরা আজ-জুমার, আয়াত নং ৩।

tauhiderdak.com

'বলুন, "আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন দ্বীনকে কেবল আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর ইবাদত করি।"'[৩৪]

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

'দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্য নিবেদিত করে (একনিষ্ঠভাবে) তাঁকে ডাকবে।'[৩৫]

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'অথচ তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল, যেন দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করে।'[৩৬]

মূলকথা, আল্লাহ তাআলা যে আদেশ দিয়েছেন, তা শুধু আবেগের বিষয় নয়, যা মানুষের অনুভূতিতে বিরাজমান থাকবে। অথবা এটা শুধু স্বীকৃতির বিষয় নয় যে, মানুষ ঘোষণা করবে, আল্লাহ এক, যাঁর কোনো শরিক নেই। অথবা শুধু আল্লাহর একত্ববাদকে অন্তরে সততার সাথে বিশ্বাস করে নেবে। কেননা, এককভাবে এগুলো আল্লাহ বান্দার থেকে আদেশ শব্দের মাধ্যমে যা প্রত্যাশা করেন, তা পূরণে যথেষ্ট নয়। এটা শুধু আগ্রহ বা উৎসাহদানের জন্য আসেনি—

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'অথচ তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল, যেন দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে তারা আল্লাহর ইবাদত করে।'[৩৭]

কেননা, যত আয়াতে দ্বীনপালনে ইখলাসের আদেশ এসেছে, সবগুলোতেই শরিকবিহীন একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ এসেছে। সুতরাং তা শুধু বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং বিশ্বাসের সাথে যুক্ত আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, ইবাদত হচ্ছে বাস্তব কার্যক্রম, যা বাহ্যিকভাবেই স্পষ্ট। ইবাদত শুধু আবেগ বা বিশ্বাসের নাম নয়; বরং এমন আচরণ, যা আবেগ ও বিশ্বাস থেকে উৎসারিত।

.....

৩৪. সুরা আজ-জুমার, আয়াত নং ১১।

৩৫. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ২৯।

৩৬. সুরা আল-বাইয়িনাহ, আয়াত নং ৫।

৩৭. সুরা আল-বাইয়িনাহ, আয়াত নং ৫।

tauhiderdak.com

ইবাদতে কাঙ্ক্ষিত ইখলাস হচ্ছে শিরক থেকে পবিত্র থাকা। আর এটাই তাওহিদের হাকিকত বা বাস্তবতা। এটা এমন আবশ্যকীয় বিষয়, যা উঁচু স্তরে ওঠার জন্য নয়; বরং একেবারে প্রাথমিক ইমান অর্জনের জন্য শর্ত। আর উঁচু স্তরে ওঠার বিষয়ে আমরা প্রথম প্রজন্মের জীবনী থেকে আলোচনা করব, যেগুলোর জন্য মুসতাহাব বা অতিরিক্ত প্রতিদানের কথা এসেছে। আদেশ বা আবশ্যকীয়তার বিধান নয়।

বান্দাদের কাঙ্ক্ষিত ইবাদত ও শিরক থেকে পবিত্রতার পদ্ধতি কী?

আল্লাহ তাআলার কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী ইবাদতে তিনটি বিষয় রয়েছে—

- এই দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাঁর সত্তা, নাম ও সিফাতে এক ও অদ্বিতীয়।
- বান্দার ওপর আবশ্যক ইবাদতে একমাত্র তাঁর দিকেই অভিমুখী হওয়া।
- আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারাম, উত্তম-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ মান্য করা।

এই তিনটি থেকে কোনো একটিতে ত্রুটি হলে তাওহিদ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তা শিরকে লিপ্ত করবে, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, কোনো গুনাহ হালাল বা বৈধ সাব্যস্ত করা ব্যতীত মূল আনুগত্য নষ্ট হয় না। তেমনই তা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করবে না; যতক্ষণ তারা আল্লাহর বিধানের স্বীকৃতি দেবে এবং আল্লাহর অবাধ্যতাকে শরিয়তবিরোধী আইন পরিণত না করবে বা আল্লাহর আইনের সমপর্যায়ের মর্যাদা না দেবে। অন্য কথায় বলা যায়, শুধু আল্লাহর আইনের অবাধ্যতা মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে না; বরং আল্লাহর আদেশের বিরোধী আইন প্রণয়ন করা মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয়। যা এসব আয়াতের মূল মর্ম—

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই কাফির।'[৩৮]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই জালিম।'[৩৯]

৩৮. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৪৪।

৩৯. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৪৫।

tauhiderdak.com

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই কাফির।'[৪০]

এটা যে দ্বীন নষ্টকারী শিরক, তা এই আয়াত থেকে স্পষ্ট—

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ

'নাকি তাদের কতিপয় শরিক (তাগুত) আছে, যারা তাদের জন্য এমন কোনো দ্বীন প্রবর্তন করে দিয়েছে, আল্লাহ যার অনুমতি দেননি?'[৪১]

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

'তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তিনি ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না।'[৪২]

এখানে সুরা শুরার আয়াতে 'দ্বীন' ও সুরা আরাফের আয়াতে 'আল্লাহ-প্রদত্ত বিধানের অনুসরণ', এ দুটো শুধুই বিশ্বাস বা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাতে হালাল ও হারামের সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত। তাই বিশ্বাস, অনুভূতি ও আইন-বিধান—এই তিনটির কোনোটা আল্লাহ ছাড়া অন্য উৎস থেকে গ্রহণ করা শিরক ও কাফিরদের অনুসরণ গণ্য হবে। যার দলিল, মুশরিকদের শিরকি কাজের বর্ণনা দিয়ে সুরা নাহলের আয়াত—

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

'মুশরিকরা বলল, "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে আমরা ও আমাদের বাপদাদারা তাঁকে ছাড়া কোনো কিছুরই উপাসনা করতাম না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া নিজেরা কোনো কিছু হারাম (নিষিদ্ধ) করতাম না।"'[৪৩]

৪০. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৪৭।
৪১. সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং ২১।
৪২. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ৩।
৪৩. সুরা আন-নাহল, আয়াত নং ৩৫।

tauhiderdak.com

আরও দলিল হলো, সুরা নিসায় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে তাদের ইমানের দাবির সত্য বা মিথ্যা যাচাইয়ের মানদণ্ড বর্ণনা করে বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا - فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا - أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا - فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার কাছে অবতীর্ণ কিতাব ও আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি তারা ইমান এনেছে? তারা একে অপরের বিরুদ্ধে বিচার চাওয়ার জন্য তাগুতের কাছে যেতে চায়; অথচ তাকে (তাগুত) অমান্য করতেই তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শয়তান তাদেরকে বিপথে অনেক দূর নিয়ে যেতে চায়। আর যদি তাদের বলা হয়, "আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তার দিকে এবং রাসুলের দিকে এসো", তাহলে দেখবেন, মুনাফিকরা আপনার দিক থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের ফলে যখন তাদের কোনো বিপদ আসবে, তখন কেমন হবে? তখন তারা আপনার কাছে এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, "আমরা তো কল্যাণ আর মীমাংসা ছাড়া আর কিছু চাইনি।" ওরা তো তারাই, যাদের অন্তরের কথা আল্লাহ জানেন; তাই আপনি তাদের উপেক্ষা করুন, আর কিছু উপদেশ দিন এবং তাদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে এমন কিছু কথা বলুন। আমি তো প্রত্যেক রাসুলকে এ জন্যই পাঠিয়েছি যে, মানুষ আল্লাহর নির্দেশমতো তাঁর আনুগত্য করবে। তারা যখন নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে

tauhiderdak.com

আসত এবং আল্লাহর কাছে (তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার অপরাধের জন্য) ক্ষমা চাইত আর রাসুলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু পেত। কিন্তু না, আপনার রবের শপথ, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের সব বিরোধে আপনাকে বিচারক করে, তারপর আপনি যে বিচার করেন, তাতে তাদের মনে কোনো সংকীর্ণতা থাকবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেবে।'[৪৪]

কুরআনে বর্ণিত এমন বহু আয়াত থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়, বান্দাদের থেকে কাঙ্ক্ষিত ইবাদত হচ্ছে, আল্লাহ তাআলাকে উলুহিয়্যাহ ও রুবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে একক বিশ্বাস করা। যা আল্লাহর সত্তা, নাম ও গুণের ক্ষেত্রে একত্ববাদকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। সকল আমলে একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, আল্লাহ-প্রদত্ত বিধানাবলি মান্য করা। আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য উৎস থেকে আইন গ্রহণ না করা; চাই তা শরিয়তের সাথে সমকক্ষ হিসেবে হোক, যেমন তাতাররা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইয়াসিককে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিল; যাতে কুরআন ও অন্যান্য উৎস থেকে বিধান গ্রহণ করা হয়। অথবা স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে হোক, অর্থাৎ আল্লাহর শরিয়াহকে পূর্ণভাবে ত্যাগ করে ভিন্ন আইনকে বিধান হিসেবে গ্রহণ করা।

শুধু এ ধরনের ইবাদত মানুষকে শিরক থেকে মুক্ত করে মুসলিম বানাতে সক্ষম। এটাই হচ্ছে সর্বনিম্ন ইখলাস, যা থেকে কম আল্লাহ তাআলা মানুষ থেকে গ্রহণ করেন না। এটা ব্যতীত মানুষের অন্তরে ও বাস্তব জীবনে ইসলামের বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। (আর উঁচু স্তরসমূহ আল্লাহ তাআলার প্রতি বান্দার আনুগত্যের পরিমাণ এবং অন্তর ও মুখে স্বীকৃতি দানকৃত বিষয় মান্য করার আগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত।)

অন্যদিকে এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলার সাথে সৃষ্টি বা পরিচালনা বা রিজিক বা জীবন-মৃত্যু বা উপকার-অপকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার রয়েছে, অথবা ইবাদতে গাইরুল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়া বা আল্লাহ তাআলার আইন ব্যতীত ভিন্ন আইন গ্রহণ করা বা ভিন্ন আইনে সন্তুষ্ট হওয়া—এসবই শিরক, যেগুলো মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে মুরতাদ বানিয়ে দেয়।

৪৪. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ৬০-৬৫।

tauhiderdak.com

কুরআন-সুন্নাহ থেকে আন্তরিকভাবে আহরণ

একনিষ্ঠতার সাথে দ্বীনপালন যেভাবে তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনই কুরআন-সুন্নাহ থেকে গ্রহণের আবশ্যকীয়তা মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বিষয়, যা ছাড়া উম্মাহর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। যেহেতু আল্লাহর প্রদত্ত বিধান মান্য করা আকিদার মূল রুকন, তাই এটা ছাড়া আকিদা গ্রহণযোগ্য হবে না। (তবে এখানে এমন গুনাহ বাদ থাকবে, যাকে বৈধতা দেওয়া হয়নি।) তাই কুরআন-সুন্নাহ থেকে গ্রহণের আবশ্যকীয়তা ইসলামের প্রত্যক্ষ দাবি। কেননা, মানুষের জীবনে যখনই কোনো বিষয় সামনে আসবে, সেখানে কোনো হুকুম প্রয়োজন হবে। এখন সেই বিধান কোথা থেকে আসবে?

এখানে দুটো ছাড়া ভিন্ন কোনো উৎস নেই—হয়তো আল্লাহর আইন, নয়তো জাহিলিয়াত।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তাহলে কি তারা জাহিলিয়াত আমলের বিচার-মীমাংসা কামনা করে? বিচারের ক্ষেত্রে দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?'[৪৫]

যদি মানুষ তাদের আইন আল্লাহ তাআলা (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ এবং এই দুটোর আলোকে ফকিহদের ইজতিহাদ থেকে) গ্রহণ না করে, তাহলে তারা মূলত জাহিলিয়াত থেকে তাদের আইন গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে।

তাই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণের আবশ্যকীয়তা ইসলামি অস্তিত্বের জন্য জরুরি এবং মুসলিম উম্মাহর এমন বৈশিষ্ট্য, যা বিচ্ছিন্ন হয় না। তবে শুধু কুরআন-সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করা প্রথম প্রজন্মের মাঝে অবাক করা বিষয় নয়; বরং তাঁদের চমৎকৃত বিষয় হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহর আদেশ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যাওয়া। ফলে তাঁদের জীবনে গুনাহ ছিল একেবারে বিরল, যা নিয়ে সামনে আলোচনা করব।

৪৫. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৫০।

tauhiderdak.com

আল্লাহর পথে জিহাদ

তেমনই আল্লাহর পথে জিহাদ, এটাও এই উম্মাহর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'হে ইমানদারগণ, আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসার পথ বলে দেবো, যা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।'[৪৬]

এই উম্মাহ যতদিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পতাকা ও কালিমার দায়িত্ব বহন করবে, ততদিন জিহাদ তাদের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যকীয় হয়ে থাকবে। কেননা, সব মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে না এবং তারা আল্লাহর দ্বীনে সন্তুষ্ট হবে না; এমনকি মুসলিম উম্মাহকে তাদের মতো দ্বীন প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে নিরাপদে ছেড়ে দেবে না; বরং যথাসাধ্য দ্বীনের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে যাবে।

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

'আর তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সমবেতভাবে।'[৪৭]

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

'তারা (কাফিররা) তোমাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের পারলে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেয়।'[৪৮]

.....

৪৬. সুরা আস-সফ, আয়াত নং ১০-১১।

৪৭. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ৩৬।

৪৮. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২১৭।

tauhiderdak.com

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক-কুফর) নির্মূল হয়, আর দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।'[৪৯]

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনো আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।'[৫০]

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

'আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা অবৈধ করেছেন, তাকে অবৈধ গণ্য করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিজিয়া প্রদান করে।'[৫১]

বর্তমান অজ্ঞ মুসলিমরা বিতর্ক করে যে, ইসলামে জিহাদ হচ্ছে শুধু প্রতিরক্ষার জন্য, অর্থাৎ মুসলিমরা শত্রুর পক্ষ থেকে আক্রান্ত হওয়া ব্যতীত যুদ্ধ করবে না। প্রমাণস্বরূপ তারা জিহাদের প্রাথমিক বিধানের আয়াত পেশ করে থাকে—

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, আর সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[৫২]

---

৪৯. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৩৯।
৫০. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১২০।
৫১. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ২৯।
৫২. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৯০।

tauhiderdak.com

অথচ তারা পূর্বে বর্ণিত স্পষ্ট আয়াতগুলো সম্পর্কে বেখবর থাকে বা প্রাথমিক বিধানের আলোকে সেগুলো তাবিল করে।

তাদের এসব বিতর্কের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ব্যতীতই বর্তমান মুসলিম উম্মাহ ইসলামের পতাকাতলে জিহাদ ত্যাগের ফলে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, এটাই কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ ওয়াজিব থাকার সর্বোত্তম দলিল। প্রতিরক্ষা বা আক্রমণ যেটাই হোক মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে না—

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

> 'যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক-কুফর) নির্মূল হয়, আর দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।'[৫৩]

তৃতীয়বারের মতো বলছি, প্রথম প্রজন্মের মাঝে তাঁদের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি সততা আমাদের আশ্চর্য করে না; কেননা, এটা তো প্রতি প্রজন্মেই ইসলামের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক; বরং তাঁদের মাঝে আকর্ষণীয় হলো, আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে ত্যাগ ও কুরবানির সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত পেশ করা।

আমরা সোনালি প্রজন্মের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি; যাতে এসব গুণাবলি বাস্তব দুনিয়ায় প্রয়োগের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতে পারি।

বলা যায়, সেই প্রজন্ম পুরো জীবন কুরআনের সাথে বাস করেছে। কুরআনের প্রতিটা শব্দ, প্রতিটা বাক্য, সব নির্দেশনা, আদেশ বা নিষেধ তাঁদের অন্তরে পূর্ণ শক্তি নিয়ে পৌঁছাত। ফলে এই শব্দ বা বাক্য বা নির্দেশনা বা আদেশ বা নিষেধ তাঁদেরকে কাঙ্ক্ষিত পূর্ণ বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত করত।

সাহাবিগণ শুধু চিন্তা-ফিকির করার জন্য বা কুরআনের শৈল্পিক সুধা উপভোগের জন্য তিলাওয়াত করতেন না। তেমনই শুধু আয়াতের দার্শনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা অভিজ্ঞতালব্ধ থিউরি ও দৃষ্টিভঙ্গি বের করার জন্য পড়তেন না; এমনকি শুধু আত্মিকভাবে প্রভাবিত হওয়ার জন্য তিলাওয়াত করতেন না, যা শুধু অন্তরে প্রশান্তির ছোঁয়া বয়ে আনে ঠিক; কিন্তু সেই ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে নাড়াতে পারে না।

.....

৫৩. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৩৯।

tauhiderdak.com

বরং তাঁরা কুরআন শিখতেন; যাতে সেই মুহূর্ত থেকেই তা বাস্তবায়ন করা যায়। তাঁরা নিজেদের ব্যাপারে বলেছেন, 'আমরা দশ আয়াত শিক্ষা করতাম এবং এগুলোর ওপর আমল করার পূর্বে পরবর্তী কিছু শিখতাম না। ফলে আমরা কুরআন ও আমল একই সাথে শিক্ষা করেছি।'[৫৪]

আল্লাহ তাআলা এই কুরআন অবতরণ করেছেন; যাতে বাস্তব দুনিয়ায় বিশাল কিছু সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন কুরআনে এসেছে,

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

> 'যদি এমনও একটি কুরআন হতো, যার সাহায্যে পাহাড় চালানো যেত, কিংবা জমিন টুকরা টুকরা করা যেত, অথবা মৃতদেরকে কথা বলানো যেত (তাহলেও অবিশ্বাসীরা তা বিশ্বাস করত না)। তবে সব বিষয় আল্লাহরই ইখতিয়ারভুক্ত।'[৫৫]

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মুশরিকরা বাহ্যিক মুজিজা প্রত্যাশা করত। যেমন পাহাড় সরিয়ে ফেলা, জমিনে ফাটল সৃষ্টি করা বা মৃতকে কথা বলানো। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সততার ওপর ইমানকে এসব বাহ্যিক মুজিজা বাস্তবায়নের সাথে শর্ত করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এসব নিদর্শন প্রদান করেননি; বরং এগুলোর পরিবর্তে মুজিজাস্বরূপ এ মহা গ্রন্থ নাজিল করেছেন, যার আয়াতসমূহ চিরস্থায়ী। আমরা ইতিপূর্বে যে আয়াত পেশ করেছি, তা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, কুরআনের কাজ পাহাড় সঞ্চালন করা বা জমিনে ফাটল সৃষ্টি করা বা মৃতকে কথা বলানো নয়। কেননা, কুরআনের দায়িত্ব ভিন্ন, যা পাহাড়, জমিন ও মৃতের ওপর প্রভাব সৃষ্টি থেকে অনেক মহান, যে পর্যন্ত জাহিলদের চিন্তা ও স্বপ্ন এসে থেমে যায়। কুরআনের দায়িত্ব হলো, সর্বোত্তম গঠনের 'মানুষ' গড়ে তোলা। এটা আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের সকল কল্পনা থেকে উত্তম।

প্রথম যুগের মুসলিমদের অন্তরে কুরআনের এই মিশন পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁদের নতুনভাবে গড়ে তুলেছে; ফলে তাঁদের থেকে আশ্চর্যজনক বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে, যা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

.....

৫৪. তাফসিরু ইবনি জারির : ১/১৮০।

৫৫. সুরা আর-রাদ, আয়াত নং ৩১।

tauhiderdak.com

তাই আমরা যখন সাহাবিদের কুরআনের নির্দেশনা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানব, তখন কি সিরাতের বই ও ইতিহাসের বর্ণনায় তাঁদের অসাধারণ দৃষ্টান্তের ঘটনা পাঠ করে অবাক হব?

আমরা তাঁর কাজে অবাক হব, যিনি ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত পার করেছেন; যাতে তাঁদের সামান্য খাবারটুকু মেহমানকে দিতে পারেন এবং বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন; যাতে মেহমান বুঝতে না পারে যে, এ ছাড়া তাঁদের কাছে কোনো খাবার নেই। তখন আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন,

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

'এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর (তাদের) অগ্রাধিকার দেয়।'[৫৬]

আমরা তাঁর কাজে অবাক হব, যিনি কিছু খেজুর হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছেন; কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর বলছেন, 'যদি আমি এগুলো শেষ হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে তা অনেক দীর্ঘ সময়!' তখন তিনি খেজুর নিক্ষেপ করে জান্নাতের আশায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে শহীদ হয়ে গেছেন?

আমরা তাঁর ব্যাপারে অবাক হব, যিনি বাসর রাতে যুদ্ধের ডঙ্কা শুনে জান্নাতের আশায় তাতে শরিক হয়েছেন এবং শাহাদাতের পর ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিয়েছে?

আমরা তাঁর ব্যাপারে অবাক হব, যাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ মালে ফাই থেকে অংশ প্রদান করার পর বলেছেন, 'আমি এর জন্য আপনাকে বাইআহ দিইনি।' বরং তিনি ভিন্ন স্বাদের তালাশে ছিলেন। আল্লাহর সাথে সৎ থেকেছেন; ফলে শহিদ হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন?

আপনি উমরের ব্যাপারে অবাক হবেন, যখন তিনি এক অভাবী মাকে দেখে কাঁদছিলেন, যে তার বাচ্চাদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়াচ্ছিল। তখন তিনি নিজে আটার বস্তা কাঁধে বহন করে এনে নিজ হাতে খাবার তৈরি করেছেন এবং বাচ্চারা তৃপ্ত হয়ে ঘুমানো পর্যন্ত সেখান থেকে প্রস্থান করেননি?

আমরা কি অবাক হব, সেই মেষপালকের আচরণে, যখন সে নিজেকে নিদ্রাহীন রাখছে এবং তার ওপর হদ প্রয়োগের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বারবার আবেদন

.....

৫৬. সুরা আল-হাশর, আয়াত নং ৯।

tauhiderdak.com

করছে; কেননা, সে কাফফারাবিহীন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে না? অথবা সে গামিদি নারীর ব্যাপারে, যে হদ প্রয়োগের জন্য পীড়াপীড়ি করেছে; এমনকি বাচ্চা জন্মদান পর্যন্ত তার সংকল্পে চিড় ধরেনি; যাতে আল্লাহর সাথে গুনাহমুক্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে পারে?

আমরা কি রিবয়ি বিন আমিরের ব্যাপারে আশ্চর্য হব, যখন তিনি জাহিলিয়াতের সব ক্ষমতা ও সম্মানকে পদতলে পিষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সম্মান ধারণ করে রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করেছেন। উদ্ধত জাহিলিয়াতের সামনে হকের বাণী ঘোষণা করেছেন। যাকে তিনি ভয় পাননি বা কোনো পাত্তাই দেননি। কেননা, তিনি আল্লাহর মানদণ্ডে মেপে দেখেছেন, তা শূন্য। যা গাধার পায়ে মাড়ানো ও বর্শার আঘাতে ছিন্ন করার যোগ্য। তিনি এর মনিবের সামনে আল্লাহর আদেশ পাঠ করেছেন।

আমরা কি অবাক হব, যখন আমর বিন আস খলিফার কাছে রোমের তীব্র আক্রমণের মোকাবিলায় সেনা সাহায্য চেয়েছেন, তখন উমর ﷺ দশ, পাঁচ বা এক হাজার অথবা পাঁচশ সেনার কোনো বাহিনী পাঠাননি; বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাত্র চারজন মহান সাহাবিকে পাঠিয়েছেন, এমনভাবে যেন তা কয়েক হাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী?

আমরা কি বিশ্বের বিস্তৃত ভূখণ্ডে এত অল্প সময়ে ইসলাম প্রচারে আশ্চর্যান্বিত হব, যেখানে মাত্র অর্ধশত বছরে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পূর্বে হিন্দ পর্যন্ত ইসলাম সেই মহান মানুষদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল?

আমরা চতুর্দিকের শত শত অলৌকিক ঘটনায় অবাক হব, যেগুলো এই স্বল্প সময়ের মাঝে একত্রিত হয়েছিল। ফলে ঐতিহাসিক ও সিরাত প্রণেতাগণ এগুলোকে সাধারণ ঘটনার মতো আলোচনা করে গেছেন। কেননা, তারা ডানে-বামে যেদিকে তাকান, সুউচ্চ সব দৃষ্টান্ত দেখতে পান; ফলে সেখানে এমন কিছু ছিল না, যাকে অন্যগুলোর তুলনায় উঁচু হিসেবে অভিহিত করা যায়!

এসব মানুষ কি তাঁদেরকে মনুষ্যত্ব থেকে বের করে দিয়েছেন?

তাঁরা কি ফেরেশতা হয়ে গেছেন?

তাঁরা কি রাসুলের এই বাণী থেকে বেরিয়ে গেছেন, (كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ...) 'প্রত্যেক আদম-সন্তানই ভুলকারী...।'[৫৭]

.....

৫৭. সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস নং ৪২৫১।

tauhiderdak.com

কখনোই না, তাঁরা এমন ছিলেন না।

তাঁরা মানুষই ছিলেন, যাঁদের মাঝে মানুষের প্রেরণা কাজ করত। তাঁরা জমিনে মানুষের মতো প্রেরণা নিয়ে চলাচল করেছেন; কিন্তু তাঁদের মানবপ্রেরণা ছিল সবচেয়ে পবিত্র ও উঁচু। এমন মানবপ্রেরণা, যেখানে দুনিয়ার চাপ সর্বোচ্চ পর্যায়ের কম ছিল। ফলে মানুষ যতটা ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম, তাঁরা ততটাই উঠেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন মানুষ, তাঁদের কেউ চুরি করেছেন; ফলে তার ওপর হদ প্রয়োগ হয়েছে। কেউ জিনা করেছেন; ফলে তার ওপর হদ প্রয়োগ হয়েছে। কেউ মদ পান করেছেন; ফলে তার ওপর হদ প্রয়োগ হয়েছে। কেউ যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়েছেন; ফলে আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করেছেন। কতক অলসতা করেছেন, পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন...

তাঁদের কতকের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে আল্লাহ তাআলার বাণী—

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ

'তোমাদের মধ্যে কেউ ইহকাল চায়, আবার কেউ পরকাল চায়।'[৫৮]

مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ

'তোমাদের কী হলো? যখন তোমাদের বলা হয়, "আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হও", তখন তোমরা মাটির সাথে আঁকড়ে থাকো।'[৫৯]

هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ

'শোনো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে; অথচ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কার্পণ্য করছে।'[৬০]

لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ - وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ

.....

৫৮. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৫২।

৫৯. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ৩৮।

৬০. সুরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং ৩৮।

tauhiderdak.com

عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা সংকটের সময়ে (তাবুক অভিযানকালে) তাঁর অনুসারী হয়েছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল হয়েছেন, যখন ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে একটি দলের মনে (এ ব্যাপারে) বিভ্রান্তি সৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল, অতঃপর তিনি তাদেরকে ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু। সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ অনুগ্রহশীল হয়েছেন), যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যখন প্রশস্ত পৃথিবী তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল আর তাদের নিজেদের জীবন তাদের কাছে কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, আল্লাহর শাস্তি থেকে (পালানোর জন্য) তাঁর কাছে ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় হলেন; যাতে তারা তওবা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।'[৬১]

এসব সত্ত্বেও তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ - أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

'যারা কোনো খারাপ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করবে কে? আর তারা জেনেশুনে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জিদ ধরে থাকে না। এমন লোকদের প্রতিদান হচ্ছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে ক্ষমা আর এমনসব জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ

৬১. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ১১৭-১১৮।

tauhiderdak.com

প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। সৎকর্মশীলদের এই প্রতিদান কত উত্তম!'[৬২]

তাঁরা উত্তম আমল করতেন। তবে কখনো উঁচু স্থান থেকে পতিত হলে তাতে অবস্থান করতেন না; বরং পুনরায় উঁচু স্তরে সমাসীন হওয়ার জন্য আমল করে যেতেন।



৬২. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৩৫-১৩৬।

tauhiderdak.com

দুই.

সঠিক অর্থে এক উম্মাহর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা

আমরা পূর্বে বলেছি, আরবরা ছিল বিক্ষিপ্ত গোত্রে বিভক্ত, যারা কোনো কিছুতে একত্রিত হতো না। অথচ তাদের ঐক্যের সকল উপাদান বিদ্যমান ছিল। যেমন এক অঞ্চল, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক ইতিহাস, এক চিন্তাধারা, একই আশা।

সেখানে অন্তত এতটুকু সম্ভব ছিল যে, তারা এমন কোনো বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেখানে জাহিলিয়াতে লিপ্ত ব্যক্তিরাও মিলিত হয়। যেমন, জাতীয়তাবাদ; যাতে জাজিরাতুল আরবের চতুষ্পার্শ্ব থেকে রোম ও পারস্য দখলদারিত্ব দূর করা যায়। অথবা সমাজতন্ত্র; যাতে স্বল্প কিছু ব্যক্তির হাতে সম্পদের পাহাড় থাকা ও অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য হালতে থাকার মাঝে বিভাজন কমানো যায়। এগুলো ছাড়াও জাহিলি সভ্যতার বিভিন্ন যুগে মানুষ নানাভাবে একত্রিত হয়েছে। কিন্তু আরবদের মাঝে গোত্রপ্রীতি, চির প্রতিশোধ-স্পৃহা, ডাকাতি-ছিনতাই, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ বিষয়ে ব্যস্ত থাকা, অন্যরা যেগুলো নিয়ে গর্ব করে তা অর্জনের প্রতিযোগিতা, অন্যদের ক্ষতি করার প্রচেষ্টা—এসব কিছু সাধারণ অঞ্চলভিত্তিক ঐক্যকেও অসম্ভব বিষয়ে পরিণত করেছিল, যা কোনো গোত্রের চিন্তায় আসত না; এমনকি হজের মৌসুমে বাৎসরিক ঐক্যের সুযোগেও নয়।

এখান থেকে ইসলাম তাদেরকে উঠিয়ে এনেছে, কোনো জাতীয়তাবাদী ঐক্যের জন্য নয়, যা ইতিহাসের যেকোনো জাহিলিয়াতে হওয়া সম্ভব। কোনো নেতার অধীনে একক দেশ গঠনে একত্রিত হওয়ার জন্যও নয়; বরং ইসলাম তাদের এনেছে ইতিহাসের এক অতুলনীয় ঐক্য গঠনের জন্য, যাদের দ্বারা আকিদার ভিত্তিতে উম্মাহ জন্ম নেবে, যাদের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

tauhiderdak.com

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'[৬৩]

যদি কেউ বিক্ষিপ্ত আরবজাতির মানুষের জন্য বের হওয়া সর্বোত্তম উম্মাহ হয়ে ওঠার পরিবর্তনের ধারা লক্ষ করে, তাহলে অবাক হয়ে দেখবে, এ বিশাল পরিবর্তন একেবারে স্বল্প সময়ে ঘটেছে—যেন কয়েক মুহূর্তেই তা হয়ে গেছে।

সর্বোপরি, এই ঐক্য ছিল আকিদার ভিত্তিতে উম্মাহ গড়ে ওঠা। যার তুলনা ইতিহাসের পূর্বে বা পরের কোনো জাতীয়তাবাদী ঐক্যে বা আধুনিক সামাজিক মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জমায়েতে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই এ কথা বলা যে, আরবরা তখন ইসলাম ব্যতীত নিজ থেকেই একত্রিত হওয়ার উপক্রম ছিল, তা সম্পূর্ণ ভুল।

কীভাবে এই সর্বোত্তম উম্মাহ গঠিত হয়েছে, যারা মানুষের কল্যাণের জন্য বের হয়েছে?

এর সূচনা হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে গোপনে আরকাম বিন আরকামের ঘরে জমা হওয়া স্বল্প কিছু ব্যক্তির মাধ্যমে। যাঁদের প্রত্যেকে তাঁদের চতুষ্পার্শ্বের সমস্ত জাহিলিয়াতকে ত্যাগ ও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন। যাঁরা রক্তের সম্পর্ক ও বংশের বন্ধুত্বকে কর্তন করে নতুন দিকে অভিমুখী হয়েছেন, যার দিকে কালিমা আহ্বান করে। যার সাক্ষ্য তাঁরা অন্তরে, মুখে ও কর্মের মাধ্যমে দিয়েছেন। ফলে এই সাক্ষ্যদানের পর থেকে এই কালিমাই তাঁদের আশ্রয়স্থল এবং জাহিলিয়াতের থেকে পার্থক্যকারী পথে পরিণত হয়েছে।

যখন তাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে একত্রিত হয়েছেন, তখন তাঁরা নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে এসেছেন। তাঁদের অন্তরে নতুন এক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, যা পূর্বে ছিল না এবং আকিদার গণ্ডির বাইরে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। তা হলো, আল্লাহর জন্য সম্পর্ক ও রাসুলের জন্য সম্পর্ক।

জাহিলিয়াতেও মানুষের মাঝে বন্ধুত্ব-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু কীসের ভিত্তিতে?

এটা হয়তো রক্ত-সম্পর্ক বা যৌথ স্বার্থ বা প্রবৃত্তি পূরণে সাক্ষাৎ।

ফলে তা যতই নিকটবর্তী হোক, ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে পৌঁছায় না।

.....

৬৩. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

এসব সম্পর্কের প্রতিটিতে 'আমিত্ব' বিলীন হয় না, যা দুই অন্তরের মাঝে বাধা হয়ে থাকে: যদিও শারীরিকভাবে মিলিত হয়েছে বা চিন্তা ও বুদ্ধিগত ঐক্য হয়েছে। কেননা, প্রতিটি মানুষ তার আমিত্বের পরিধি অনুযায়ী নিজের জন্য একটি গণ্ডি তৈরি করে রাখে, যেখানে সে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে। অতঃপর বিভিন্ন মানুষের সাথে মিলিত ও নৈকট্যশীল হয়। কিন্তু প্রত্যেকে তার চতুষ্পার্শ্বের যে আমিত্বের গণ্ডি অনুভব করে, এর সীমার মধ্যে অন্যদের সাথে সম্পর্ক করে। তাই যখন কেউ অধিক নিকটবর্তী হয়ে তার আমিত্বের নিজস্ব গণ্ডিতে পা ফেলে, তখনই দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

শুধু এক প্রকারের সম্পর্কে এমন বিরোধ ঘটে না। কেননা, তাতে এসব ভ্রান্ত কৃত্রিম গণ্ডি বিলুপ্ত হয়ে যায়, যা মানুষ নিজের চতুষ্পার্শ্বে বানিয়ে রাখে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ নিকটবর্তী হতে হতে একসময় অন্তরঙ্গতা তৈরি হয়। এটাই হচ্ছে আকিদার সম্পর্ক। কেননা, এটা এক মানুষের সাথে অন্য মানুষের অঞ্চল বা ভূমিকেন্দ্রিক সম্পর্ক নয়; বরং এটা আল্লাহ তাআলার জন্য এক বান্দার সাথে অন্য বান্দার সম্পর্ক, যেখানে তাদের অন্তর প্রকাশ্য বা গোপন অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে যায়, যা অন্তরকে নৈকট্য ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থেকে বাধা দিয়ে রাখে। তখন তাদের অন্তর আকাশের সাথে সম্পর্কহীন এসব ভূমি বা বাহ্যিক নৈকট্যের পরিবর্তে ভিন্ন আলোয় আলোকিত হয়ে যায়।

দুজন সাহাবির একসাথে পথ চলতে গিয়ে যদি মাঝে কোনো গাছ তাঁদের মাঝে বিচ্ছিন্ন করে দিত, তাহলে পুনরায় মিলিত হয়ে একে অপরকে সালাম দিতেন রাস্তার এই স্বল্প বিচ্ছিন্নতায় পরস্পরের প্রতি আগ্রহের ফলে।

এক সাহাবি ﷺ এই চিন্তা করে কষ্টে কাঁদছিলেন যে, আখিরাতে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন; অথচ দুনিয়াতেই স্বল্প সময়ের বিচ্ছিন্নতা সহ্য করতে পারছেন না। তখন আয়াত নাজিল হয়,

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

'যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহভাজন নবি, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি, শহিদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে। আর সঙ্গী হিসেবে তাঁরাই উত্তম।'[৬৪]

৬৪. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ৬৯।

tauhiderdak.com

রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরত করে আওস ও খাজরাজের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে দিয়েছেন; ফলে তাঁদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বিলীন হয়ে যায়, যা কত বছর চলমান ছিল, তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর তাঁদের মাঝে সেই ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্ক তৈরি হয়, যা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন,

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

'তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তারপর তিনি তোমাদের অন্তরে হৃদ্যতা সঞ্চার করেছেন; ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই-ভাই হয়েছ।'[৬৫]

অতঃপর আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ইতিহাসের অদ্বিতীয় সেই বিস্ময়কর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে আনসারগণ আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে আদেশ ছাড়া স্বেচ্ছায় নিজ সম্পদের অর্ধেক মুহাজিরদের দিয়েছেন; এমনকি কখনো নিজেদের ওপর তাদের প্রাধান্য দিয়েছেন—

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'যারা এই মুহাজিরদের আগে এ নগরীতে (মদিনায়) বাস করেছে এবং ইমান এনেছে (অর্থাৎ আনসারদের জন্যও)। তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে, তারা তাদের ভালোবাসে; তাদের যা দেওয়া হয়েছে, তার জন্য তারা অন্তরে কোনো চাহিদা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর (তাদের) অগ্রাধিকার দেয়। আর মনের কার্পণ্য থেকে যাদের মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।'[৬৬]

আকিদার সম্পর্কে যে দৃঢ় ও পবিত্র মহব্বত তৈরি হয়ে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের স্তরে চলে যায়, তা অন্য কোনো সম্পর্কে থাকে না। কেননা, আকিদার সম্পর্কে মানুষের

.....

৬৫. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১০৩।

৬৬. সুরা আল-হাশর, আয়াত নং ৯।

tauhiderdak.com

পারস্পরিক অহংকারের কৃত্রিম গণ্ডির মাঝে সংঘর্ষ হয় না, যা জাহিলিয়াতের অধীনে থাকা মানুষের চারপাশে গড়ে ওঠা আমিত্বের মাঝে ঘটে।

এটা কোনো শ্রেণি ভ্রাতৃত্ব নয়, যা 'অভিজাত' ও অভিজাতের মাঝে হয়, অথবা কোনো দেশ বা জাতিকেন্দ্রিক সম্পর্ক নয়, যা এক আরবের সাথে অন্য আরবের ঘটে; বরং তা ছিল জাতি বা রং-বর্ণ বা ভাষা বা সামাজিক অবস্থানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই এক মুসলিমের সাথে অপর মুসলিমের ভ্রাতৃত্ব। যে ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।'[৬৭] যেখানে অন্যসব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে অন্তরগুলো ইমানের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ চাচা হামজার ভাই বানিয়েছেন তাঁর গোলাম জাইদকে। আবু বকরের ভাই বানিয়েছেন খারিজা বিন জাইদকে। ইবনে রাওয়াহার ভাই বানিয়েছেন বিলাল বিন রবাহকে। আকিদার ময়দানে সকল জাতি-ভাষা-রঙের পার্থক্য মুছে বিলাল হাবশি, সুহাইব রুমি ও সালমান ফারসির সাথে একত্রিত হয়েছেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলি-সহ সাহাবিগণ ﷺ। এমনকি রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ) 'সালমান আমাদের আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।'[৬৮] উমর ﷺ আবু বকর ﷺ ও বিলাল ﷺ-এর ব্যাপারে বলেছেন, 'আবু বকর আমাদের সাইয়িদ, তিনি আবার আরেক সাইয়িদকে আজাদ করেছেন।'

তাঁরাই হচ্ছেন 'উম্মাহ', যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে।'[৬৯]

এটাই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে উম্মাহ, যা ইতিহাসের অন্য কোনো জমায়েতে বাস্তবায়িত হয়নি। এটাই হচ্ছে আকিদার ভিত্তিতে উম্মাহ। যেখানে হাকিকি সম্পর্কের ভিত্তিতে সত্যিকার উম্মাহ গড়ে ওঠে।

.....

৬৭. সুরা আল-হুজুরাত, আয়াত নং ১০।

৬৮. মুসতাদরাকুল হাকিম, হাদিস নং ৬৫৩৯।

৬৯. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

উম্মাহ সেটা নয়, জাহিলি সমাজবিজ্ঞানে যার পরিচয় দেওয়া হয়, এটা এমন কিছু মানুষের সমষ্টি, যাদেরকে এক ভূমি, ভাষা, জাতি বা যৌথ স্বার্থ একত্রিত করেছে। অথচ এগুলো সব এমন উপাদান, যেখানে মানুষের কোনো হাত নেই, এবং পশুরাও এগুলোর ভিত্তিতে একত্রিত হয়।

যেমন নির্দিষ্ট ভূমিতে জন্মগ্রহণ করা এমন বিষয়, যা মানুষ নিজে বাছাই করতে পারে না; তাই এর ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে বিভাজন করা হবে নির্বুদ্ধিতা। তেমনই যে ভূমিতে জন্মেছে, সে অঞ্চলের ভাষা গ্রহণ করা এমন বিষয়, যা মানুষ নিজ ইচ্ছায় বাছাই করতে পারে না; তাই এটাও মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদণ্ড হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ ছাড়া জন্মগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া পূর্বের মতোই মানুষের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার বাইরে। অথচ বর্তমানসহ ইতিহাসের সমস্ত জাহিলিয়াত এই চরম নির্বুদ্ধিতায় পতিত হয়েছে। আর 'যৌথ স্বার্থ' এমন বিষয়, যার ভিত্তিতে পশুরাও একত্রিত হয়। যখন তারা চারণভূমি, আবাসস্থল বা পানির জন্য দলবদ্ধ হয়, তখন এক পাল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের যৌথ স্বার্থের জন্য হুমকি অন্য পালের বিরোধিতা করে।

মানুষের মধ্যে সত্যিকার অর্থে শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য হয় আদর্শের ভিত্তিতে। যে জন্য তারা মিলিত হয়, একত্রিত হয়, যা রক্ষার চেষ্টা করে এবং যার পথে জিহাদ করে। তাই সবকিছুর পূর্বে এটাই হচ্ছে শিকড়, যা উম্মাহ গঠন করতে পারে। কেননা, ভূমি, ভাষা, বর্ণ এবং যৌথ বা স্বতন্ত্র অন্য যেকোনো বিষয় ব্যতীত 'আদর্শ' হচ্ছে এমন বিষয়, যার ভিত্তিতে মানুষের জীবন পরিচালিত হওয়া সম্ভব। তাই আকিদা হচ্ছে মানুষের জীবনের এমন মূল উপাদান, যার ভিত্তিতে সত্যিকার উম্মাহ, কল্যাণের জাতি গঠিত হয়। অতঃপর এর নিচে অন্যসব সম্পর্ক একীভূত হয়। যদি ভূমি, ভাষা, বর্ণ বা রক্ত-সম্পর্ক থাকে, তাহলে সেগুলো হবে অতিরিক্ত সংযোজন। তবে আকিদাবিহীন এগুলো সব মিলেও উম্মাহ গঠন করতে পারে না। অন্যদিকে সব সম্পর্ক ব্যতীত আকিদাই এককভাবে এমন বন্ধন, যার ভিত্তিতে উম্মাহ গঠিত হয়। যেখানে আকিদার ভ্রাতৃত্বে এবং ইমানি বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে তাঁরা এমন সীসাঢালা প্রাচীরে পরিণত হয়, যা একে অপরকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখে। এমন এক দেহে পরিণত হয়, যার এক অঙ্গ ব্যথায় আক্রান্ত হলে পুরো দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভোগে।

কুরআন এই মৌলিক বিষয়টির দিকে একাধিক স্থানে ইঙ্গিত দিয়েছে। এটাই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য এবং এর ওপরই সবকিছুর ভিত্তি। এটা সব সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে.

tauhiderdak.com

তবে এটা চিরস্থায়ী থেকে যায়।

নুহ ﷺ-এর ঘটনায় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ - قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ - قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'নুহ তাঁর প্রভুকে ডাকল আর বলল, "হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আপনার ওয়াদাও তো সত্য, আর আপনি হলেন সবচেয়ে বিজ্ঞ বিচারক।" তিনি বললেন, "হে নুহ, আসলে সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে এক দুরাচারী। অতএব তুমি আমার কাছে এমন কিছু চেয়ো না, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হতে উপদেশ দিচ্ছি।" সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক, আপনার কাছে এমন কিছু চাওয়া থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যে বিষয়ে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।"'[৭০]

নুহ ﷺ-কে ইতিপূর্বে তাঁর পরিবারকে তুফান থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তবে যাদের ব্যাপারে হুকুম এসেছে, তারা ব্যতীত—

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

'অবশেষে যখন আমার নির্দেশ এসে গেল এবং চুলো ফেটে পানি বের হলো, তখন আমি বললাম, "সব রকমের জোড়ার দুটি করে (প্রাণী) এবং যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে আর যারা ইমান এনেছে, তাদেরকে নৌকায় উঠিয়ে নাও।" বস্তুত অল্প কয়েকজনই তার সাথে ইমান এনেছিল।'[৭১]

.....

৭০. সুরা হুদ, আয়াত নং ৪৫-৪৭।

৭১. সুরা হুদ, আয়াত নং ৪০।

tauhiderdak.com

নুহ ﷺ তাঁর ছেলেকে নৌকায় আরোহণের জন্য আহ্বান করেছেন, যখন সে দূরে ছিল; কিন্তু সে তখন অস্বীকার করে ডুবন্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ - قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

'নৌকাটি তাদের নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যে চলতে লাগল। নুহ তাঁর পুত্রকে ডাক দিয়ে বলল, সে দূরে সরে ছিল, "বৎস, আমাদের সাথে আরোহণ করো, কাফিরদের সাথে থেকো না।" পুত্র বলেছিল, "আমি একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।" নুহ বলেছিল, "আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করবেন, তাকে ছাড়া (কাউকে) আজ আল্লাহর নির্দেশ থেকে রক্ষা করার কেউ নেই।" এরপর ঢেউ তাদের দুজনের মাঝে অন্তরায় হয়ে গেল আর সে (পুত্র) নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।'[৭২]

অতঃপর যখন পুরো বিশ্ব পানিতে ডুবে যায় এবং নৌকা ওপরে ভেসে উঠে, তখন যারা বাঁচার তারা বেঁচে যায় এবং যারা ধ্বংস হওয়ার ধ্বংস হয়। তখন নুহ ﷺ-এর অন্তর তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্ত ছেলের জন্য আফসোসে ভরে ওঠে এবং তিনি তাঁর রবকে জিজ্ঞেস করেন, সে কীভাবে ডুবেছে? অথচ সে তাঁর পরিবারের সদস্য, আর আল্লাহ তাআলা তাঁর পরিবারকে রক্ষার ওয়াদা করেছেন, যা চিরসত্য।

তখন আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন যে, সত্যিকার সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক নয়; বরং আসল হচ্ছে আকিদার সম্পর্ক—

يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

'হে নুহ, আসলে সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে এক দুরাচারী।'[৭৩]

যখন ছেলে ইমান গ্রহণের অস্বীকার করেছে, তখন আকিদার সম্পর্কের সাথে সাথে অন্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এবং নুহের ছেলে আর তাঁর পরিবারের সদস্য থাকে না; যদিও কুরআন স্পষ্ট শব্দে ছেলে উল্লেখ করেছে, (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ)

.....

৭২. সুরা হুদ, আয়াত নং ৪২-৪৩।

৭৩. সুরা হুদ, আয়াত নং ৪৬।

tauhiderdak.com

ইবরাহিমের ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনো।"'[৭৪]

আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদির মুমিনদের বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের বাপ-ভাইয়েরা যদি ইমানের বিপরীতে কুফরিকে ভালোবাসে, তাহলে তোমরা তাদের অভিভাবক মানবে না। তোমাদের মধ্যে যারা অমন বাপ-ভাইকে অভিভাবক মানে, তারাই জালিম। বলুন, "যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের চেয়ে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতারা, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের গোত্রীয় লোকেরা, ধন-সম্পদ—যা তোমরা উপার্জন করেছ, ব্যবসা-বাণিজ্য—যা তোমরা মন্দা হওয়ার আশঙ্কা করো এবং ঘরবাড়ি—যা তোমরা পছন্দ

৭৪. সুরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত নং ৪।

tauhiderdak.com

করো, তাহলে অপেক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর বিধান (শাস্তি) নিয়ে আসেন। আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথ দেখান না।'"[৭৫]

এখানে সব রক্ত-সম্পর্ক—বরং জাহিলি ঐক্যের সব উপাদান এক পাল্লায় রাখা হয়েছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও জিহাদের মহব্বতকে অন্য পাল্লায় রেখে এই পাল্লাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর যারা আল্লাহ তাআলার এই মানদণ্ডে ত্রুটি করবে, তাদের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

ইসলাম দয়া ও মনুষ্যত্বের কারণে মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণের তাগিদ দিয়েছে; এমনকি তারা মুশরিক হলেও। তবে উত্তম আচরণ এক জিনিস, আর যে সম্পর্কের ভিত্তিতে উম্মাহ গড়ে ওঠে, তা ভিন্ন জিনিস। ওয়ালা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায় যখন আকিদার সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়; কেননা, এটাই হচ্ছে আকিদার অধীনে গড়ে ওঠা উম্মাহর মূল উপাদান। আর অন্যান্য সম্পর্ক অতিরিক্ত সংযোজন—

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ

'রক্তের আত্মীয়রা (উত্তরাধিকারে) আল্লাহর বিধানে পরস্পরের অধিকতর হকদার।'[৭৬]

তবে শর্ত হলো, আকিদা এক হতে হবে, যা ছাড়া সত্যিকার উম্মাহ গঠিত হয় না। আর যে উম্মাহ আকিদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, সেটাকেই আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে।'[৭৭]

আর ইতিহাসের কোনো পর্বে এই ধরনের উম্মাহর পুনরাবৃত্তি হয়নি।

হ্যাঁ, এটা সত্য যে, ইতিপূর্বে ইমানদার বহু উম্মাহ গড়ে উঠেছিল, যারা এমন সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। যারা ছিল উত্তম কল্যাণকর জাতি। তবে তাঁদের পরিধি ও ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা অনেক সীমিত ছিল। কারণ, পূর্বের রাসুলগণকে শুধুই তাঁদের জাতির কাছে পাঠানো হতো। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-কে সমগ্র মানুষের জন্য

.....

৭৫. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ২৩-২৪।

৭৬. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৭৫।

৭৭. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

পাঠানো হয়েছে। তাই উম্মতে মুহাম্মাদি হচ্ছে ইতিহাসে একমাত্র জাতি, যাদের ব্যাপারে তাঁদের রবের সাক্ষ্য হচ্ছে, 'উত্তম জাতি, মানুষের জন্য বের করা হয়েছে।'

যদি এ বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, তাহলে একে ইতিহাসের বড়ো সমাজগুলোর সাথে তুলনা করে দেখুন। যেগুলো একাধিক জাতি, রং, ভাষা বা সংস্কৃতিকে একত্রিত করেছিল। যেমন প্রাচীন রোমান সমাজ, আধুনিক ব্রিটিশ জাতির ঐক্য (কমনওয়েলথ), মার্কিন ঐক্য (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), রাশিয়ান ঐক্য (সোভিয়েত ইউনিয়ন)।

প্রাচীন রোমান সমাজে সমগ্র নেতৃত্বের কেন্দ্রে ছিল একটি 'মূল রাষ্ট্র' এবং বাকি সমস্ত জাতি ছিল পরিপূর্ণ আনুগত্যের স্থানে, যা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সেখানে এমন ভ্রাতৃত্ব ছিল না, যা সেসব জাতি ও জনগোষ্ঠীকে সমতার ভিত্তিতে একই সম্পর্কে আবদ্ধ করবে; এমনকি যখন কনস্টান্টাইন ৩২৫ সালে খ্রিষ্টান হয়ে পুরো সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্ম আবশ্যক করে দেয়, তখনও রোমান সাম্রাজ্যের মানুষের জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র খ্রিষ্টান ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে পরিচালিত হতো না। শুধু একদিকে এর প্রভাব থাকলেও বাকি সমস্ত দিক এমন বিষয়ের দ্বারা পরিচালিত হতো, যাতে ভ্রাতৃত্ব ও সমতার কোনো চিহ্ন ছিল না; বরং তাদের কাজ শুধুই মূল রাষ্ট্রের আনুগত্য করা এবং সাম্রাজ্যের মূল কার্যক্রমের আনুষঙ্গিক ভূমিকা রাখা, যাকে মূল সাম্রাজ্যের মাল ও লোকবলের বিস্তৃতি বলা যায়। মাল হচ্ছে মূল রাষ্ট্রের শাসক ও নেতাদের সম্পদের ভান্ডার জমানো এবং লোকবল হচ্ছে সাম্রাজ্যের স্বার্থ ও চাহিদা বাস্তবায়নে যুদ্ধ করে মারা যাওয়ার জন্য। যেখানে জনগণের কোনো মত প্রকাশ বা মূল রাষ্ট্রের আনুগত্য করে 'সম্মান' অর্জন ছাড়া কোনো কাজ নেই।

আর কমনওয়েলথের ক্ষেত্রে আমাদের একটা নির্দিষ্ট ঘটনা জানা যথেষ্ট হবে। কেননা, এটাই মূল রাষ্ট্র ও উপনিবেশগুলোর মাঝে সম্পর্কের বাস্তবতা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেবে, যাকে তারা 'ব্রিটিশ জনতার ঐক্য' নামকরণ করেছিল।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহারা মরুভূমির ফ্রন্টে, যা মিত্র ও অক্ষশক্তির মাঝে বারবার হাতবদল হচ্ছিল। অতঃপর একসময় অক্ষশক্তির কমান্ডার রমেলের (১৮৯১-১৯৪৪) পরাজয়ের পর তা মিত্র বাহিনীর হাতে স্থির হয়। সেখানে নির্দিষ্টভাবে তবরুক[৭৮] শহরটি দুই শক্তির মাঝে সবচেয়ে বেশি পালাবদল হয়। সে সময় একবার ব্রিটিশদের আক্রমণে জার্মান বাহিনী পিছু হটে। তখন স্বাভাবিকত কোনো বাহিনী

.....

৭৮. বর্তমান লিবিয়ার একটি শহর।

tauhiderdak.com

পিছু হটার সময় ভূমিতে শত শত মাইন বিছিয়ে যেত; যাতে বিজয়ী দলের সর্বোচ্চ ক্ষতি করা যায়। তেমনই এটাও নিয়ম ছিল—অন্তত মিত্র শক্তির কাছে—তারা মানুষের পরিবর্তে মাইন-বিছানো মাঠে উত্তেজিত গাধা বা উটের পাল ছেড়ে দিত; ফলে গাধা-উট মারা যেত এবং মানুষের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হতো। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর কমান্ডার উট-গাধার পরিবর্তে তার বাহিনীর সাদা চামড়ার সেনাদের রাস্তা পরিষ্কারের জন্য ভারতীয় সেনা ডিভিশনকে মাইনের ওপর বিস্ফোরনের জন্য বাধ্য করে। (এই অস্বাভাবিক কাজ কেন করেছে, তা আমি আজও বুঝিনি।) সে যুদ্ধে মিত্র বাহিনী বিশাল জয় লাভ করে এবং যুদ্ধের খবরে বলা হয়, আমরা শত্রুদের ওপর বিজয়ী হয়েছি এবং তবরুক দখল করেছি। আমাদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক স্বল্প। অথচ পুরো ভারতীয় ডিভিশন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে গেছে।

আমেরিকার লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার জন্য সেখানে নিগ্রোদের সাথে সাদা চামড়ার লোকদের আচরণ যথেষ্ট। অথচ তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ভাই এবং খ্রিষ্টান হিসেবেও ভাই। তবুও বহু রেস্টুরেন্ট ও সিনেমাহলে সাইনবোর্ড লাগানো থাকে, 'এখানে নিগ্রো ও কুকুর প্রবেশ নিষিদ্ধ।' এমন ঘটনা সেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক যে, কিছু সাদা চামড়ার লোক একজন নিগ্রোকে পিটিয়ে ও মাটিতে ফেলে লাথি দিয়ে মেরে ফেলছে; অথচ সাদা পুলিশ তাদের এ পবিত্র যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তারা পালিয়ে যাওয়ার পর অজ্ঞাতনামা মামলা দিচ্ছে।

রাশিয়ান জোট (যাকে আকিদার ভিত্তিতে ঐক্য ধারণা করা হতো) যেখানে সত্যিকার ক্ষমতাধারী ছিল মূল রাষ্ট্র রাশিয়া। আর বাকি সোভিয়েত শুধুই কাল্পনিক অস্তিত্বধারী অনুগত গোলাম, যারা প্রধান রাজনীতি বা অন্য কোনো বিষয়ে অংশ নেয় না। তাদের কাজ শুধু আনুগত্য ও বাস্তবায়ন এবং প্রধান পবিত্র নেতার প্রশংসা করা; এমনকি মারা যাওয়ার পরেও তার কবর খুঁড়ে বের করে প্রশংসা করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়, যখন নতুন শাসক এসে আদেশ করে। অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, রাশিয়ার অধীন সব সোভিয়েত থেকে শিল্পকারখানা নির্মূল করে রাশিয়ার অভ্যন্তরে স্থানান্তর করা হয়; যাতে এটাই শক্তিশালী হয়ে মূল ক্ষমতাধারী হয়ে থাকে!

অন্যদিকে আকিদাভিত্তিক বা আকিদার আলোকে গড়ে ওঠা সমাজে মানুষের সমস্ত সম্পর্কের মূল থাকে আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক।

tauhiderdak.com

বাস্তব দুনিয়ায় এই ভ্রাতৃত্ব যত বেশি বাস্তবায়িত হবে, সত্যিকার অর্থে উম্মাহর মর্ম তত বেশি অর্জিত হবে এবং কিয়ামতে আল্লাহর মানদণ্ডে তত ভারী হবে এবং বাস্তব দুনিয়ার ইতিহাসেও তাদের তত বেশি মূল্যায়ন হবে।

নিঃসন্দেহে সেই সোনালি প্রজন্ম সবচেয়ে বেশি এই ভ্রাতৃত্ব বাস্তবায়ন করেছেন। তাই তাঁরা ছিলেন আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত, যাঁদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে আমার প্রজন্মই সর্বোত্তম', তেমনই মানব ইতিহাসেও তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

সেই প্রজন্ম জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই ভ্রাতৃত্ব বাস্তবায়ন করেছেন। মুহাজিরগণ তাঁদের নিজেদের মাঝে তা বাস্তবায়ন করেছেন, তেমনই আনসারগণ তা প্রয়োগ করেছেন। অতঃপর আনসার ও মুহাজিরগণ তাঁদের মাঝে ঐতিহাসিক সেই ভ্রাতৃত্ব বাস্তবায়ন করেছেন, যা আল্লাহ তাআলার এই দয়ার উপযুক্ত হয়েছে—

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'তিনি তাদের অন্তরেও হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন। আপনি যদি পৃথিবীর তাবৎ সম্পদও ব্যয় করতেন, তবুও তাদের অন্তরে হৃদ্যতা সৃষ্টি করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৭৯]

তাদের এই কাফালা বা দায়িত্বগ্রহণ শুধু পরিবার ও রক্ত-সম্পর্কের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা পুরো ইসলামি সমাজে বিস্তৃত ছিল। এটা শুধু ফরজ জাকাতের সীমায় আবদ্ধ ছিল না, যা বাইতুল মাল থেকে গরিবদের মাঝে বিলি করা হতো; বরং আল্লাহর রাস্তায় আমভাবে দানে পরিণত হয়।

এমন কাফালা, যা ইসলামি সমাজের অভাবীদের সাহায্যে ক্ষান্ত ছিল না; বরং আর্থিক সাহায্য ব্যতীত অন্য অর্থেও প্রয়োগ হতো। তা ছিল সকলের সম্পদ, রক্ত ও সম্মান রক্ষা করা, যেখানে ধনী, গরিব, শক্তিশালী ও দুর্বল সকলেই সমান।

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

৭৯. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৬৩।

tauhiderdak.com

'নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদাসম্পন্ন।'[৮০]

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

'সমস্ত মুসলিমের রক্ত সমান। একজন সাধারণ মুসলিমও যেকোনো লোককে নিরাপত্তা দিতে পারে।'[৮১]

কল্যাণের ক্ষেত্রে ও কল্যাণ প্রসারের কাজে এবং মানুষকে উঁচু স্তরে উঠিয়ে আনার মিশনে পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণ করা এই বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ

'ইমানদার পুরুষেরা ও ইমানদার নারীরা একে অপরের সুহৃদ। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়িম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে।'[৮২]

এই ধরনের সেই সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বগ্রহণ (যার আংশিক কিছু বিষয় নিয়ে বর্তমানে আলোচনা হচ্ছে) আকিদাভিত্তিক উম্মাহ ব্যতীত সম্ভব নয় এবং তারা ব্যতীত কেউ তা প্রয়োগ করে না। কেননা, দায়িত্বগ্রহণের মূল ভিত্তিই আকিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটা এর মানসিক ও আচরণগত গঠনের অংশ।

প্রথম প্রজন্ম পারস্পরিক একে-অপরের দায়িত্ব মানুষের সাধ্যের ভেতর সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছে; চাই তা আর্থিক কাফালা গ্রহণের ক্ষেত্রে হোক, যেমন আনসার সাহাবিগণ নিজ সম্পদের অর্ধেক মুহাজিরদের প্রদান করেছেন, অথবা ইসলামি আদর্শ ও বিশ্বাস রক্ষার ক্ষেত্রে হোক, যেখানে এক মুমিন তার অপর মুমিন ভাইকে বলছে, 'আসো, কিছুক্ষণ ইমান চর্চা করি।' অর্থাৎ ইমানের অর্থ-মর্ম নিয়ে আলোচনা করি; যাতে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। ফলে আপনি দেখবেন, পুরো মানব ইতিহাসে সেই প্রজন্মে অপরাধ-শত্রুতা সবচেয়ে কম এবং রক্ত, সম্মান, সম্পদ

.....

৮০.সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ৬৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১২১৮।

৮১. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং ২৭৫১।

৮২. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ৭১।

tauhiderdak.com

সবচেয়ে বেশি রক্ষিত হয়েছে। প্রত্যেক ভাই তাঁর অপর ভাইয়ের মর্যাদা ও অনুভূতির ব্যাপারে সবচেয়ে সতর্ক ছিলেন। যেমন, আবু জার ﷺ একবার এক কালো ব্যক্তিকে বলেছিলেন, 'হে নিগ্রোর বাচ্চা!' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, (يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ،) 'হে আবু জার, তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে তিরস্কার করছ?! তুমি তো এমন ব্যক্তি, তোমার মধ্যে এখনো জাহিলি স্বভাব বিদ্যমান।'[৮৩] তখন আবু জার ﷺ সে ব্যক্তির নিকট গিয়ে মাটিতে গাল রেখে তাকে বলেছেন, 'আমার গালে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাও।' অন্যদিকে আরব কুরাইশি উমর ﷺ হাবশি গোলাম বিলাল ﷺ-এর ব্যাপারে বলছেন, 'আমাদের নেতা বিলাল।'

ইতিহাসের অদ্বিতীয় সেই প্রজন্ম রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষ্যেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো ও দূরবর্তী প্রভাব ফেলতে পেরেছেন। যার কারণ তাঁদের সংখ্যা, সরঞ্জাম ও সামরিক অভিজ্ঞতা ছিল না; বরং এ সবই ছিল শত্রুর ভাগ্যে—তাঁদের শক্তির উৎস ছিল সেই হক বা সত্য, যা সেই প্রজন্ম গ্রহণ করেছিল এবং যার ভিত্তিতে তাঁরা একত্রিত হয়েছিল। এ ছাড়াও ছিল তাঁদের অগ্রযাত্রার ব্যাপকতা, যে প্রেরণায় তাঁরা যাত্রাপথের সব ধরনের বাতিলকে ধ্বংস করে এগিয়ে গেছেন। সেই মুমিন দলটি দুনিয়ার বিশাল অংশে জাহিলিয়াতকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে একেবারে অস্তিত্ব মুছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে শুধু রাষ্ট্র, প্রশাসন বা বাহিনীর অস্তিত্ব বিলীন হয়নি; বরং মানুষের বাতিল বিশ্বাস, শাসনব্যবস্থা ও ঐতিহ্য মুছে দিয়েছেন।

তাঁদের কাজ শুধু রাষ্ট্র, প্রশাসন ও বাহিনীর বিশ্বাস, শাসনব্যবস্থা ও ঐতিহ্য দূর করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; কেননা, এটি যেকোনো প্রবল শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর পক্ষে সম্ভব। যেমন হ্যানিবল, চেঙ্গিস খান, নেপোলিয়ন ও হিটলার কিছু সময় এমন রাজনীতি বাস্তবায়ন করেছে; বরং সেই আকিদাভিত্তিক উম্মাহর মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল, তাঁরা পুরো বিশ্বে কোনো বাধ্যতা ছাড়া সত্যের আকিদার প্রসার করেছেন, তেমনই সেই আকিদার ভাষাও কোনো জোরজবরদস্তি ছাড়া প্রচার করেছেন।

মুসলিমরা পুরো পারস্য সাসানি সাম্রাজ্যকে বিলুপ্ত করেছে তাদের এত শক্তি-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং গ্রেট রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল অংশ জয় করেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার আদেশ বাস্তবায়নার্থে জমিনের তাগুতদের পতন ঘটানোর মাধ্যমে মানুষকে সঠিক আকিদা গ্রহণে বাধা দানকারী সরকার, শাসনব্যবস্থা ও বাহিনী দূরীভূত করার

৮৩. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ৩০।

tauhiderdak.com

পরেও মানুষকে আকিদা গ্রহণে বাধ্য করেননি—

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা (শিরক-কুফর) নির্মূল হয়, আর দ্বীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।'[৮৪]

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'ধর্মে (ইমান গ্রহণের জন্য) বলপ্রয়োগ নেই। ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অতএব যে তাগুতকে (ভ্রান্ত মাবুদ) অমান্য করবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে, সে অবশ্যই দৃঢ়তম রশি আঁকড়ে ধরবে, যা (কখনো) ছিঁড়বে না। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।'[৮৫]

কিন্তু সেই প্রজন্মের হাতে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় যা ঘটেছিল, তা হলো যাদেরকে ইসলামি আকিদা গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি, তারা স্বেচ্ছায় দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছে, মুসলিমদের আগমনে খুশি হয়েছে এবং তাদেরকে মহব্বত করে এই উম্মাহর অংশ ও ইসলামের সৈনিকে পরিণত হয়েছে। তেমনই তারা নতুন আকিদার ভাষায় কথা বলা শুরু করেছে এবং পূর্বের সমস্ত ভাষা ভুলে গেছে।[৮৬]

নিঃসন্দেহে এমনটা ঘটত না, যদি এই উম্মাহ শুধু যুদ্ধে বিজয়ের জন্য আসত বা তাদের শুধু বিস্তৃতির লোভ থাকত বা ইতিহাসের অন্যান্য সকল বড়ো সাম্রাজ্যের মতো জমিনে ক্ষমতা ও অনিষ্টতা চাইত।

এই বিজিত অঞ্চলগুলো বিজয়ী জাতির আকিদা গ্রহণ করেছে এবং তাদের ভাষায় কথা বলা শুরু করেছে; কেননা, তারা তাদের মাঝে এমন আদর্শ খুঁজে পেয়েছে, যা ইতিহাসে কখনো পুনরাবৃত্তি হয়নি। এমন আদর্শিক আকিদার উম্মাহ, যারা বিস্তৃতি ও ক্ষমতার জন্য অঞ্চল জয় করে না; বরং তারা যুদ্ধ করে আলো, ইনসাফ ও নিরাপত্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এমন উঁচু মূল্যবোধ প্রচারের জন্য, যা অন্তরকে জীবিত করে এবং অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়।

৮৪. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৩৯।

৮৫. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২৫৬।

৮৬. এমনকি মিশর, শাম ও অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিষ্টানরাও তাদের মূল ভাষা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় এবং আরবি ছাড়া তারা অন্য কোনো ভাষা ব্যবহার করত না; যদিও তারা এই দ্বীন গ্রহণ করেনি।

tauhiderdak.com

তিন.

বাস্তব জীবনে ইসলামি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা

এই উম্মাহর জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশ হচ্ছে, বাস্তব দুনিয়ায় আল্লাহর ন্যায়নীতি বাস্তবায়ন করা এবং একে ইমানের হাকিকতের সাথে সংযুক্ত করা—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে গেলেও তোমরা আল্লাহর (পক্ষে) সাক্ষী হিসেবে ন্যায়ের ওপর অটল থাকবে। (সাক্ষ্য যার বিরুদ্ধে যাবে) সে ধনী হোক বা গরিব হোক আল্লাহই উভয়ের ভালো রক্ষক। অতএব তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, পাছে (ন্যায় থেকে) বিচ্যুত হও। আর যদি তোমরা (সাক্ষ্য) ঘুরিয়ে দাও কিংবা এড়িয়ে যাও, তাহলে (জেনে রাখবে) তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা অবগত আছেন। হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং তিনি যে কিতাব তাঁর রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন এবং যে কিতাব তার আগে নাজিল করেছিলেন, এর ওপর ইমান আনো। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ ও শেষ দিবসকে (পরকালকে) অবিশ্বাস করবে, সে সুদূর (গুরুতর) বিভ্রান্তিতে পতিত হবে'[৮৭]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

৮৭. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ১৩৫-১৩৬।

tauhiderdak.com

'হে ইমানদারগণ, আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষীরূপে তোমরা অবিচল থেকো। কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন ন্যায়বিচার না করতে তোমাদের প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করবে। এটা তাকওয়ার অধিকতর কাছাকাছি। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার খবর রাখেন।'[৮৮]

ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অংশ হওয়া ও এটা শুধুই আল্লাহর জন্য প্রয়োগ করা, এই উম্মাহর মূল বৈশিষ্ট্য এবং তাঁদের অস্তিত্বের প্রধান উপাদান; যাতে তাঁরা পুরো মানবসভ্যতার নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অন্তরের প্রবৃত্তির ওপর জয়ী হওয়া এবং বাস্তব জীবনে জুলুম ও শত্রুতা সৃষ্টিকারী মনের আবেগ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা এমন বিষয়, যে জন্য অনেক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন; যাতে অন্তর হকের সামনে অনুগত থেকে অভ্যস্ত হয় এবং এটা থেকে বিচ্যুত না হয় এবং মানুষ ন্যায়ের পাল্লা মধ্যবর্তী স্থলে আঁকড়ে ধরে, ডানে-বামে হেলে না যায়।

এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম বাস্তব জগতে আল্লাহর ন্যায়নীতি বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন এবং এমনভাবে তা বাস্তবায়ন করেছেন, ইতিপূর্বে যার কোনো নজির ছিল না; এমনকি ন্যায়বান শাসকদের যুগেও নয়। আর পরবর্তী সময়ে মানবজাতি বর্তমান যুগে গণতন্ত্রের নামে কিছু অধিকার প্রদানের দাবি করে সর্বোত্তম মূল্যবোধ ও আদর্শ বাস্তবায়নে অলীক কল্পনার পর্যায়ে এসেও সেই যুগের দৃষ্টান্ত চির অম্লান ও আধুনিক জাহিলিয়াতের ভ্রান্তি উন্মোচনের মাপকাঠি হয়ে আছে।

আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে প্রস্তুত করেছেন; যাতে তারা পুরো মানবজাতিকে কল্যাণের দিকে পথ-প্রদর্শন করতে পারে এবং কিয়ামতে তাদের ওপর সাক্ষী হতে পারে। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এই মহান লক্ষ্যে তাদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব দিয়েছেন—

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

'আর এভাবে আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী (সেরা) জাতি বানিয়েছি;

.....

৮৮. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৮।

tauhiderdak.com

যাতে তোমরা মানুষের ব্যাপারে সাক্ষী হও, আর রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের ব্যাপারে।'[৮৯]

এ উম্মাহকে বিশ্বের বুকে তাঁর দায়িত্ব আদায়ের জন্য অনেক বিস্ময়করভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়। প্রথমে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ-কে গড়ে তোলেন এই বিষয়ের ভিত্তিতে যে, দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি কামনা ব্যতীত তাঁর কিছুই নেই।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

'আপনার কিছু করার নেই; তিনি হয় তাদের ক্ষমা করবেন নতুবা শাস্তি দেবেন; কেননা, তারা জালিম।'[৯০]

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ

'তাদের বিমুখতা যদি আপনার কাছে কষ্টকর হয়, তাহলে পারলে তো আপনি ভূগর্ভে যাওয়ার একটি সুড়ঙ্গ অথবা আসমানে ওঠার একটি সিঁড়ি অনুসন্ধান করে (সেখান থেকে) তাদের জন্য কোনো নিদর্শন নিয়ে আসতেন।'[৯১]

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

'আপনি যাকে পছন্দ করেন, (ইচ্ছা করলেই) তাকে সুপথে আনতে পারেন না; বরং আল্লাহই যাকে চান সুপথে আনেন। আর তিনিই সুপথপ্রাপ্তদের ভালো জানেন।'[৯২]

যদিও ওহির ভিত্তিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন যে, কোনো মুসাফির ইয়ামানের সানা থেকে সফরে বের হবে আর সে পথে আল্লাহ ও তাঁর সম্পদে বাঘের আক্রমণ ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় করবে না; কিন্তু মক্কায় গড়ে ওঠার সময়ে একবারের জন্যও রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে

.....

৮৯. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৪৩।
৯০. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১২৮।
৯১. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ৩৫।
৯২. সুরা আল-কাসাস, আয়াত নং ৫৬।

tauhiderdak.com

এই ওয়াদা দেননি যে, তিনি নিজ জীবদ্দশায় বিজয় ও দ্বীন বাস্তবায়ন দেখে যেতে পারবেন। তখন রাসুলের ওপর ওহি নাজিল হতো—

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

'আমি তাদেরকে যা (যে শাস্তির) ওয়াদা করছি, তার কিছুটা যদি আপনাকে দেখাই অথবা যদি (তার আগেই) আপনার জীবনাবসান ঘটাই, তাহলেও আপনার কর্তব্য তো শুধু (সত্যের বাণী) পৌঁছে দেওয়া। হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব তো আমার।'[৯৩]

এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলের জন্য নির্দেশনা; যাতে রাসুলের অন্তরে এই মানসিকতা স্থির হয় যে, দুনিয়াতে দাওয়াহ পৌঁছিয়ে দেওয়া ব্যতীত কিছুই নেই। যাতে তাঁর অন্তরে কোনো কিছু এমনকি অমুক বা তমুকের হিদায়াতের প্রতিও প্রত্যাশা না থাকে, যারা হিদায়াত প্রত্যাখ্যান করার ফলে রাসুল ﷺ নিজেকে শেষ করে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিলেন—

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

'তারা এই বাণী (কুরআন) বিশ্বাস না করলে দুঃখে আপনি হয়তো তাদের পেছনে নিজের জীবন শেষ করে দেবেন।'[৯৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশনা অনুধাবন করেছেন; ফলে তিনি ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর জন্য নিবেদিত। অতঃপর তিনি সাহাবিদেরকে এমনভাবে সবকিছুর প্রত্যাশা থেকে মুক্ত করে গড়ে তুলেছেন, একপর্যায়ে 'তাঁদের অন্তর নিজেদের জন্যও কোনো প্রত্যাশা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।' এটা ছিল দুনিয়ায় তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ উম্মাহ যে মহান দায়িত্ব পালন করবে, এর মহৎ প্রস্তুতির অংশ। কেননা, রাসুল প্রেরণ ও কিতাব নাজিলের মূল উদ্দেশ্য হলো, বাস্তব দুনিয়ায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। এটা সঠিকরূপে শুধু তখনই বাস্তবায়ন সম্ভব, যখন অন্তরগুলো পূর্ণরূপে আল্লাহর সামনে নিবেদিত হবে এবং সবকিছু থেকে; এমনকি বৈধ আগ্রহ ও প্রত্যাশা থেকে মুক্ত হবে। তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হবে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর একমাত্র আত্মিক প্রশান্তি হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

.....

৯৩. সুরা আর-রাদ, আয়াত নং ৪০।

৯৪. সুরা আল-কাহফ, আয়াত নং ৬।

tauhiderdak.com

অতঃপর কুরআনের নির্দেশনা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা ছিল, যাতে এই উম্মাহ উঁচু স্তরে উন্নত হয়ে দুনিয়াতে শুধু শাসন প্রতিষ্ঠা নয়; বরং দক্ষতার সাথে সমগ্র মানবসভ্যতার নেতৃত্বদানে উপযুক্ত হয়। তেমনই শুধু নিজেদের মাঝে আল্লাহর ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা নয়; বরং অন্যদের মাঝেও তা প্রয়োগ করতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা মদিনায় অবতীর্ণ কুরআনের অংশের শুরু থেকেই এমন আয়াত নাজিল করেছেন, যা এই দিকে ইঙ্গিত করে—

الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

'আলিফ-লাম-মিম। এ সেই কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ, যারা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজ কায়িম করে, আর আমি তাদের যা দান করেছি, তা থেকে (সৎ কাজে) ব্যয় করে; যারা আপনার কাছে যা নাজিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে (অন্য নবিদের কাছে) যা নাজিল করা হয়েছিল, তা বিশ্বাস করে; আর পরকালের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।'[৯৫]

মাদানি সুরাগুলোর বহু আয়াতে তা পুনরাবৃত্তি হয়েছে—

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

'রাসুলের কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে, তা তিনি বিশ্বাস করেছেন, ইমানদারগণও (তাই করেছে)। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রাসুলদের প্রতি ইমান এনেছে। (তারা বলেছে,) "আমরা তাঁর রাসুলদের মধ্যে কারও সাথে কারও তারতম্য করি না।"'[৯৬]

.....

৯৫. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১-৪।

৯৬. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২৮৫।

tauhiderdak.com

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এবং তিনি যে কিতাব তাঁর রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন এবং যে কিতাব তার আগে নাজিল করেছেন, এর ওপর ইমান আনো।'[৯৭]

এই বিষয়টা আকিদার সাথে সম্পৃক্ত, যা বাহ্যিকভাবেই স্পষ্ট।

হাদিসে জিবরিলে এসেছে—

أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

'জিবরিল ﷺ নবিজি ﷺ-কে বলেন, "ইমান কী?" তিনি বলেন, "আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, আখিরাত দিবস ও তাকদিরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা।"'[৯৮]

কিন্তু এখানে বিশ্বাসগত বিষয়ের পাশাপাশি এই উম্মাহকে মানবজাতির নেতৃত্বদানের জন্য প্রস্তুত করে তোলার সাথেও সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, যত জাতি তাদের রাসুলের ওপর ইমান এনেছে ঠিক; কিন্তু অন্য রাসুলের ওপর ইমান আনতে অস্বীকার করেছে, তারা এর ফলে সেসব রাসুলের অনুসারীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা অনুভব করে এবং নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে যে রাসুলগণের ওপর ইমান আনেনি, তাঁদের জাতির ওপর নিকৃষ্ট নির্যাতন চালায়। যে আচরণ ইহুদিরা ইসা ﷺ-এর অনুসারী আসহাবে উখদুদের সাথে করেছে। পরবর্তী সময়ে ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় বিশ্বের যেখানেই মুসলিমদের ওপর ক্ষমতাশীল হয়েছে, সর্বত্র এমন জুলুম ও নির্যাতনের বর্বরতা চালিয়েছে।

এমন ঘৃণ্য চরিত্রধারী কেউ মানুষের নেতৃত্বের জন্য যোগ্য নয়। তাই আল্লাহ তাআলা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের এই নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করেননি। যদিও আল্লাহর ইচ্ছায়[৯৯]

৯৭. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ১৩৬।

৯৮. মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং ১৯১।

৯৯. ইহুদি-খ্রিষ্টানরা শুধু তখনই নেতৃত্ব পেয়েছে, যখন মুসলিমরা তাঁদের দায়িত্ব আদায়ে অবহেলা শুরু করেছে, যা সামনে বর্ণিত হবে।

tauhiderdak.com

কখনো তারা নেতৃত্ব পেয়েছে, যেমন গত তিন শতাব্দী যাবৎ খ্রিষ্টানরা এবং বর্তমানে ইহুদিরা প্রত্যক্ষ বা পর্দার পেছন থেকে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু তারা ইনসাফ কায়িম করতে পারেনি; বরং সর্বত্র জুলুম ও নির্যাতন চলছে।

অন্যদিকে যে উম্মাহকে আল্লাহ তাআলা মানবসভ্যতার নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য বের করে এনেছেন, তাঁরা সকল রাসুল ও রিসালাতের ওপর ইমান আনে; ফলে তাঁদের অন্তরে অন্য মানুষের সূচনা থেকে বা ঐতিহাসিকভাবে কোনো ঘৃণা থাকে না।

এটা—আল্লাহই ভালো জানেন—কুরআনের এই মহান নির্দেশনার একটি অংশ।

অতঃপর কুরআনের আরও নির্দেশনার দিকে লক্ষ করুন।

মদিনার ইহুদিরা ইসলাম ও রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলিমদের সাথে তাদের স্বভাবগত মন্দ প্রবৃত্তি ও মানুষের কল্যাণের প্রতি ঘৃণা থেকে প্রচণ্ড শত্রুতা করত। পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ ﷺ ইসহাক ﷺ-এর বংশে না এসে ইসমাইল ﷺ-এর বংশে আগমনের ফলে কঠিন বিদ্বেষ পোষণ করত।

তারা ওহির ব্যাপারে সন্দেহ ছড়াত, রাসুলের আমানতের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করত। ইসলাম এসে মুসলিমদের মাঝে সব দ্বন্দ্ব-বিভেদ মীমাংসা করে দেওয়ার পরে ইহুদিরা এসে আবার তাদের মাঝে ঝগড়া বাধানোর চেষ্টা করত। মুনাফিকদের সাথে বিশেষ করে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথে মিলে মুসলিমদের সারিতে ফিতনা ঘটানোর চক্রান্ত করত। মুশরিক গোত্রগুলোকে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করত। রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং মুমিন নারী-পুরুষকে কষ্ট দিত। যা ওহির বর্ণনায় এসেছে এবং সিরাত ও ইতিহাসের কিতাবেও লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এ প্যাঁচ-লাগানো অস্থিতিশীল পরিবেশেই প্রকাশ্যে ইসলামে প্রবেশকারী এক মুনাফিক চুরি করে এবং সে ও তার গোত্রের লোকেরা চক্রান্ত করে চুরিকে এমনভাবে গোপন করে; যাতে মদিনার এক ইহুদির ওপর অপবাদ আরোপ হয়।

যখন দুনিয়ার যেকোনো সমাজে ইতিহাসের যেকোনো সময় এমন ঘটনা ঘটে, তখন শুধু একটি পরিণতি হয়। তা হলো, সেই বিরোধী দলের ব্যক্তিকে ধরে দ্রুত শাস্তি দিয়ে দেওয়া; এমনকি অধিকাংশ সময় চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নির্যাতন করা হয়। কেননা, সে শত্রুর দলের সদস্য হওয়ার পাশাপাশি নিজ জাতির এক সদস্যের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অপরাধ করেছে।

tauhiderdak.com

যখন বিচারক রাসুলুল্লাহ ﷺ মামলা বিশ্লেষণ করে বাহ্যিক প্রমাণের ভিত্তিতে সেই ইহুদির ওপর ফায়সালা দেওয়ার উপক্রম হয়েছেন, তখন আসমান থেকে ওহি এসে সে ইহুদিকে এই অপরাধের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, যা সে করেনি; যদিও সে এমন গোত্রের সদস্য ছিল, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে-গোপনে সব ধরনের অপরাধ করেছে এবং তাঁদেরকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যখন এই বিচারে মূল অপরাধী বেঁচে গিয়ে এক নিরপরাধ ইহুদি ফেঁসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন সুরা নিসার এই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا - وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا - يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا - هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا - وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا - وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا - وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا - وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

'আমি আপনার কাছে সত্য সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছি; যাতে আপনি আল্লাহর দেখানো (শেখানো) জ্ঞান দ্বারা লোকদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করতে পারেন। তাই আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হবেন না। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদের পক্ষে বিতর্ক করবেন না। বস্তুত আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক পাপীকে ভালোবাসেন না। তারা মানুষের কাছ থেকে (চক্রান্ত) গোপন করতে চায়; কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে চায় না; অথচ তারা যখন রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে

tauhiderdak.com

এমনসব কথা বলে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তখন তিনি তাদের সাথেই থাকেন। আল্লাহ তাদের কাজকর্ম পরিবেষ্টন করে আছেন। দেখো, তোমরাই ইহকালীন জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করেছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন কে তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করবে, অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে? যে লোক কোনো খারাপ কাজ করে, কিংবা নিজের প্রতি অন্যায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। যে লোক কোনো পাপ করে, সে তা নিজের বিরুদ্ধেই করে (তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে)। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। যে লোক কোনো অন্যায়, কিংবা পাপ করে, তারপর তা কোনো নিরপরাধ লোকের দিকে নিক্ষেপ করে (অর্থাৎ কোনো নিরপরাধ লোকের ওপর তার দায় চাপায়), সে একটি অপবাদ ও স্পষ্ট পাপ বহন করল। যদি আপনার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তাহলে তাদের একটি দল অবশ্যই আপনাকে বিভ্রান্ত করার সংকল্প করত। তবে প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল নিজেদেরকেই বিভ্রান্ত করছে। তারা আপনার কোনোই ক্ষতি করতে পারছে না। আল্লাহ আপনার কাছে কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না, আপনাকে তা শিখিয়েছেন। আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়ো।'[১০০]

এটা ছিল মুসলিমদের জন্য এক বিশাল শিক্ষা। তা হলো, ন্যায়ের পাল্লা ভালোবাসা বা ঘৃণার ফলে হেলে যায় না। তেমনই পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিক স্বার্থের ফলেও তা বিচ্যুত হয় না; এমনকি আকিদার ক্ষেত্রে মুশরিকদের মতো বিরোধীদের দিকেও হেলে না; যদিও তারা সামষ্টিকভাবে জালিম।

তারবিয়াহ-কেন্দ্রিক একটি নমুনা দেখুন। একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ এক ইহুদি থেকে ঋণ নেন। কিন্তু কোনো কারণে তা পরিশোধ করতে তাঁর দেরি হয়ে যায়। তখন ইহুদি এসে তা চাইতে থাকে এবং কঠোর আচরণ করে; এমনকি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় ধরে ঘাড়ের চারপাশে প্যাঁচিয়ে টানতে থাকে; ফলে তাঁর দুই চোখ ফুলে যায়। এটা দেখে উমর ﷺ তাকে তরবারি দিয়ে আঘাতের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিষেধ করে বলেন, 'হে উমর, তুমি তো অন্য কিছুর উপযুক্ত ছিলে। তুমি আমাকে ঋণ পরিশোধ ও তাকে নম্র আচরণের আদেশ করতে পারতে।'

১০০. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ১০৫-১১৩।

tauhiderdak.com

এভাবেই আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ এই উম্মাহকে গড়ে তুলেছেন; যাতে তারা বিশ্বনেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত গুণাবলি অর্জন করতে পারে।

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

'তারা (আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্তরা) এমন যে, আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়িম করবে, জাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহর হাতেই সবকিছুর পরিণতি।'[১০১]

যেন তারা বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব ও কিয়ামত দিবসে তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত হয়ে ওঠে—

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

'আর এভাবেই আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী (সেরা) জাতি বানিয়েছি; যাতে তোমরা মানুষের ব্যাপারে সাক্ষী হও, আর রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের ব্যাপারে।'[১০২]

সুতরাং এখন কি আমরা আশ্চর্য হব, যখন আমরা দেখি সাহাবায়ে কিরাম ﷺ জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার পর আল্লাহর ন্যায়নীতি বাস্তবায়নের সেই অতুলনীয় দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন?

একবার মিশরের গভর্নর আমর বিন আস ﷺ এক কিবতি যুবকের সাথে প্রতিযোগিতা করেন। প্রতিযোগিতায় কিবতি যুবক এগিয়ে যায়। ফলে আমর ﷺ তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেন, 'এটা নাও; কারণ, আমি সম্মানিত ব্যক্তির ছেলে।' তখন কিবতি ছেলের পিতা মদিনায় গিয়ে উমর ﷺ-এর কাছে অভিযোগ পেশ করে।

১০১. সুরা আল-হাজ, আয়াত নং ৪১।

১০২. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৪৩।

tauhiderdak.com

এখানে একটু চিন্তা করুন...

ইতিপূর্বে কিবতিরা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও রোমান শাসনের অধীনে কঠিন লাঞ্ছনার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়েছে। যার কারণ ছিল, তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। কিবতিরা ছিল অর্থডক্স আর রোমানরা ছিল ক্যাথলিক। ফলে একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও খ্রিষ্টানরা কিবতিদের নির্যাতন করত; এমনকি বহু মানুষকে তারা হত্যাও করেছে। গির্জাগুলোতে দুই স্তরে উপাসনা হতো। প্রকাশ্যে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শে উপাসনা হতো, আর গির্জার ভূগর্ভস্থ কক্ষে রোমানদের চোখের আড়ালে কিবতিরা তাদের মতো করে ইবাদত করত। কেননা, রোমানরা দেখে ফেললেই নির্যাতন করত।

সেই (মহান!) রাষ্ট্রের একটা সাধারণ কর্ম ছিল তাদের মিশরি কিবতি জনতাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করা। কিবতিরা কোনো অভিযোগ করত না। আর তা করতে চাইলেও বা কাকে করবে! তাদের অন্তর পরাজিত হয়ে যায় এবং অপদস্থ হয়ে চাবুকের প্রহার সহ্য করে নিতে থাকে। অথচ আজ এক ব্যক্তি হাজার মাইল সফর করে তার যুবক ছেলের পিঠে লাঠির আঘাতের অভিযোগ করতে গেছে! এটা কী প্রমাণ করে?

এটা দুটো বিষয় প্রমাণ করে। প্রথমত, সেই জাতির অন্তরে মর্যাদার অনুভূতির প্রমাণ, যা পুনরায় জাগ্রত হয়েছে। ফলে একটা লাঠির আঘাতের ব্যাপারেও অভিযোগ করতে গেছেন; অথচ তারাই চাবুকের আঘাতে লাঞ্ছিত হতো। দ্বিতীয়ত, এখন একটা ভরসাস্থল পাওয়া গেছে, যেখানে অভিযোগ করা যাবে। পূর্বে যা ছিল না।

এই দুটোই উমর ﵁-এর হাতে আল্লাহর ন্যায়নীতির বাস্তবায়নের প্রমাণ; ফলে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়েছে। আর দুনিয়ায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য কিছু কি এমনভাবে মর্যাদাবোধ জাগ্রত করতে পারে? তারা আশ্রয়স্থল পেয়েছে; ফলে অভিযোগ জানাতে গেছে।

কিন্তু সেই ঘটনাটি ছিল আরও গভীর ও সুদূরপ্রসারী! উমর ﵁ তখন কিসাসের আদেশ দিয়ে বসেন। সেই লোকের হাতে লাঠি দিয়ে বলেন, 'সম্মানিত ব্যক্তির ছেলেকে মারো!' অতঃপর তিনি গভর্নর আমর বিন আস ﵁-কে প্রসিদ্ধ সেই অমর বাণী বলেন, 'হে আমর, কখন থেকে মানুষকে গোলাম বানাতে শুরু করেছ; অথচ মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছে!'

এ কিসাস এক মুসলিম থেকে অপর মুসলিম বা এক আরবি থেকে অপর আরবির জন্য ছিল না। তখন হয়তো মানুষ বলত, এটা ইনসাফ, ঠিক আছে। কিন্তু তাতে

tauhiderdak.com

অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আলি ﷺ-এর একটি বর্ম হারিয়ে গেলে তা এক ইহুদির নিকট পাওয়া যায়। কাজি শুরাইহের কাছে এর বিচার চাওয়া হয়। তখন আলি ﷺ ছিলেন খলিফা, আমিরুল মুমিনিন।

এখানে একটু চিন্তা করুন...

আলি ﷺ বর্মের ওপর নিজ অধিকারের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। তবুও খিলাফতের ক্ষমতা ব্যবহার করে শক্তির মাধ্যমে ইহুদি থেকে বর্ম নিয়ে নেওয়া থেকে দূরে থাকলেন, তদন্তের খাতিরে চোরকে গ্রেফতারের আদেশও দেননি; বরং কাজির মাধ্যমে নিজ অধিকার প্রত্যাশা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে অনেক উঁচু স্তরের ইলাহি ইনসাফ বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত, যা বর্তমান জাহিলিয়াতের যুগে অনেক বিরল।

কিন্তু ঘটনা পূর্বের মতোই বিস্ময়কর, গভীর ও আরও সুদূরপ্রসারী ছিল।

কাজি শুরাইহ আমিরুল মুমিনিনকে উপনামে সম্বোধন করে বলেন, 'হে আবুল হাসান!' কিন্তু ইহুদিকে তা করেননি। ফলে আলি ﷺ রেগে যান। যা ছিল হক ও আল্লাহর ইনসাফের জন্য। তিনি কাজিকে বলেন, 'হয়তো দুই পক্ষকেই উপনামে ডাকুন, নয়তো কাউকে ডাকবেন না।'

অতঃপর শুরাইহ আমিরুল মুমিনিনকে অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, 'বর্ম আমার, যা আমি বিক্রি করিনি, বা কাউকে হাদিয়া দিইনি।'

শুরাইহ তখন ইহুদিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমিরুল মুমিনিনের দাবির ব্যাপারে বক্তব্য কী?' সে তামাশা করে জবাব দেয়, 'বর্ম আমার! তবে আমিরুল মুমিনিন আমার কাছে মিথ্যুক নয়!'

শুরাইহ আমিরুল মুমিনিনকে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার প্রমাণ কী?'

এটাই হচ্ছে আল্লাহর ইনসাফ ও ন্যায়নীতি। যে দাবি করবে, তাকে প্রমাণ দিতে হবে। যেহেতু এই দাবি কাজির কাছে উত্থাপিত হয়েছে; তাই অবশ্যই এর প্রমাণ দিতে হবে; এমনকি তা আমিরুল মুমিনিন স্বয়ং আলি ﷺ থেকে হলেও। যিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। যাঁর ব্যাপারে কল্পনাও করা যায় না যে, তিনি একটি বর্মের জন্য মিথ্যা বলবেন, যখন তিনি দুনিয়ার সব আরাম-আয়েশ থেকে বিমুখ। মানুষ তাঁকে কঠিন

tauhiderdak.com

শীতে কাঁপতে দেখেছে; অথচ তাঁর অধীনে রয়েছে বাইতুল মাল। তিনি সেখান থেকে তাঁর জন্য বরাদ্দ রাখা বৈধ চাদর নিয়ে ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে পারতেন; কিন্তু তিনি বললেন, 'তোমাদের সম্পদে আমার কোনো আগ্রহ নেই! এটা আমার চাদর, যা নিয়ে মদিনা থেকে বের হয়েছি!'

কাজির দরবারে আলি ﵁-এর জবাব ছিল আরও চমৎকার।

তিনি বলেন, 'বিশ্বাস করো শুরাইহ! আমার কোনো প্রমাণ নেই!'

একেবারে সাধারণ এক মুমিনের উত্তর... 'আমার কোনো প্রমাণ নেই!'

তিনি রাগ করেননি! কাজিকে বলেননি, আমার কাছ থেকে প্রমাণ চাচ্ছ! আর আমি কিনা আমিরুল মুমিনিন!

আমিরুল মুমিনিনের মতো কাজি শুরাইহের অবস্থানও ছিল চমৎকার। তিনি আমিরুল মুমিনিনের কাছে কোনো প্রমাণ না থাকায় ইহুদিকে বর্ম দিয়ে দেন।

সেই ব্যক্তি বর্ম নিয়ে চলে যাচ্ছিল, যখন নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিল না! কয়েক কদম এগিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, 'স্বয়ং আমিরুল মুমিনিন কাজির কাছে আমার ব্যাপারে মামলা দায়ের করার পর আমার পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হয়েছে! নিশ্চয় এটা নবিগণের চরিত্র! আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ। হে আমিরুল মুমিনিন, বর্ম আপনার। এটা আপনার বাহন থেকে পড়ে গিয়েছিল, পরে তা আমি উঠিয়ে নিয়েছিলাম।'

তখন আলি ﵁ বললেন, 'মুসলিম হওয়ার পর এটা তোমার।'

আমরা আবারও উমর ﵁-এর অন্য একটি ঘটনায় ফিরে আসি।

একদিন উমর ﵁ মিম্বরে মানুষকে নসিহত করছিলেন, 'হে মানুষরা, শোনো এবং আনুগত্য করো।' তখন সালমান ফারসি ﵁ বলে ওঠেন, 'আজ আমাদের ওপর আপনার কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।'

সেদিন হয়তো কিছু মানুষ হতভম্ব হয়ে যায় বা বিরক্ত হয়! উমরের সাথে এভাবে কথা বলছে কেন! হোক না তিনি সালমান ফারসি!

tauhiderdak.com

আল্লাহ তাআলা উমর ﵁-কে এমন ভীতি দিয়েছেন, যা মানুষের অন্তরে অনেক প্রভাব ফেলত। এর কারণ হোক তাঁর শরীরের বিশালতা বা বড়ো আওয়াজ বা কঠোরতায় প্রসিদ্ধি বা অন্য যেকোনো কারণ। মোটকথা, মানুষ উমর ﵁-কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভয় পেত; এমনকি আলি ﵁—যিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং প্রিয় মেয়ের জামাতা—তিনি বলেন, 'আমরা একদিন উমরের পেছনে হাঁটছিলাম। হঠাৎ কোনো কারণে উমর পেছনে তাকান। তখন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়।'

এত প্রভাব নিয়ে তিনি মানুষকে বলছেন, 'শোনো এবং মানো।' তখন সালমান ﵁ বলছেন, 'আজকে আপনার কোনো শ্রবণ ও আনুগত্য নেই।'

তখন উমর রাগান্বিত হননি; অথচ এ স্থানে থাকা যে কারও রেগে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। কেননা, তিনি মানুষকে এমন বিষয়ের আদেশ দিচ্ছেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ফরজ করে দিয়েছেন। এখন কেউ যদি কারণ ছাড়া তাঁর আদেশ প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে রেগে গেলে তিরস্কারের কিছু নেই। কিন্তু যে উমরকে ইসলাম প্রতিপালন করেছে, তিনি রাগান্বিত হননি; বরং সালমানকে কারণ জিজ্ঞেস করেছেন, হয়তো কোনো উপযুক্ত কারণ আছে, যা এই আপত্তি তোলার যৌক্তিকতা পেশ করবে।

উমর বললেন, 'কেন?'

সালমান ﵁ বললেন, 'আপনি যেহেতু লম্বা মানুষ, তাই অন্য মুসলিমদের মতো আপনার প্রাপ্য কাপড়ে এত বড়ো চাদর হওয়া সম্ভব নয়, বাকি অংশ কই পেয়েছেন?'

এখন সমস্যা ধরা গেছে। কেমন যেন সালমান ﵁ অভিযোগ করছেন, বা অন্তরে এই সন্দেহ করছেন যে, উমর ﵁ মুসলিম জনগণের চেয়ে এক মিটার বেশি কাপড় বাইতুল মাল থেকে গ্রহণ করেছেন।

উমর ﵁-এর এখানে রাগ করার অধিকার ছিল; কিন্তু আবারও তিনি কোনো রাগ করেননি; বরং ছেলে আব্দুল্লাহ বিন উমরকে ডেকে বলেন, 'আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার এই চাদরটি কি তোমার?' তখন আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ বললেন, 'হ্যাঁ, এটা আমার চাদর। আমি এটা আমিরুল মুমিনিনকে দিয়েছি; যাতে তিনি তা পরিধান করতে পারেন। কারণ, তিনি লম্বা মানুষ হওয়ায় অন্য সাধারণ মুসলিমদের মতো যতটুকু পেয়েছেন, তা উনার জন্য যথেষ্ট হচ্ছিল না।'

tauhiderdak.com

তখন সালমান ﵁ বললেন, 'এখন আদেশ করুন, আমরা শুনব এবং মানব।'

এখানে উমর ﵁ ও সালমান ﵁-এর দুই পক্ষেই ছিল চমৎকার অবস্থান। একজন নিজের জন্য রাগ বা পদক্ষেপ নেননি। অন্যজন উমর ﵁-এর সততা নিয়ে সন্দেহ করছেন, তিনি অকল্পনীয় পরহেজগারির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সতর্ক ছিলেন; যাতে আল্লাহর শরিয়াহ সর্বোচ্চ স্তরে পালিত হয়; যাতে আল্লাহর বিধান সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার সাথে বাস্তবায়িত হয়; এমনকি তাতে যেন সন্দেহের লেশমাত্রও না থাকে। অন্যদিকে উমর ﵁ নিজের ব্যক্তিস্বার্থকে মানদণ্ড বানাননি। তেমনই জনগণের সামনে একজন নাগরিকের পক্ষ থেকে শ্রবণ ও আনুগত্য এমনভাবে প্রত্যাখ্যান হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত যে আঘাতের শিকার হয়েছেন, এর দিকেও কর্ণপাত করেননি; বরং তিনি চেষ্টা করেছেন, যাতে আল্লাহর বিধান সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়। আর তিনি ভয় করছিলেন, যেন এমন কোনো ভুল না হয়, যা জনগণ বা কোনো নাগরিকের জন্য শ্রবণ ও আনুগত্য ত্যাগের কারণ হয়ে যায়।

দুজনই একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করেছেন; যাতে আল্লাহর দ্বীনে কোনো আঁচড় না লাগে। দুজনই ছিলেন এমন স্তরে, বীরপুরুষরাও যেখানে পৌঁছার স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়। মানুষ পরবর্তী যুগে আল্লাহর ইনসাফ বাস্তবায়নের এমন উঁচু স্তরে পৌঁছাতে পারেনি।

সাহাবিদের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত অনেক। আমাদের আরও অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হলে ইতিহাস দেখতে পারি।

tauhiderdak.com

চার.

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র নৈতিকতা

দ্বীনে ইসলামের মৌলিক এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের সমস্ত আচরণের ক্ষেত্রে দ্বীনের সামগ্রিক বিস্তৃত চারিত্রিক নীতিমালা প্রদান এবং এসব চারিত্রিক আচরণবিধিকে ইমানের হাকিকত বা সত্যিকার ইমানের সাথে সম্পৃক্ত করা। ইতিপূর্বে আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে গ্রহণের আবশ্যকীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছি, যেখানে মানুষের দৈনন্দিনের আখলাককে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা প্রয়োজন, বিশেষত বর্তমানে যখন মানুষের আখলাক-চরিত্র-নৈতিকতা অনেকটা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে!

সুরা রাদের এই আয়াতগুলো দেখুন—

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ - وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ - وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ - سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ - وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

‘অতএব যে জানে যে, আপনার কাছে আপনার প্রভুর কাছ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ওই ব্যক্তির মতো, যে অন্ধ? (এমন দুই ব্যক্তি একরকম নয়।) বস্তুত বুদ্ধিমানেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে, যারা আল্লাহর ওয়াদা পূরণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না; এবং যারা আল্লাহ যা সংযুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা সংযুক্ত রাখে (আত্মীয়তার সম্পর্ক

tauhiderdak.com

বজায় রাখে), নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কঠিন হিসাবের আশঙ্কায় থাকে। আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির আশায় ধৈর্যধারণ করে, নামাজ কায়িম করে, আমি তাদের যা দান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করে, পরিণামে তাদের জন্য রয়েছে উৎকৃষ্ট আবাস (জান্নাত); স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের বাবাদের, স্ত্রীদের ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, তারাও (প্রবেশ করবে)। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে। (আর বলবে) "তোমরা যেহেতু ধৈর্যধারণ করেছিলে, তাই তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! পরিণাম হিসেবে কতই না উত্তম এই আবাস!" আর যারা আল্লাহর সাথে পাক্কা ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যা সংযুক্ত রাখার (আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার) নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্যই অভিসম্পাত; আর তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস (জাহান্নাম)।'[১০৩]

এই আয়াতগুলোয় আচরণগত নির্দেশনা স্পষ্ট; হোক তা এই আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে ইঙ্গিতমূলকভাবে (وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সবর, নামাজ কায়িম, জাকাত প্রদান, মন্দকে উত্তম বিষয়ের মাধ্যমে সমাধানসহ আল্লাহর ভয় ও খারাপ পরিণতির আশঙ্কার আলোচনায় বিস্তারিত।

আলোচনার মূল বিষয় হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে, সব সত্য বিশ্বাস করাই ইমান। যা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এসব উপস্থাপিত আচরণবিধি আঁকড়ে ধরা, তা হোক সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত, এটা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর নাজিলকৃত বিষয়কে সত্য বলে ইমান আনার মূল দাবি। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ওপর ইমানের মূল তাকাজা বা আবশ্যকীয় বিষয়।

এ ছাড়াও এখানে একটি শব্দ রয়েছে, যা বিশেষভাবে এই অর্থ প্রদান করে।

যারা এটা বিশ্বাস করে যে, রবের পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যা নাজিল হয়েছে, সব সত্য, তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না। এখানে অন্তত দুটো বিষয়ের ইঙ্গিত রয়েছে—

১০৩. সুরা আর-রাদ, আয়াত নং ১৯-২৫।

tauhiderdak.com

প্রথম হলো, ইমানই হচ্ছে সৃষ্টিগত চুক্তির মূল তাকাজা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

'(স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক আদম-সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করে এনেছিলেন এবং তাদের থেকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, "আমি কি তোমাদের রব নই?" তখন তারা বলেছিল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।"'[১০৪]

দ্বিতীয় হলো, ইসলামে বর্ণিত সমগ্র জীবনের চারিত্রিক আচরণবিধি, যা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হোক বা বিস্তারিত, এগুলো বাস্তবে আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা বা চুক্তি। যা মুমিনরা পালন করে এবং অমুসলিমরা ভঙ্গ করে।

এটাই আখলাক ও চরিত্রের ক্ষেত্রে মূল বাস্তবতা।

মানুষ স্বভাবগত চারিত্রিক জীব। অর্থাৎ তার সব কাজে কোনো চারিত্রিক মূল্যবোধ থাকে। এই মূল্যবোধ সেই ব্যক্তির কাছে ভালো হতে পারে বা মন্দ। তবে মূলকথা হলো, মানুষের সব কাজেই চারিত্রিক মূল্যবোধ থাকে। কেননা, তার সামনে দুটো পথ থাকে। আবার তার রয়েছে দুটো পথের মাঝে যাচাই করে কোনো একটিকে গ্রহণের সক্ষমতা—

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

'আমি তাকে (ভালো ও মন্দ) দুটি পথ দেখিয়েছি।'[১০৫]

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

'আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।'[১০৬]

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

.....

১০৪. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ১৭২।

১০৫. সুরা আল-বালাদ, আয়াত নং ১০।

১০৬. সুরা আল-ইনসান, আয়াত নং ৩।

tauhiderdak.com

> 'শপথ প্রাণের এবং সেই সত্তার, যিনি তাকে সুষম করেছেন, অতঃপর তাকে তার পাপ ও পুণ্যের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে পরিশুদ্ধ করে, সে সফল হয়; আর যে তাকে কলুষিত করে, সে বিফল হয়।'[১০৭]

তবে এখানে মূল ব্যাপার মানুষের কাজে চারিত্রিক মূল্যবোধ থাকা বা না থাকা নিয়ে নয়। কেননা, এটা এমন বিষয়, যাতে কেউ সন্দেহ করে না; এমনকি বস্তুবাদী, সংশয়বাদী এবং নাস্তিকরাও নয়; বরং মূল ব্যাপার হলো, কোন মানদণ্ডে আমরা যেকোনো আচরণ ও মূল্যবোধ প্রণয়নকারীদের যাচাই ও পরিমাপ করব?

বিবর্তনবাদীরা, মানবরচিত আইনের আনুগত্যকারীরা এবং বস্তুবাদী ও তাদের মতো অন্যরা তাদের মনমতো একেক পথ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি একমাত্র সকল আদেশ প্রদানের অধিকারী। তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ তাআলা, (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) 'সৃষ্টি ও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই।'[১০৮]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রুহের জগতে সমস্ত মানুষের সৃষ্টিগত ফিতরাত বা স্বভাবের ওপর প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। যেখানে আল্লাহ তাআলা নিজের ব্যাপারে সাক্ষ্য নিয়েছেন যে, তিনি তাদের রব, যাঁর কোনো অংশীদার নেই। অতঃপর রাসুল প্রেরণ করেছেন, যাঁরা মানুষকে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।

রুহের জগতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির করণীয় হলো, আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য করা এবং শুধু তাঁর থেকে মানদণ্ড গ্রহণ করে তা আঁকড়ে ধরা।

একমাত্র মুমিনরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূরণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না। আর একমাত্র কাফিররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ তাআলা যে ক্ষেত্রে সম্পর্কের আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলাই সমস্ত আচরণের মূলনীতি ঠিক করে দেন এবং তাঁর কথাই চূড়ান্ত। তিনি বলেন, এটা হালাল, সেটা হারাম, এটা উত্তম, সেটা মন্দ, এটা বৈধ, সেটা অবৈধ। আর মুমিনরা তাদের ইমানের দাবিতে এসব মান্য করে।

.....

১০৭. সুরা আশ-শামস, আয়াত নং ৭-১০।

১০৮. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ৫৪।

tauhiderdak.com

আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি বিষয় রয়েছে, বিশেষত আধুনিক জাহিলিয়াতে যার গুরুত্ব প্রকটভাবে বোঝা যায়। তা হলো, ইসলামে আখলাক শুধু কিছু প্রথা নয়, যাতে মানুষ অভ্যস্ত বা সামষ্টিক বুঝ ও পরিবর্তনশীল বস্তুগত পরিস্থিতির ফল নয় বা পারস্পরিক কার্যক্রম সহজতার জন্য সুবিধাবাদী আদর্শ নয়, যা বর্তমান পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা। কারণ, এগুলো মানুষের জীবনে উত্তম চরিত্রের অবিচলতা, ধারাবাহিকতা ও বাস্তবিক অর্থে কার্যকর বানায় না; বরং আখলাক হচ্ছে মৌলিকভাবে আল্লাহ তাআলার সাথে চুক্তি, যার ভিত্তিতে সেসব উত্তম কাজ করে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা উত্তম বলেছেন। যা সাময়িক কোনো ফায়দার জন্য নয়; বরং শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়; যদিও আল্লাহর আদেশ মান্য করার ফলে ফায়দা অর্জিত হয়—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আর যদি গ্রামবাসীরা ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'[১০৯]

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ - وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

'আহলে কিতাবরা যদি ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দিতাম এবং তাদেরকে সুখের বাগানে (বেহেশতে) প্রবেশ করাতাম। তারা যদি তাওরাত ও ইনজিল এবং তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে (বর্তমানে) যা নাজিল করা হয়েছে, তা (কুরআন) সঠিকভাবে মেনে চলত, তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে খাদ্যের জোগান পেত।'[১১০]

মানুষের আচরণের সাথে সম্পৃক্ত তৃতীয় বিষয়, যা আধুনিক জাহিলিয়াতের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো, আখলাক ও নৈতিকতার মূল মর্ম মানুষের আচরণের কিছু অংশের সাথে জড়িত এবং কিছু অংশের সাথে জড়িত নয়, বিষয়টা এমন নয়; বরং এসব নীতি-নৈতিকতার মধ্যে সব আচরণ অন্তর্ভুক্ত; যার ফলে এই আচরণবিধির

১০৯. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ৯৬।

১১০. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৬৫-৬৬।

tauhiderdak.com

গণ্ডি থেকে মানুষের স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে করা কোনো কাজই বাইরে নয়। মানুষ জীবনে যত কাজ করে, এগুলোর একটার ব্যাপারেও বলা যাবে না, এটা আখলাকের সীমার বাইরে। রাজনীত, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিল্পকলা, চিন্তা-দর্শন, কাজ বা বিনোদন—সবকিছুই আখলাক ও নৈতিকতার সীমার মধ্যে এবং সবগুলোই আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। ফলে সব মুমিন এগুলো ইমানের চুক্তির দাবি থেকে বাস্তবায়ন করে থাকে।

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا - وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا - وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا - وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا - وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا - إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا - وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا - وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا - وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا - وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا - أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا - خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

'রহমানের (যথার্থ) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদেরকে (অভদ্রভাবে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, "সালাম"। (তারা ভদ্রভাবে মূর্খদের অভদ্র সম্বোধনের জবাব দেয়।) যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত কাটায়। যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের থেকে জাহান্নামের আজাবকে দূরে রেখো। নিশ্চয়ই তার আজাব একটা বড়ো সর্বনাশ।" নিশ্চয়ই তা বাসস্থান ও অবস্থানস্থল হিসেবে বড়োই নিকৃষ্ট। যারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং তা

tauhiderdak.com

(তাদের ব্যয়) হয় এর মাঝামাঝি একটা মধ্যম পরিমাণে। যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্যকে ডাকে না, আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে তা করে, সে পাপের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং তার মধ্যেই সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে; সেই সব লোক ব্যতীত, যারা তাওবা করে, বিশ্বাস রাখে এবং সৎ কাজ করে, আল্লাহ এমন লোকদের পাপসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে তাওবা করে এবং সৎ কাজ করে, সে তো পুরোপুরি আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। আর যে লোকেরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, অপকর্মের কাছ দিয়ে গমনকালে (নিজেদের) সম্মান নিয়ে চলে যায়, যাদেরকে তাদের প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে সে সম্বন্ধে বধির ও অন্ধ হয়ে থাকে না (না শোনার ও না দেখার ভান করে না) এবং যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের জন্য আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দিক থেকে চোখের শান্তি দান করুন (এমন স্ত্রী ও সন্তান দিন, যাদের দ্বারা আমাদের চোখ জুড়ায়) আর আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দিন"—এমন লোকদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানে (জান্নাতে) কক্ষ দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদেরকে অভিবাদন ও সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে। তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে। বাসস্থান ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা বড়োই উত্তম।'[১১১]

এটা সত্য যে, মানুষ তাদের বাস্তব জীবনের কার্যক্রমে আল্লাহ তাআলার অনেক আদেশ লঙ্ঘন করে। যে গুনাহগুলো সবচেয়ে বেশি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আচরণবিধির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। তা সত্ত্বেও গুনাহ মানুষকে ইমান থেকে বের করে দেয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা হালাল ও বৈধ না বানাবে বা আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে এটাকেই জীবনের মূলনীতি বানিয়ে না নেবে।

মোটকথা গুনাহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাথে আখলাকের সম্পর্ক ছিন্ন করে না। তেমনই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতির ভিত্তিতে মূল আনুগত্য বাতিল করে না। তাই যে স্বীকৃতি দিল, সে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নিল; যদিও গুনাহ করে। কেননা, আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়া ছাড়া ইমানের স্বীকৃতি হয় না।

.....

১১১. সুরা আল-ফুরকান, আয়াত নং ৬৩-৭৬।

tauhiderdak.com

গুনাহের বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা আপন দয়ায় গুনাহগারকে ইমানের গণ্ডি থেকে বের করেন না। যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, তবে তাকে চিরস্থায়ী আগুনে রাখবেন না, যদি গুনাহকে বৈধ না বানায় এবং আল্লাহর বিধানের বিরোধী আইনে পরিণত না করে।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, গুনাহ আল্লাহর নিকট কোনো সহজ বিষয় বা গুনাহ করা বা না করা ইমানের জন্য সমান; বরং ইমান বাড়ে-কমে। গুনাহের মাধ্যমে কমে এবং আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।

যা স্পষ্ট হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীই যথেষ্ট—

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

'জিনাকারী ব্যক্তি জিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না।'[১১২]

এই হাদিসটি ইমানের পাল্লা যে স্থির নয়, তা বর্ণনার জন্য যথেষ্ট। মানুষ যখনই কোনো কাজ করে, তখন তা বাড়ে বা কমে, তার সেই কাজে আল্লাহর বিধান মান্য করা বা না করার ভিত্তিতে। তেমনই এই হাদিস থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং কালিমার আচরণের মাঝে সম্পর্কটাও একেবারে স্পষ্টরূপে বোঝার জন্য যথেষ্ট। এই উম্মাহ রব্বানি উম্মাহ ও আকিদার উম্মাহ হিসেবে আখলাকেরও উম্মাহ। তাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র চরিত্র আঁকড়ে ধরা হচ্ছে, তাদের ইমানের ক্ষেত্রে সত্যবাদী হওয়ার একটি মানদণ্ড, যা অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। তাদের কেউ চারিত্রিক আচরণবিধি ভঙ্গ করে এটা বলতে পারবে না যে, সে ইমানের দাবিতে সত্যবাদী।

১১২. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ৬৭৮২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৭।

tauhiderdak.com

প্রথম প্রজন্মে আখলাকের নমুনা

প্রথম প্রজন্ম এই বাস্তবতা খুব গভীর ও কার্যকরভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। আয়িশা ﵂-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ) 'তাঁর আখলাক ছিল কুরআন।'[১১৩] কত সংক্ষেপে কতই না তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য!

তাঁর আখলাক হচ্ছে কুরআন। অর্থাৎ কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা যত আদেশ ও নিষেধ করেছেন, সেগুলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ হতো। তাই তাঁর সকল আচরণ ছিল কুরআন।

এমন চরিত্রের ভিত্তিতে তিনি সাহাবিগণ ﵃-কে গড়ে তোলেন। তাই আমরা যখন তাঁদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চারিত্রিক মূল্যবোধ দেখি, তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আবু বকর ﵁ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে মানুষকে বলছেন, 'আমাকে এই দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু আমি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম নই। তাই যদি ভালো করি, তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আর যদি মন্দ করি, তাহলে আমাকে শুধরে দেবে।' উমর ﵁ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর এমনই কিছু কথা বলেছেন।

অথচ ইতিহাসের কোনো শাসক মানুষকে এমন অনুরোধ করে না যে, সে যদি ভুল করে, তাহলে যাতে ঠিক করে দেয়; বরং শাসক সর্বদা সংশোধন হয়, যখন মানুষ তাকে বাধ্য হয়ে চাপ দেয়। পূর্বে বা বর্তমানে সেসব শাসককে সর্বোচ্চ প্রশংসা করা হয়, যারা মানুষের চাপে তাদের দাবি মেনে নেয় এবং বাধ্য হয়ে মান্য করে। অন্যদিকে উলটো শাসক তাদের কাছে তাকে সংশোধন করার অনুরোধ জানানো হলো রাজনীতির ক্ষেত্রে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আচরণ, যা শুধু সেই প্রজন্মের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

উমর ﵁ একদিন নাগরিকদের বলেন, 'যদি আমার মাঝে কোনো বক্রতা পাও, তাহলে সংশোধন করে দেবে।' তখন সালমান ﵁ বলেন, 'আল্লাহর শপথ, যদি কোনো বক্রতা পাই, তাহলে তরবারির মাধ্যমে সংশোধন করব।' তখন উমর ﵁ রাগ করেননি; বরং বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, যিনি উমরের জনগণের মাঝে এমন

১১৩. মুসনাদু আহমাদ, হাদিস নং ২৪৬০১।

tauhiderdak.com

ব্যক্তি রেখেছেন, যে তাঁকে তরবারি দ্বারা সংশোধন করবে।' এটা ছিল রাজনীতিতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র চরিত্র, যা সে প্রজন্ম ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

আবু বকর ﷺ তাঁর রাজনৈতিক ভাষণে বলেন, 'তোমাদের মাঝে দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট শক্তিশালী, যতক্ষণ না তার অধিকার রক্ষা করি। আর তোমাদের মাঝে শক্তিশালী ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল, যতক্ষণ না তার থেকে অধিকার গ্রহণ করি।' এটা কোনো মৌখিক স্লোগান ছিল না, যা মানুষকে আকৃষ্ট করা বা তাদের আবগে নিয়ে খেলা করার জন্য বলা হতো; বরং তা ছিল বাস্তব সাহসী উচ্চারণ, যা বাস্তবায়ন করা হতো। এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আচরণবিধি, যেখানে শক্তিশালী অবাধ হয় না এবং দুর্বল জুলুমের শিকার হয় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যোদ্ধাদের বলতেন, যখন তাঁরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের জন্য যেতেন, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোনো চুক্তি বা সম্পর্কের পরোয়া করে না, 'তোমরা আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর নামে যুদ্ধ করো। আল্লাহর সাথে যারা কুফরি করেছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো। যুদ্ধ করো, তবে চুক্তিভঙ্গ বা অঙ্গবিকৃতি করো না। কোনো শিশু, বৃদ্ধ ও নারীকে হত্যা করো না।'[১১৪]

এর মাধ্যমে তিনি যুদ্ধের আচরণনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন; অথচ মানুষ (বিশেষত বর্তমান জাহিলিয়াতে) মনে করে, যুদ্ধের সাথে চরিত্রের কোনো সম্পর্ক নেই।

আবু বকর ﷺ একই নীতি অনুসরণ করেছেন। তিনিও সেনাদের একই নির্দেশনা দিয়েছেন, যখন তাঁরা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতাকারী মুরতাদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছেন।

আলি ﷺ-এর সাথে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ হয়েছে। এদিকে ও সেদিকে অনেক নিহত হয়েছে। কিন্তু রাতে যুদ্ধ থামার পর তিনি দুই পক্ষের নিহতদেরই জানাজা পড়াতেন এবং শত্রুদের হাতে নিহতদের হস্তান্তর করতেন।

কিছু খারিজি তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করেছিল। তখন একদল বলল, 'তারা কাফির।' তখন আলি ﷺ অস্বীকার করে বলেন, 'তারা আমাদের ভাই, যারা আমাদের ওপর বিদ্রোহ করেছে।'

.....

১১৪. দেখুন, সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৩১; আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ১৪৩১; আল-মুজামুস সগির লিত তাবারানি, হাদিস নং ৩৪০।

tauhiderdak.com

এসবই হচ্ছে যুদ্ধের আচরণনীতি, যা কালিমার অনুসারীরা ব্যতীত অন্যরা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় না।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিমদের পানির সংকট ছিল। যুদ্ধে আহতদের অনেকে পানির জন্য কাতরাচ্ছিলেন। যখন অল্প কিছু পানি ইকরিমা ﵁-এর সামনে উপস্থিত করা হলো, তিনি বললেন, 'অমুক ভাইকে দাও, আমার চেয়ে তাঁর পানির বেশি প্রয়োজন।' অথচ তখন তিনি মারাত্মক আহত ছিলেন। তাঁর পানির খুবই প্রয়োজন ছিল। যখন তাঁর ইশারাকৃত ব্যক্তির নিকট পানি আনা হলো, তিনিও আরেকজনের দিকে ইশারা করে বললেন, 'তাঁর পানির বেশি প্রয়োজন, তাঁর কাছে নিয়ে যাও।' এভাবে সর্বশেষ ব্যক্তির কাছে পানি এনে দেখা গেল তিনি শহিদ হয়ে গেছেন। পূর্বের ব্যক্তির কাছে ফিরে এসে দেখা গেল তিনিও শহিদ হয়ে গেছেন। ইকরিমা ﵁-এর কাছে এসেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হলো। এভাবে পানি পান করা ছাড়াই সবাই শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁদের কেউ মৃত্যুর মুহূর্তেও অপর ভাইয়ের ওপর নিজেকে প্রাধান্য দিতে রাজি হননি।[১১৫]

এটা কত উন্নত চরিত্র! অভিধানে এটার সংজ্ঞা কীভাবে পাব!

এই বইয়ে আমরা সেই প্রজন্মের উঁচু স্তরের চারিত্রিক ঘটনাবলি দ্বারা পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করতে চাই না। কেননা, সিরাত ও ইতিহাসের বইগুলো তাঁদের জীবনের সকল আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্তবলি দ্বারা পরিপূর্ণ; বরং এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, সে প্রজন্মের অনুভূতিতে ইমানের হাকিকত এবং দ্বীনের মূল একটি ভিত্তি চারিত্রিক মূল্যবোধের মাঝে যে গভীর সম্পর্ক ছিল, এর কিছু প্রমাণ পেশ করা।

এটা শুধু তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ইজতিহাদ ছিল না; বরং পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মাঝেও একই আচরণ পাবেন। তেমনই মূলনীতি হিসেবে এটা শুধু তাঁদের জন্য বিশেষ কোনো নীতি ছিল না; বরং সবার জন্য একই নীতি।

কেননা, তাঁরা বিশ্বাস করত, এটাই হচ্ছে দ্বীন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের বলেছেন, নিশ্চয় মুমিন হচ্ছে, যারা ইমান আনে এবং উত্তম আমল করে। তেমনই রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন, দ্বীন হলো পারস্পরিক আচরণ। তাই তাঁদের বিশ্বাসে এটা ছিল না যে, কোনো মানুষের পক্ষে এই দ্বীনের আমলসমূহ পালন না করে মুমিন হওয়া

১১৫. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৮/৫২০, তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৩৫৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/১২।

tauhiderdak.com

সম্ভব; বরং তাঁদের বিশ্বাস ছিল, মানুষের ইমানের বাস্তবতায় তারতম্য হয় এই দ্বীনের চাহিদা অনুযায়ী তাদের আমলের ক্ষেত্রে তারতম্যের ভিত্তিতে।

সেই সোনালি প্রজন্ম যে ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল, তা হলো, তাঁরা আল্লাহ তাআলার এই আদেশ (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) পালনার্থে যথাসাধ্য দ্বীনের আমল করতে চেষ্টা করেছেন এবং যথাসাধ্য দ্বীনের আচরণবিধি বাস্তবায়ন করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁরা আবশ্যকীয় সর্বনিম্ন স্তরে থেমে যাননি; বরং তাঁরা অতিরিক্ত নফল ও মুসতাহাব আমলও করেছেন। সেগুলো নিজের ওপর এমনভাবে আবশ্যক করে নিয়েছেন, যেন এগুলো ওয়াজিব বা ফরজ। এ ছাড়া আমলকে ইমানের সাথে সম্পৃক্ত করার মূলনীতি এবং বাস্তব জীবনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র নৈতিকতা অনুযায়ী আচরণের মূলনীতি তাঁদের বিশ্বাসে ছিল স্বাভাবিক স্বীকৃত বিষয়। কেননা, আসলেই এগুলো এই দ্বীনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ স্পষ্ট স্বীকৃত বিষয়।

tauhiderdak.com

পাঁচ.

প্রতিশ্রুতি পূরণ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ - وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা যখন ওয়াদা করো, তখন আল্লাহর ওয়াদা পূরণ করবে এবং আল্লাহকে জামিন করে দৃঢ় শপথ করার পর তা ভঙ্গ করবে না। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা নিশ্চয়ই জানেন। তোমরা ওই নারীর মতো হয়ো না, যে তার সুতা শক্ত করে পাকানোর পর তা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে নষ্ট করে। তোমরা একদল অন্যদলের চেয়ে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য পরস্পরকে ধোঁকা দেওয়ার কৌশল হিসেবে নিজেদের শপথকে ব্যবহার করে থাকো। আসলে এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেন। আর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতে, কিয়ামতের দিন তিনি তা তোমাদের জন্য অবশ্যই স্পষ্ট করে দেবেন। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান পথের সন্ধান দেন। আর তোমরা যা করতে, সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। তোমরা পরস্পরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেদের শপথকে

tauhiderdak.com

ব্যবহার করো না। তাতে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে (মানুষকে) বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তি আস্বাদন করবে। তোমাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি রয়েছে। তোমরা আল্লাহর (সাথে কৃত) ওয়াদার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। আসলে আল্লাহর কাছে যা আছে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম, যদি তোমরা জানতে।'[১১৬]

আহলে কিতাবরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও ইমানকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করার পর আল্লাহ এই উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল জাতির নেতা, পরিচালক ও সাক্ষী হওয়ার জন্য বাছাই করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করেছেন, এটি হবে এ উম্মাহর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা এর মূল কাঠামোতে প্রোথিত থাকবে।

পরবর্তী সময়ে এই উম্মাহ বাস্তবেই তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। ওয়াদা পূরণ করা এই উম্মাহর মূল চরিত্রে পরিণত হয়, যা বিশ্বের সকল জাহিলিয়াতের মাঝে তাঁদেরকে আলাদাভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রজন্মকে রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরআনের হিদায়াতের ভিত্তিতে গড়ে তোলার পর সব জাতির মাঝে তাঁরা সবচেয়ে বেশি শক্তভাবে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরাইশের মুশরিকদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি করেন। এই সন্ধির একটি শর্ত ছিল, যদি কেউ মুসলিম হয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে আসে, তাহলে তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে; কিন্তু মুসলিমদের কেউ কুরাইশের কাছে আসলে তারা ফিরিয়ে দেবে না।

সেদিন মুসলিমরা এই চুক্তিতে তাঁদের ওপর জুলুমের ফলে অনেক অতিষ্ঠ হয়। উমর ﷺ স্থির থাকতে না পেরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আমরা কি মুসলিম নই?' রাসুল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' উমর ﷺ বললেন, 'তারা কি কাফির নয়?' রাসুল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ!' তারপর উমর ﷺ বললেন, 'তাহলে কেন আমরা দ্বীনকে নিচু করছি?' তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ চূড়ান্ত কথা বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুল, আমি তাঁর অবাধ্য নই, তিনি আমার সাহায্যকারী।'[১১৭]

আল্লাহ তাআলা জানতেন হুদাইবিয়ার সন্ধির মাঝে মুসলিমদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু তারা তাঁদের মনুষ্য গাইবের ব্যাপারে অজ্ঞাত অদূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে শুধু বাহ্যিক জুলুম দেখতে পায়, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন,

১১৬. সুরা আন-নাহল, আয়াত নং ৯১-৯৫।
১১৭. বাইহাকি।

tauhiderdak.com

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

'আল্লাহ তাঁর রাসুলকে সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছেন। আল্লাহ যদি চান, অবশ্যই তোমরা নিরাপদে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। তোমাদের কেউ মাথা মুণ্ডন করবে, কেউ কেউ চুল ছোটো করবে। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। তোমরা যা জানো না, আল্লাহ তা জানেন। তা ছাড়াও তিনি (তোমাদের জন্য) এক নিকটবর্তী বিজয় মঞ্জুর করেছেন।'[১১৮]

এই লাঞ্ছনাকর চুক্তি হওয়ার সময়েই মুশরিকদের সারি থেকে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় আবু জানদাল বের হয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনদের সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। যা দেখে মুসলিমদের দুঃখ ও জুলুমের অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। তখন উমর ﷺ এগিয়ে এসে তাঁকে তরবারি প্রদানের ইচ্ছা করেন; যাতে লড়াই করে নিজেকে শিকল থেকে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ তা নিষেধ করেন। তিনি মুশরিকদের সাথে কৃত চুক্তি রক্ষা করেন। এই দৃশ্য দেখে মুসলিমদের অন্তর ফেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু এটা ছিল চুক্তি রক্ষার একটি বাস্তব প্রশিক্ষণ।

একজন মুসলিম যে চুক্তি করে, তা আল্লাহর নামে স্বাক্ষরিত হয়। ফলে এটা তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির অংশ, যা কোনো মুমিন তাঁর রবের সাথে রক্ষা করে। এটা এমন বিষয় নয়, যেখানে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী, প্রকাশ্য বা গোপন কোনো স্বার্থ প্রবেশ করতে পারে, যার ভিত্তিতে সে স্বার্থ পেলে মান্য করবে এবং স্বার্থ না থাকলে ভঙ্গ করবে। কারণ, এটা যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে জাহিলিয়াতের স্বভাব। কারণ, তারা কেবল চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যম বের করে। তা পূরণের সংকল্প তাদের থাকে না। যখন তা ভাঙার মাঝে স্বার্থ দেখে, তখন তা শুধু কাগজের কালিতে রূপান্তরিত হয়, যার কোনো মূল্য নেই। (বর্তমান আধুনিক জাহিলিয়াতে চুক্তি ভঙ্গের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হলো আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ। কত সহজে তা স্বাক্ষরিত হয় আবার কয়েক মুহূর্তে সহজে তা ভেঙে ফেলা হয়।) অন্যদিকে মুমিনরা আল্লাহর ওয়াদা পূরণ করে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে না। শুধু তারাই এমন ব্যক্তি, যাদেরকে স্বার্থ পরিচালিত করে না; বরং তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

.....

১১৮. সুরা আল-ফাতহ, আয়াত নং ২৭।

tauhiderdak.com

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ ও মুসলিমদের রক্ষার জন্য বলেছেন,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

'আর যদি আপনি কোনো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কা করেন, তাহলে তাদের অঙ্গীকার একইভাবে তাদের দিকে ছুড়ে মারবেন। আল্লাহ কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না।'[১১৯]

এটা চুক্তি রক্ষার ক্ষেত্রে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আচরণবিধি; এমনকি কাফিরদের সাথেও, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোনো সম্পর্ক ও প্রতিশ্রুতির পরোয়া করে না, যাদের থেকে যেকোনো মুহূর্তে খিয়ানতের আশঙ্কা থাকে। তাদের ক্ষেত্রেও প্রথমে ঘোষণা দিয়ে চুক্তি বাতিল করতে হবে, তারপর যুদ্ধ করা যাবে। তবুও চুক্তিতে থাকা অবস্থায় তা ভঙ্গ করা যাবে না।

মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশনা বুঝে তা বাস্তব জমিনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়; ফলে তাঁদের থেকে বিস্ময়কর আচরণ প্রকাশ পায়।

আবু উবাইদা বিন জাররাহ ﷺ যখন শাম জয় করেন এবং সেখানের অধিবাসীদের নিকট থেকে জিজিয়া গ্রহণ করেন, তখনও তারা তাদের পূর্বের ধর্মে বহাল ছিল। তারা তাঁকে শর্ত দেন, যেন তিনি তাদেরকে রোমানদের থেকে রক্ষা করেন। রোমানরা তাদের অতর্কিত হামলা ও নির্যাতন করত। আবু উবাইদা ﷺ শর্ত মেনে নেন।

কিন্তু হিরাকল মুসলিমদের থেকে শাম ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বিশাল এক বাহিনী গঠন করে। এ খবর আবু উবাইদা ﷺ-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি মানুষকে জিজিয়া ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমরা আমাদের জন্য হিরাকলের প্রস্তুতির খবর শুনেছ। তোমরা শর্ত দিয়েছ, যাতে আমরা তোমাদের রক্ষা করি; কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে এতে সক্ষম নই। যদি আল্লাহ আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে শর্ত পূরণ করব।'

ইতিহাসে কি এমন ঘটনার কথা শুনেছে? কোনো বিজয়ী বাহিনীর কমান্ডার, যিনি বিজিত অঞ্চল থেকে জিজিয়া নিয়ে কোনো কারণে ফিরিয়ে দিয়েছেন? কিন্তু এটাই ইতিহাসের নজিরবিহীন ঘটনা, যা বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

.....

১১৯. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৫৮।

tauhiderdak.com

এখানে আবু উবাইদা ﵁ কোনো প্রত্যাশিত দূরবর্তী স্বার্থ অর্জনের জন্য নিকটবর্তী স্বার্থ ত্যাগ করেননি। কখনোই না। কেননা, হিরাকলের অপ্রতিরোধ্য বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়ের বিশ্বাস তাঁর ছিল না, যা কথা থেকে স্পষ্ট, 'আমরা এতে সক্ষম নই।'

বরং তিনি সেই মূলনীতির আলোকে পদক্ষেপ নিয়েছেন, যার ওপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের গড়ে তুলেছেন। আর তা হলো, ওয়াদা পূরণ করা; চাই তা নিকটবর্তী স্বার্থের বিচারে লাভজনক হোক বা ক্ষতিকর। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

'তোমরা ওই নারীর মতো হয়ো না, যে তার সুতা শক্ত করে পাকানোর পর তা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে নষ্ট করে। তোমরা একদল অন্যদলের চেয়ে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য পরস্পরকে ধোঁকা দেওয়ার কৌশল হিসেবে নিজেদের শপথ ব্যবহার করে থাকো।'[১২০]

আবু উবাইদা ﵁ এই ইসলামি চরিত্র ধারণের ফলে বিশাল প্রভাব পড়েছিল, যা সেখানে আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। আল্লাহ তাঁদের হিরাকলের বাহিনীর ওপর বিজয়ী করেন। মানুষ স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে জিজিয়া ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর মানুষ এই দ্বীনের মহান চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে।

উমর ﵁ তাঁর পারস্যের সেনাপতিকে বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ কারও সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর মনে হয় যে, কোনো মুসলিম তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে, তবে তা রক্ষা করো।' ইয়া আল্লাহ! কত উত্তম আচরণ!

বাস্তবে কোনো চুক্তি নেই! কিন্তু কোনো পারসিক সেনার পক্ষ থেকে যদি ধারণা হয় যে, কোনো মুসলিম সেনা তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে! তখন উমর ﵁ তাঁর সেনাপতিকে বলছেন, যেন তা রক্ষা করা হয়।

মুআবিয়া ﵁ রোমের সাথে সন্ধিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর গোয়েন্দা এসে সংবাদ দেয় যে, তারা সন্ধির সুযোগে মুসলিমদের ওপর অতর্কিত হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

১২০. সুরা আন-নাহল, আয়াত নং ৯২।

tauhiderdak.com

তাই মুআবিয়া ﵁-ও তাদের প্রস্তুতি পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাদের ওপর অতর্কিত হামলার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'হয়তো আপনি তাদের প্রতি সন্ধি ছুড়ে দিয়ে সমান হয়ে যাবেন, যা আল্লাহর আদেশ। অন্যথায় সন্ধির সময় সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন।' মুআবিয়া ﵁ অপেক্ষা করেছেন; ফলে আল্লাহ বাহিনীকে বিজয় দিয়েছেন।

এসবের বিপরীতে আপনি সালাহুদ্দিনের সময় ক্রুসেডারদের আচরণ দেখুন! তখন তাদের সাথে মুসলিমদের সন্ধি ছিল। কিন্তু তারা তা ভঙ্গ করে এবং মুসলিমদের ওপর অতর্কিত হামলা করে। ফলে মুসলিমরা মসজিদে আশ্রয় নেয়। তারা সেখানেও হামলা চালায় এবং তরবারি দ্বারা এমনভাবে শহিদ করে যে, ঘোড়ার পা পর্যন্ত রক্তে ডুবে যায়। যা তাদেরই লিখিত বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে।

আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন, কাফিররা সব এক জাতি—

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

> 'তারা কোনো মুমিনের সাথে আত্মীয়তা বা চুক্তির মর্যাদা রাখে না। আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।'[১২১]

তা সত্ত্বেও সালাহুদ্দিনের সুযোগ আসার পর তিনি তাদেরকে একইভাবে শাস্তি প্রদান করেননি; বরং তিনি ইসলামের ক্ষমার আচরণ করেছেন।

১২১. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ১০।

tauhiderdak.com

ছয়.

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান

ইতিপূর্বে আমরা মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। সেই সাথে সোনালি প্রজন্মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছি, যাঁদেরকে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে গড়ে তুলেছেন এবং তাঁদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, (خَيْرُكُمْ قَرْنِي) 'তোমাদের মধ্যে আমার প্রজন্মই সর্বোত্তম।'[১২২]

তেমনই পূর্বের আলোচনায় আমরা এটাও নিশ্চিত করেছি যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু সেই প্রজন্মের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং এগুলো 'মুসলিম উম্মাহ'র মূল বৈশিষ্ট্য, যা তাদের সকল প্রজন্ম ও যুগে অর্জন করা আবশ্যক এবং যেকোনো প্রজন্ম এতে অবহেলা বা ত্যাগ করলে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আর সেই সোনালি প্রজন্মের বিশেষ গুণ এটা ছিল না যে, তাঁরা এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করেছেন এবং তাতে অবিচল থেকেছেন। কারণ, তা প্রত্যেক প্রজন্মের মাঝেই সত্যিকার ইমান বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক। বরং সেই প্রজন্মের বিশেষ গুণ ছিল, তাঁরা এগুলো বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন এবং শুধু আবশ্যকীয় সর্বনিম্ন স্তর পূরণ করেই ক্ষান্ত হননি। তাঁরা সর্বসাধ্য ব্যয় করেছেন; যাতে কাঙ্ক্ষিত সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যাওয়া যায়। ফলে তাঁরা এত উঁচু দিগন্তে পৌঁছে গেছেন, যা অন্যরা কল্পনাও করতে পারে না। বিশেষ করে যখন অন্যরা তাদের জাহিলিয়াতে আক্রান্ত বাস্তবতায় প্রভাবিত হয়ে অধঃপতিত হতে থাকে, তখন তারা ফরজকৃত সর্বনিম্ন সূত্রের চেয়েও নিচে নেমে যায়।

আমরা এখানে মুসলিম উম্মাহর আরও দুটো আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। যদিও পূর্বে বলেছি যে, এগুলো স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রথম প্রজন্ম থেকে অনেক পরে অর্জিত হয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি স্বাভাবিকভাবেই জন্ম ও প্রতিষ্ঠালাভের স্তরে উদ্ভাসিত হয় না। কেননা, এগুলোর জন্য প্রয়োজন স্থিরতা, যা নবজন্মের সময় থাকে না। তেমনই অন্যসব প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে এগুলোতে ব্যস্ত থাকতে হয়; অথচ কোনো জাতির উত্থানের সময় সব প্রচেষ্টা গড়া ও প্রতিষ্ঠার পেছনেই ব্যয় করতে হয়। তেমনই প্রতিষ্ঠার পর এতটুকু সময় পার হওয়া প্রয়োজন, যে সময়ে তাদের আদর্শ,

.....

১২২. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ২৬৫১।

tauhiderdak.com

মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা বাস্তবে রূপ নিতে পারবে। যাতে এর পর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বস্তুগত সভ্যতার উন্নতিতে নতুন 'অবদান' রাখার দিকে মনোযোগী হতে পারে। তবে যে 'বীজ' থেকে এই দুটো কার্যক্রম গড়ে ওঠে, সেগুলো মূলত সূচনাবিন্দু থেকেই জন্ম নেয় এবং মূল গঠনে সুপ্ত থাকে, যতদিন এর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা পূর্ণ না হয়। ফলে বাচ্চা যেমন গোপনে এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, তেমনটা এর ক্ষেত্রেও ঘটে।

তাই প্রথম প্রজন্ম যদিও এই দুটো বৈশিষ্ট্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়নি, তবে বাস্তবে তাঁরাই এগুলোর আধ্যাত্মিক পিতা। কেননা, তাঁরাই তো সেই স্রোতকে প্রবল বেগে ধাবিত করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তেমনই তাঁরা নিজেদের মাঝে সঠিকভাবে সূচনা করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আর এই দুটো বিষয় ইসলামি বিজ্ঞানের কার্যক্রম ও সভ্যতার কার্যক্রম প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা রেখেছিল।

আর জোরালো সূচনা হওয়া যেকোনো জাতির জীবনে বিজ্ঞান ও সভ্যতার কার্যক্রমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, তা মানুষের স্বভাবের মাঝেই কেন্দ্রীভূত থাকে। এ ছাড়া অন্য দিকে এটা সকল মানুষের জন্য তাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামত—

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

'আমি এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আপনার রবের দান থেকে সাহায্য করে থাকি। আপনার রবের দান (কারও জন্য) নিষিদ্ধ নয়।'[১২৩]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

'যারা দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য চায়, আমি তাদেরকে সেখানে তাদের কাজের পুরোপুরি ফল দিয়ে থাকি, সেখানে তাদেরকে (কোনো কিছু) কম দেওয়া হয় না।'[১২৪]

আর উৎস পরিশুদ্ধ হওয়ার থেকে সঠিক বিজ্ঞান কার্যক্রম ও সঠিক সভ্যতার কার্যক্রম জন্ম নেয়। যা অন্যসব কার্যক্রম থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়।

১২৩. সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং ২০।

১২৪. সূরা হুদ, আয়াত নং ১৫।

tauhiderdak.com

ইসলামি সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা

জাহিলি যুগে আরবরা শিক্ষিত জাতি ছিল না। এটা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। তারা ব্যাবসায়িক সফরে উত্তর ও দক্ষিণের সভ্যতার কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াত করত, তেমনই রোম ও পারস্যের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল। আর দুটোরই সে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল। কিন্তু আরবরা কখনোই তাদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেনি। কেননা, তারা বিশ্ব ও ইতিহাস থেকে দূরে নিজেদের পারস্পরিক সংঘাত, প্রতিশোধ, বড়াই ও একে অপরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। আর সর্বোচ্চ ব্যবসা, মদ্যপান ও খেল-তামাশা করত।

আরবরা তাদের গোত্রীয় জীবনযাত্রায় সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকত কাব্যপাঠ ও বংশধারা সংরক্ষণ নিয়ে। তারা কাব্যশিল্পে অনেক দক্ষ ছিল এবং তাদের কাব্যপ্রতিভা নিয়ে বড়াই করত। আর বংশধারা সংরক্ষণে প্রত্যেক গোত্র অন্যদের সাথে গর্ব করত এবং দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে অন্য গোত্রের সম্মানহানি করতে তা ব্যবহার করত।

জাহিলি আরবের কাব্যের উন্নত সাহিত্য তাদের চিন্তাগত, মানসিক ও উপস্থাপনাগত পরিপক্বতার প্রমাণ বহন করা সত্ত্বেও তাদের গ্রাম্য জীবনযাপন এবং সর্বদা গোত্রীয় দলান্ধতা ও পারস্পরিক সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও বংশধারা নিয়ে অহংকারে লিপ্ত থাকার ফলে তারা একক জাতি গঠনের জন্য একত্রিত হওয়ার কোনো সুযোগ পায়নি। যা কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সভ্যতার উন্নতির জন্য মূল শর্ত।

ফলে আরবরা বহু শতাব্দী যাবৎ এমনভাবে বাস করেছে। অতঃপর ইসলাম এসে তাদেরকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কার্যক্রম শুরু নয়; বরং সঠিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সকল উপাদান ব্যবস্থা করে দেয়।

শিক্ষার প্রতি আগ্রহ একটা স্বভাবগত বিষয়, যা আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে প্রদান করেছেন; যাতে তা মানুষের হাতে দুনিয়া আবাদকরণের মূল উপকরণ হতে পারে। আর বিশেষভাবে প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য জানার আগ্রহ মানবস্বভাবের একটি বিশেষ মৌলিক বিষয় এবং পারিভাষিক বিজ্ঞানের মূল উপাদান। কিন্তু আমরা পূর্বে যেমন বলেছি, এর জন্য জাতির ঐক্য ও স্থিরতা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি প্রয়োজন; যাতে বিজ্ঞানের স্বভাবগত স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে। আর এসব উপাদান জাহিলি আরবের গোত্রীয় পরিবেশে অনুপস্থিত ছিল; ফলে সেখানে পরিচিত অর্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো কিছুই ছিল না।

tauhiderdak.com

কিন্তু যখন ইসলাম এসেছে, তখন এসব উপাদান অস্তিত্বে এসেছে। সেখানে প্রথমেই এমন পরিবেশ গড়ে উঠেছে, যেখানে বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব। কিন্তু তা ছিল এমন জাতির মাঝে, যাদের জন্য একত্রিত হওয়া, স্থিরতা ও নিরাপত্তার পাশাপাশি বিশাল সঞ্জীবনী প্রেরণা প্রয়োজন ছিল, যা তাদের ফিতরাতের ঘুমন্ত দিক জাগ্রত করে তুলবে এবং প্রচেষ্টা ও অবদান রাখার দিকে ধাবিত করবে।

ইসলাম এত চমৎকারভাবে সর্বোচ্চ সঞ্জীবনী প্রেরণা জুগিয়েছে, যা ছিল ইতিহাসে নজিরবিহীন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞানার্জনের দিকে মানুষের ফিতরাত প্রবল বেগে ধাবিত হয় এবং সেই ঐক্যবদ্ধ জাতির সকল অংশ কাজে লেগে যায়। তবে ইসলাম শুধু তাদের মাঝে প্রেরণা জুগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, যা তাদের চেতনা জাগ্রত করতে পারে; বরং তাদেরকে জীবনের আবশ্যকীয় অন্য সকল বিষয়ের মতো জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে।

মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাধানে ওহির কার্যকারিতা হলো, হয়তো তা হবে এমন বিষয়, যে ক্ষেত্রে মানুষ নিজ প্রচেষ্টায় পৌঁছাতে সঠিক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম নয়; ফলে সেখানে ওহি এসে সবকিছু শিখিয়ে দেয়। যেমন আকিদা এবং হালাল ও হারামের বিষয়াবলি। অথবা তা এমন হবে, যেখানে মানুষ আল্লাহ-প্রদত্ত ফিতরাতগত উপাদানের সাহায্যে সঠিক জ্ঞান লাভে সক্ষম; ফলে সেখানে ওহি এসে শুধু মৌলিক নির্দেশনা এবং সে ক্ষেত্রে চিন্তা ও কাজের সঠিক কর্মপদ্ধতি বাতলে দেয়।

বস্তুজগৎ ও বস্তুর মূল উপাদানের জ্ঞানার্জন করা এমন বিষয়, যার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা আল্লাহ তাআলা মানুষের ফিতরাতে প্রদান করেছেন। যা দ্বারা মানুষ তার বুদ্ধি ও পেশিশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক জ্ঞান অর্জনে সক্ষম। ফলে ওহি এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কোনো থিউরি বা সূত্র পেশ করেনি বা এমন কোনো পাঠ প্রদান করেনি, যা জ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তথ্যের দিকে নিয়ে যাবে; বরং ওহি এ ক্ষেত্রে শুধু নির্দেশনা ও সঠিক কর্মপদ্ধতি বাতলে দিয়েছে।

এসব নির্দেশনা যেমন কুরআনে এসেছে, তেমনই হাদিসেও এসেছে। কুরআনে তো ওহি নাজিল শুরুই হয়েছে 'পড়ো' শব্দের মাধ্যমে। যা ছিল পড়ালেখা না জানা মূর্খ জাতির জন্য স্পষ্ট এক নির্দেশনা। অতঃপর ইলমের আলোচনা করেছে—

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

tauhiderdak.com

'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে। পড়ো, তোমার প্রভু তো পরম দানশীল, যিনি কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন; শিখিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।'[১২৫]

অতঃপর সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অন্তর্গত বস্তুর সৃষ্টিগত নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশেষ করে আকাশ, জমিন ও বাচ্চা গঠনের ধাপগুলোর দিকে।

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'বলুন, "আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে, তা তোমরা দেখো।"'[১২৬]

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ - وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

'দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য জমিনে বহু নিদর্শন আছে। তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও তোমরা কি (ভেবে) দেখবে না?'[১২৭]

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে অনড় পাহাড়-পর্বত ও নদনদী স্থাপন করেছেন। সেখানে তিনি প্রত্যেক ফলের দুটি করে জোড়া তৈরি করেছেন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।'[১২৮]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

১২৫. সুরা আল-আলাক, আয়াত নং ১-৫।
১২৬. সুরা ইউনুস, আয়াত নং ১০১।
১২৭. সুরা আজ-জারিয়াত, আয়াত নং ২০-২১।
১২৮. সুরা আর-রাদ, আয়াত নং ৩।

tauhiderdak.com

'মানুষকে তো আমি মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে এক নিরাপদ আধারে (নারীর গর্ভে) শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রবিন্দুকে জমাটবদ্ধ রক্তে এবং জমাটবদ্ধ রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর মাংসপিণ্ড থেকে হাড় সৃষ্টি করেছি এবং হাড়গুলোকে আবার মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত করেছি। অবশেষে তাকে অন্য সৃষ্টিরূপে তৈরি করেছি। অতএব সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত মহান!'[১২৯]

কুরআনের অসংখ্য আয়াতে সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা দ্বারা প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করে তাতে স্রষ্টার মহত্ত্ব, পরাক্রমশালী ক্ষমতা, সর্বব্যাপী জ্ঞান এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অনুভূতি সৃষ্টি করা। যাতে মানুষের অন্তর মহান স্রষ্টার সামনে ভীত হয় এবং শিরকমুক্ত হয়ে তাঁর ইবাদতে মগ্ন থাকে। অন্যথায় এসব আয়াতে বিজ্ঞানগত নির্দেশনা স্পষ্ট বিষয়। কেননা, এই বিষয়ের অধিকাংশ আয়াতের শেষে চিন্তা, অনুধাবন ও গবেষণার কথা বলা হয়েছে, যেমন—

...(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ)أو (يَعْقِلُونَ) أو (إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

'নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলি রয়েছে চিন্তাশীলদের/বোধশক্তিসম্পন্নদের/জ্ঞানীদের জন্য ।'

এসব চিন্তা, অনুধাবন ও গবেষণা স্বাভাবিকভাবেই এই বস্তুগত নিদর্শনগুলোর 'ভেদ' জানা ও এগুলোতে সুপ্ত আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির রহস্য জানাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর এই পয়েন্ট থেকেই বিজ্ঞানের কার্যক্রম শুরু হয়। আর এখান থেকে মুসলিমরা তাদের জ্ঞানার্জনের নির্দেশনা গ্রহণ করেছে।

আরবরা যেহেতু অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে তাদের কাছে পূর্ব থেকে বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো শিক্ষা ছিল না, তাই মুসলিমরা অন্যান্য জাতির কাছে যে জ্ঞান রয়েছে, তা জানার প্রয়োজন অনুভব করে। এটা ছিল এমন অনুভূতি, যা তারা পূর্বের জাহিলি যুগে অনুভব করেনি এবং সেদিকে মনোযোগী হয়নি। আর সে সময় যেহেতু অধিকাংশ বিজ্ঞানের ভাষা ছিল গ্রিক ও ল্যাটিন, তাই মুসলিমরা এই দুটো ভাষা শিক্ষা করে; যাতে সেখান থেকে সেসব জ্ঞান আরবিতে রূপান্তর করতে পারে। আর এখান

১২৯. সুরা আল-মুমিনুন, আয়াত নং ১২-১৪।

tauhiderdak.com

থেকেই তাদের বিজ্ঞান কার্যক্রম ও উন্নতি শুরু হয়।

তারা সে সময় প্রাপ্ত সকল জ্ঞান আরবিতে অনুবাদ করে এবং সেগুলো শিক্ষানবিশের মতো অধ্যয়ন করে। তারা খুব দ্রুত নিজেদের মাঝে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা অর্জন করে; এমনকি গ্রিকবিদ্যার অসংখ্য ভুল সংশোধন করে।

তবে কুরআনে শুধু সৃষ্টিজগতের নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করে সেগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণার নির্দেশনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা ছিল গবেষণার কার্যপদ্ধতি।

গ্রিকদের বিদ্যা ছিল থিউরিটিক্যাল ও দার্শনিক। যেখানে শুধু থিউরি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করা হয় এবং যুক্তি দিয়ে উপস্থাপনেই ক্ষান্ত থাকা হয়। যদি কোনোভাবে বুদ্ধি তা মেনে নেয়, তাহলে তা সঠিক; চাই সেই থিউরির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব থাকুক বা বাস্তবে তা ভুল হোক।

কিন্তু কুরআনের নির্দেশনা ছিল ভিন্ন দিকে। কুরআনে জ্ঞানের উপকারী দিকে ধাবিত করা হয়েছে, শুধু থিউরি ও দর্শন নিয়ে ব্যস্ত থাকার দিকে নয়।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

'লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন, "এগুলো মানুষের জন্য সময়-নির্দেশক।"'[১৩০]

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

'আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে (অন্ধকার দ্বারা) নিষ্প্রভ করেছি আর দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি; যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করতে পারো এবং বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো। আমি তো সবকিছুই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।'[১৩১]

১৩০. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৮৯।

১৩১. সুরা আল-ইসরা, আয়াত নং ১২।

tauhiderdak.com

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ - ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আপনার রব মৌমাছিকে বলেছেন, "তোমরা ঘর বানাও পাহাড়ে, গাছে আর মানুষেরা যা নির্মাণ করে তাতে। তারপর সব রকম ফল থেকে আহার করো এবং তোমাদের রবের সুগম পথসমূহে চলো।" এই মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় (মধু) বের হয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য আছে। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।'[১৩২]

মুসলিমরাই মূলত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে শুধু দার্শনিক থিউরিটিক্যাল ক্ষেত্র থেকে বৈজ্ঞানিক বাস্তব পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ে যায়। যা ছিল গবেষণা-পদ্ধতিতে বিশাল এক রূপান্তর। আর এই বাস্তব পরীক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমেই ধীরে ধীরে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

সুতরাং মুসলিমরাই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটা এমন সত্য, যা সেই ব্যক্তিরাও স্বীকার করেছে, যারা মুসলিমদের থেকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যা দ্বারাই তারা বর্তমান যুগের এই চরম উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছে।

রবার্ট ব্রিফো তার 'মানবতার গঠন' Making of Humanity বইয়ে লিখেছে,

'আমাদের বিজ্ঞান আরবের কাছে যে ক্ষেত্রে ঋণী, তা তাদের চমৎকার সব সূত্র বা থিউরি আবিষ্কারের জন্য নয়; বরং স্বয়ং বিজ্ঞানের অস্তিত্বের জন্য ঋণী। কারণ, প্রাচীন বিশ্বে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। গ্রিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছে, আম হুকুম দিয়েছে এবং সূত্র তৈরি করেছে। কিন্তু কঠিন চেষ্টা ও ধৈর্যের সাথে গবেষণা-পদ্ধতি, পজিটিভ তথ্য সংগ্রহ করে শক্তিশালী করা, বিজ্ঞানের বিস্তৃত কার্যক্রম, সর্বদা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য লেখা এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা—এসব কিছুর সাথে গ্রিকদের চিন্তা অপরিচিত ছিল। আর আজ আমরা "সাইন্স বা বিজ্ঞান" বলে যা বুঝি, তা নতুন গবেষণা-পদ্ধতি ও প্রেরণার ফসল। আর এই বিজ্ঞান-গবেষণার প্রেরণা ও গবেষণা-পদ্ধতি মূলত আরবরা ইউরোপীয় বিশ্বে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।'[১৩৩]

.....

১৩২. সুরা আন-নাহল, আয়াত নং ৬৮-৬৯।

১৩৩. মুহাম্মাদ ইকবালের 'ইসলামে দ্বীনি চিন্তার সংস্কার' বই থেকে, পৃষ্ঠা নং ১৫০।

tauhiderdak.com

তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাত্রাপথে মুসলিমদের অবদান শুধু এতটুকুতে সীমাবদ্ধ নয় যে, তারা গ্রিকবিদ্যার ভুলগুলো সংশোধন করেছে। নতুন কিছু বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, যেমন বীজগণিত। বহু পদার্থের বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করেছে; যার ফলে ফিজিয়লোজি ও রসায়নবিদ্যায় বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। রক্তের কার্যক্রম আবিষ্কার করেছে। হাসান বিন হাইসাম আলোকবিদ্যা উদ্ভাবন করেছে। তেমনই তাদের অবদান এতেই ক্ষান্ত নয় যে, তারা মানবজাতিকে সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির পথ দেখিয়েছে, যা ছিল বিজ্ঞানের পরীক্ষা-পদ্ধতি। যা ছাড়া বিজ্ঞানের কোনো সত্যিকার উন্নতিই সম্ভব ছিল না; বরং তাদের এসব থেকেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

কুরআন মানুষের জীবনের জন্য পরিপূর্ণ এক ব্যবস্থা দিয়েছে, যার মাঝে জীবনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়; এমনকি বিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর প্রতিটা অংশকে সঠিক স্থানে রেখেছে। নির্দিষ্টভাবে এটাই হচ্ছে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। যার বিশেষ মূল্য স্পষ্ট হয় যখন আমরা বর্তমান জাহিলিয়াতের জ্ঞান-বিজ্ঞান কার্যক্রম ও এর ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিই।

বাস্তবে মানুষ পরিপূর্ণ এক সত্তা। যার কোনো অংশকে বাকি অংশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তাই যখন একটা অংশ বাকিগুলো থেকে পৃথক হয় বা মানুষ একটাকে বাকিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে, তখনই পুরো সত্তার মাঝে সমস্যা দেখা দেয়। কেননা, বাস্তবে এই সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় না; বরং তা রুগণ হয়ে যায়; ফলে অনিবার্যভাবে তাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

আল্লাহ-প্রদত্ত ব্যবস্থা মানুষকে তার বাস্তবতা অনুযায়ী মূল্যায়ন করে। আংশিক নয় বরং পূর্ণাঙ্গরূপে, যার মধ্যে কোনো ফাটল নেই। এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়; কেননা, তা নাজিল হয়েছে ফিতরাতের সৃষ্টিকর্তা থেকে, যিনি এর সকল দিক সম্পর্কে জ্ঞাত।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী, মহাবিজ্ঞ।'[১৩৪]

তাই আল্লাহর দ্বীন যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটি সমাধান করে, তখন প্রথমত, এটাকে মানুষের জীবনের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, আবার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত কোনো জিনিস বানিয়ে ফেলে না এবং আধুনিক জাহিলিয়াতের মতো 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান'

১৩৪. সুরা আল-মুলক, আয়াত নং ১৪।

tauhiderdak.com

স্লোগান ধারণ করে না। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানকে ফিতরাতের অন্যান্য প্রবণতা এবং মানসিক ও জৈবিক বাকি সব প্রয়োজনের বিরোধী বা বিপরীত বানিয়ে ফেলে না। যে কাজটা বর্তমান জাহিলিয়াতে বিজ্ঞানকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে করা হয়। অতঃপর একে মোকাবিলা ও বিপরীত অবস্থানে নিয়ে যায়। ফলে যে বিজ্ঞান অর্জন করতে চাইবে, তাকে অবশ্যই দ্বীন ছাড়তে হবে; আর যে দ্বীন চাইবে, সে বিজ্ঞান ছাড়বে।

ইসলামের পরিভাষায় মানুষ দুনিয়াতে প্রতিনিধি—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'(স্মরণ করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে (আমার) এক প্রতিনিধি (মানুষ) বানাব।"'[১৩৫]

যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'জিন ও মানুষকে আমি শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[১৩৬]

ইবাদতে মানুষের দুনিয়ার সব কর্ম অন্তর্ভুক্ত—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ

'বলুন, "আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই।"'[১৩৭]

কাঙ্ক্ষিত ইবাদতের মধ্যে রয়েছে দুনিয়াকে আবাদ করা—

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

১৩৫. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ৩০।
১৩৬. সুরা আজ-জারিয়াত, আয়াত নং ৫৬।
১৩৭. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ১৬২-১৬৩।

tauhiderdak.com

'তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদের বসতি দান করেছেন।'[১৩৮]

দুনিয়ায় রিজিকের জন্য চেষ্টা করা ও আল্লাহর নিয়ামত তালাশ করা—

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

'তিনি পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার পথে-প্রান্তরে চলো এবং আল্লাহর দেওয়া জীবিকা থেকে আহার করো। তাঁর কাছেই (প্রত্যাবর্তনের জন্য তোমাদের) পুনরুত্থান (হবে)।'[১৩৯]

এসব ক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে দুনিয়া আবাদকরণ, রিজিক অন্বেষণ ও জমিনে খলিফা হওয়ার দায়িত্ব পালনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাই এটা নিজস্বভাবে জীবনের কোনো লক্ষ্য নয়; বরং এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের সহযোগী।

অতঃপর মানুষ সামষ্টিকভাবে ইবাদতের জন্য সৃষ্ট। আর ইবাদতের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদে বিশ্বাস, ফরজ ইবাদতপালন, দুনিয়াকে আবাদ করা এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দুনিয়ায় হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা—

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'আমি স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমার রাসুলদের পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড দিয়েছি; যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।'[১৪০]

যার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের সামষ্টিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সামগ্রিক অর্থে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার নিজের স্থান গ্রহণ করেছে এবং অন্যান্য অংশের সাথে সম্পর্ক গড়েছে। তাই আমরা আশ্চর্য হই না যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী শুনি,

১৩৮. সুরা হুদ, আয়াত নং ৬১।
১৩৯. সুরা আল-মুলক, আয়াত নং ১৫।
১৪০. সুরা আল-হাদিদ, আয়াত নং ২৫।

tauhiderdak.com

(طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) 'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।'[১৪১]

সুতরাং ফরজ শুধু এমন বিষয় নয়, যা আদায় করা আবশ্যক; বরং ইসলামি পরিভাষায় তা এমন ইবাদত, যা দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি কামনা করে। আর ইসলামে এটাই হচ্ছে ইলমের অবস্থান। ইলম অর্জন একটি ইবাদত, যা দ্বারা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।

এখানে কেউ যেন এমন ধারণা করে না বসে যে, এটা শুধু শরয়ি ইলমের সাথে সম্পৃক্ত। যদিও শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করা মৌলিকভাবে ফরজ; যাতে সবাই জানে, কীভাবে আল্লাহর সঠিক ইবাদত করবে, দ্বীনের হালাল ও হারামগুলো কী কী এবং তার ওপর কোন কাজ করা উচিত এবং কোনগুলো উচিত নয়।[১৪২]

বরং এ বিধান সকল ইলমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যতক্ষণ তা আল্লাহ তাআলার সীমা থেকে বের না হবে। অন্যথায় আমাকে বলুন, মুসলিমরা এই বিধান কীভাবে পালন করবে?

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পারো শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরকেও আতঙ্কিত রাখবে।'[১৪৩]

.....

১৪১. সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস নং ২২৪।

১৪২. এই হাদিস দ্বারা মৌলিকভাবে শরয়ি ইলমই উদ্দেশ্য। মানবজীবনে ইসলামের দৈনন্দিন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। ইসলাম পালন করতে গিয়ে একজন ব্যক্তির জন্য যেই শরয়ি ইলম প্রয়োজন সেটা তার জন্য ফরজে আইন। কেউ ব্যবসা করতে গেলে তার ব্যবসা-সম্পর্কিত সাধারণ শরয়ি ইলম অর্জন করা তার জন্য ফরজ। আরেক ধরনের ইলমের স্তর আছে, সেটা ফরজে কিফায়া, ফরজে আইন নয়। যেমন শরয়ি ইলমের বিভিন্ন শাস্ত্রে সামগ্রিক দক্ষতা অর্জন করা ফরজে কিফায়া, কিছু সংখ্যক মুসলিম এটা অর্জন করবে। এমনিভাবে মানবসভ্যতা পরিচালনা কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা অথবা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য যেসব বৈষয়িক ও মানব আবিষ্কৃত জ্ঞান আছে, যেমন চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ফরজে কিফায়া। মুসলিমদের ভেতর একটি শ্রেণি এই বিদ্যাগুলো অর্জন করবে নিয়ত ও উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ রেখে। তাদের এই জ্ঞান অর্জন তখন ইবাদতে পরিণত হবে।

১৪৩. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৬০।

tauhiderdak.com

এই আদেশ কি বিজ্ঞান ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব? যার মধ্যে পদার্থ, রসায়ন, গণিত, প্রযুক্তিসহ আরও বহু বিদ্যা রয়েছে?

কীভাবে তারা আল্লাহ তাআলার এই আদেশ পালন করবে—

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

'তিনি পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার পথে-প্রান্তরে চলো এবং আল্লাহর দেওয়া জীবিকা থেকে আহার করো।'[১৪৪]

তারা কি জ্ঞান ছাড়া চলাচল করবে? জ্ঞান ছাড়া রিজিক সংগ্রহ করতে পারবে?

আল্লাহর এই আদেশের দিকে দেখুন—

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

'আসমানে ও জমিনে যা কিছু আছে, তা সবই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন।'[১৪৫]

জ্ঞান ছাড়া কি মানুষ এসব ব্যবহার করতে পারবে? মানুষ কি কোনো জিনিসকে 'হও' বললে হয়ে যায়? না ব্যবহারের জন্য জ্ঞানের প্রচেষ্টা লাগে?

এমন আরও অসংখ্য বিষয় প্রমাণ করে, যে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, তা শুধু শরিয়তের ইলম নয়; বরং উপকারী সব ইলমই অর্জন করা আবশ্যক। এখানে অবশ্য এক ইলম থেকে অন্যটার হুকুম ভিন্ন হবে। যেমন কিছু ফরজে আইন, আর কিছু ফরজে কিফায়া। তবে সর্বাবস্থায় তা ফরজ, যেমনটা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন।

তাই বিজ্ঞান যখন ইসলামের এ ধারা অনুসরণ করবে, তখন তা থেকে মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফলাফল দেখা দেবে।

---

১৪৪. সুরা আল-মুলক, আয়াত নং ১৫।

১৪৫. সুরা আল-জাসিয়া, আয়াত নং ১৩।

tauhiderdak.com

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলাফল

প্রথম ফলাফল, বিজ্ঞান ধর্মীয় বিশ্বাস ও বিধানের বিরোধী হওয়া সম্ভব নয়।

কেননা, বিজ্ঞান ও দ্বীন দুটোই মানুষের সুস্থ ফিতরাতের মূল অংশ এবং পরস্পরের পূর্ণতা দানকারী। যা মানুষের সঠিক অস্তিত্ব বাস্তবায়নে একটি অপরটিকে সাহায্য করে।

তাই মানুষ যেমন ফিতরাতগতভাবেই স্রষ্টার ইবাদতের দিকে ধাবিত হয়—

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

> ‘(স্মরণ করুন) যখন আপনার পালনকর্তা আদম-সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করে এনেছিলেন এবং তাদের থেকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, “আমি কি তোমাদের রব নই?” তখন তারা বলেছিল, “হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।”’[১৪৬]

তেমনই ফিতরাতের প্রবণতা থেকেই মানুষ জ্ঞানার্জন, বস্তুজগতের ব্যবহার ও বিজ্ঞান দ্বারা জীবনমান উন্নত ও সুন্দর করার দিকে ধাবিত হয়। কারণ, মানুষ জন্মগতভাবেই ভোগসামগ্রীর প্রতি মহব্বত লালন করে। তাই ভোগের মাধ্যমগুলো উন্নতি করে তা জরুরতের স্তর থেকে প্রয়োজনের স্তর পাড়ি দিয়ে সৌন্দর্যের স্তরে নিয়ে যায়।

সুতরাং কীসের কারণে একটি প্রবণতা অন্যটির বিরোধী অবস্থানে চলে গেছে?

ইউরোপের আধুনিক জাহিলিয়াতে এমনটা ঘটেছে। কেননা, সেখানে গির্জা থেকে প্রাপ্ত বিকৃত ধর্ম বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত ছিল। তাদেরকে পাদরিরা জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে মারত। কারণ, তারা গির্জার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করত। এর ফলশ্রুতিতে এই জাহিলিয়াত দ্বীনকে সংশোধনের পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে ছুড়ে ফেলে এবং বিজ্ঞানকে দ্বীনের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়।

তবে সত্যিকার অর্থে এটাই একমাত্র কারণ ছিল না।

বরং ইউরোপ যখন ধর্মের পোশাক ছুড়ে ফেলেছে, প্রথমে দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা এবং পরে জনগণ। তখন তারা গ্রিকো-রোমান চিন্তাধারায় ফিরে গেছে, সেখান থেকে

---

১৪৬. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ১৭২।

tauhiderdak.com

তাদের নতুন জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে তাদের মাঝেও গ্রিক জাহিলিয়াতের মতো 'মানুষ' ও 'স্রষ্টা'র মাঝে চিরন্তন শত্রুতার বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা, গ্রিক পুরাণে মানুষ ও স্রষ্টার সম্পর্ককে শত্রুতা, অবাধ্যতা ও বিরোধের সম্পর্ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, দেবতারা সর্বদা মানুষকে পরাজিত করতে চায়; যাতে মানুষ দেবতাদের স্থান দখল করতে না পারে। আর মানুষ সর্বদা প্রভুর অবাধ্যতা করে নিজের অস্তিত্ব ও শক্তি প্রমাণের চেষ্টা করে।[১৪৭]

আধুনিক জাহিলিয়াত সর্বদাই এই সম্পর্কের মাঝে ঘৃণা ছড়িয়েছে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে দূরত্ব তৈরি করেছে। এমনকি অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মানুষের অনুভূতিতে এটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে, যেটা নাস্তিক লেখক জুলিয়ান হাক্সলি তার 'আধুনিক বিশ্বে মানুষ' বইয়ে লিখেছে, 'অজ্ঞতা ও অক্ষমতার যুগে মানুষ আল্লাহর অনুগত হতো। কিন্তু এখন তারা জ্ঞানার্জন করে প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর পূর্বে মূর্খতা ও অক্ষমতার যুগে যা আল্লাহর কাঁধে অর্পণ করত, তা নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার সময় এসেছে। যার মাধ্যমে সে দেবতা হয়ে উঠবে।'

এর পেছনে জাহিলিয়াতের যুক্তি বা আপত্তি যেটাই থাকুক, এটা তার বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের সাথে চরম পর্যায়ের অপরাধ করেছে। কেননা, তা মানুষের পরস্পর সহযোগী মূল দুটো স্বভাবগত চাহিদাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ইবাদতের চাহিদা ও জ্ঞানের চাহিদা। অতঃপর দুটোকে বিরোধী ও শত্রুতার স্থানে রেখে মানুষকে তার দুটো স্বভাবের মাঝে ও সৃষ্টিগত প্রয়োজনের মাঝে ভাগ করে ফেলেছে। ফলে তার জন্য একটা অর্জন করতে চাইলে অন্যটা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এই জাহিলিয়াত তার আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে মানুষের জন্য যতই সহজতা প্রদান করুক, মানুষকে এই বিজ্ঞান দ্বারা ধোঁকা ও ব্যর্থ করে দিয়েছে। পরিকল্পিতভাবে বিজ্ঞানকে আকিদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এমন ভ্রান্ত তথ্যের মাধ্যমে, যার কোনো অস্তিত্ব বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। যেমন ডারউইনের স্বয়ং প্রকৃতিকে স্রষ্টা বানানোর তত্ত্ব। যে ব্যাপারে সে বলেছে, 'প্রকৃতিই সবকিছু সৃষ্টি করেছে এবং তার সৃষ্টিক্ষমতার কোনো সীমা নেই।' অথবা বস্তুবাদীদের ধারণা, 'পদার্থ হচ্ছে চিরস্থায়ী', যার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এ ছাড়া মাঝে মাঝেই তাদের পিয়ার রিভিউড সাইন্স ম্যাগাজিনে খবর প্রচারিত হয় যে, পরীক্ষাগারে কোষ সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর আবার সে একই ম্যাগাজিনে কিছু দিন পর বলা হয়, সেই খবর ছিল ভুয়া।

.....

১৪৭. লেখক 'আধুনিক জাহিলিয়াতের ইতিবৃত্ত' (রুহামা পাবলিকেশন থেকে এই নামে অনূদিত) বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

tauhiderdak.com

সুতরাং ইসলামি বিজ্ঞান-কার্যক্রম সর্বদাই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে এর কর্মপদ্ধতির সঠিকতা ও অবিচলতার মাধ্যমে। এবং মানুষকে তার সামষ্টিক পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসেবে গণ্য করার কারণে, যে সত্তার প্রতিটি অংশ পরস্পর সংযুক্ত ও সম্মিলিতভাবে পদক্ষেপ নেয়। যার সমস্ত স্বভাব ও কাজের ক্ষেত্র একই দিকে ধাবিত হয়, যেখানে একটি অপরটির সাথে ধাক্কা খায় না এবং একটি কর্মক্ষেত্র অন্যটির সাথে বিরোধ হয় না। কেননা, মানুষের সবকিছুই সামগ্রিক অর্থে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে অভিমুখী। যার মধ্যে দুনিয়ার প্রতিনিধিত্ব এবং আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জমিনকে আবাদ করা অন্তর্ভুক্ত। তেমনই রয়েছে মানুষকে তার উপযুক্ত স্থানে উঠিয়ে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করা। তা হলো, সেই 'আমানত' বহন করা, যা বহনে আসমান-জমিন-পাহাড় অস্বীকার করেছে এবং মানুষ তা বহন করেছে।

দ্বিতীয় ফলাফল, বিজ্ঞান কখনো চরিত্র নষ্টের মাধ্যম হবে না।

কেননা, জ্ঞান যেহেতু মানুষের কর্ম। আর মানুষের সকল কাজই আল্লাহর দ্বীন অনুযায়ী মানুষ ও আল্লাহর মাঝে সংগঠিত চারিত্রিক প্রতিশ্রুতির অধীন, তাই স্বাভাবিকভাবেই তা দ্বারা কখনো চরিত্র ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আধুনিক জাহিলিয়াত একদিকে যদিও বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও জীবনযাত্রায় তা ব্যবহারে উৎকৃষ্ট নমুনা পেশ করেছে, তবে অন্যদিকে বিজ্ঞানকে চরিত্র ধ্বংস ও ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্টের কাজে সমানভাবে ব্যবহার করেছে।

এর একটা সাধারণ নমুনা হচ্ছে, একদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল, বাচ্চা ফেলে দেওয়া ইত্যাদি সিস্টেম কোনো নিয়মনীতি ছাড়া মেয়েদের হাতের নাগালে দেওয়া। অন্যদিকে মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক অশ্লীলতার প্রচার ও ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা একেবারে সহজ করে তোলা হয়েছে। এই কাজের উদ্দেশ্য একেবারে স্পষ্ট। যখন সমাজের সামনে এমন অবৈধ সম্পর্কে কোনো বাধা থাকবে না, তখন তারা অশ্লীলতার অতল গহিনে হারিয়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না। আর বাস্তবে এটাই হয়েছে।

মোটকথা, আধুনিক সভ্যতায় মিডিয়া, ডিভাইস প্রযুক্তি, ব্যবসা, চিকিৎসা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে চরিত্র ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে; অথচ এসবকে মানুষের কল্যাণ ও সঠিক পথ-প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা যেত। কিন্তু এখন এগুলো শুধু চরিত্র নষ্ট নয়; বরং মানুষের ফিতরাত ধ্বংসের জন্য ব্যবহার হচ্ছে।

tauhiderdak.com

তৃতীয় ফলাফল. জ্ঞান কখনো অন্যায়ের মাধ্যম হতে পারে না।

যতদিন মানুষ ইসলামি নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে কল্যাণের দিকে ধাবিত হবে, সকল কাজ আল্লাহর জন্য করবে এবং আল্লাহর পর্যবেক্ষণের চিন্তা রাখবে—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ

'বলুন, "আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই।"'[১৪৮]

যতদিন বিষয়টা এমন থাকবে, ততদিন জ্ঞান মানুষের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিশ্বাস ও চারিত্রিক বাধা বিজ্ঞানকে মন্দের ক্ষেত্রে ব্যবহার থেকে রক্ষা করবে।

আধুনিক জাহিলিয়াত, যা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে, এরাই মানুষের ওপর অকল্পনীয় বিপর্যয়ের জন্য পরমাণুশক্তি ব্যবহার করেছে। আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে (বইটি লেখা হয়েছে ১৯৮৬ সালে, তখনকার হিসাব অনুযায়ী ৪০ বছর পূর্বে) হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে দুটো পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে, তা সেখানে প্রাণের সব চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলেছে। যার প্রভাবে বহু বছর পরেও বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিয়েছে। অথচ এই বোমাকে আধুনিক ব্যাপক ধ্বংসাত্মক শক্তির তুলনায় বাচ্চাদের খেলনা গণ্য করা হয়।

এই জাহিলিয়াত তাদের অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় এত বিলিয়ন ডলার খরচ করছে, যা দিয়ে পুরো বিশ্বের সমস্যা তথা মানুষকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্ত করা সম্ভব। বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের জন্য উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করা যেত, যা আজ মনুষ্যত্বের স্তর থেকে বহু নিচে অবস্থান করছে। তা সত্ত্বেও এই নিকৃষ্ট প্রতিযোগিতা বন্ধ বা তারা পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। চূড়ান্ত কোনো সমাধানেও যাচ্ছে না।

ইসলামি বিজ্ঞান-কার্যক্রমের এসব কিছু থেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, (যা একই সময়ে এই উম্মাহর নিদর্শনও বটে) জ্ঞান-বিজ্ঞান এই দ্বীনের সামগ্রিকতা, ভারসাম্য ও পূর্ণাঙ্গতার অংশ। যা তা থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়।

ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান-কার্যক্রম সর্বদাই সঠিক আকিদার অধীনে পরিচালিত হয়েছে। যার ফলে দুটোর মাঝে কখনো দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরোধ হয়নি।

---

১৪৮. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ১৬২-১৬৩।

tauhiderdak.com

তা ছাড়া দ্বীনের বাস্তবতার এমন কিছু নেই, যা সঠিক বিজ্ঞানের বিরোধী, তেমনই সঠিক বিজ্ঞানেও এমন কিছু নেই, যা এই দ্বীনের বিপরীত। তাই কোনো মুসলিম বিজ্ঞান শেখার জন্য তার বিশ্বাসকে পার্শ্বে রাখা বা ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। তেমনই দ্বীন রক্ষার জন্য বিজ্ঞান ও জ্ঞানের অবদানকে ছুড়ে ফেলার দরকার নেই। সে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করবে এবং একই সময়ে আল্লাহর পরিপূর্ণ ইবাদত করবে।

ইসলামি ইতিহাসে সে ঘৃণ্য সংঘাত হয়নি, যা ইউরোপে গির্জার শাসনের অধীনে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে হয়েছে। কারণ, ইসলামে এর কোনো প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা নেই; বরং একজন ব্যক্তি শরিয়তের আলিম হওয়ার পাশাপাশি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিজ্ঞানী হতে পারবে। যেখানে তার নিজের মাঝে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব হবে না এবং রাষ্ট্র বা কোনো মানুষ থেকে বাধার শিকার হবে না।

নিঃসন্দেহে মানুষ থমকে যাবে, যখন দেখবে, হাসান ইবনুল হাইসাম অনেক সূক্ষ্ম এক বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোকবিদ্যা বিষয়ে লিখছেন। সেখানে তিনি 'বিসমিল্লাহ' ও আল্লাহর হামদ-সানা দিয়ে শুরু করছেন এবং আল্লাহ থেকে তাওফিক গ্রহণ করছেন। অন্যদিকে আমরা ডারউইনকে দেখি, সে এমন বিষয়ে লিখছে, যা স্বাভাবিকভাবে মানুষের অন্তর নরম করে এবং আল্লাহভীতি তৈরি করে, তা হলো, জীববিদ্যা, মৃতকে জীবন থেকে বের করা ও প্রাণিজগতের প্রকার। সেখানে সে একবারের জন্য আল্লাহর নাম নেয়নি; বরং বলছে, 'প্রকৃতিই সব সৃষ্টি করেছে এবং এর সৃষ্টিক্ষমতার কোনো সীমা নেই।' পরবর্তী সময়ে সে-ই আবার বলছে, 'প্রকৃতি আন্দাজে ঢিল ছুড়েছে।'

দুটো বিজ্ঞান-কার্যক্রমের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো, একটি হিদায়াতপ্রাপ্ত, অপরটি পথভ্রষ্ট। হিদায়াতপ্রাপ্ত কার্যক্রম ছিল আলোকবর্তিকা, যা পুরো বিশ্বকে আলোকিত করে তুলেছে। ইউরোপকে এর পশ্চাৎপদতা ও মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে বের করে এনে জ্ঞান ও সভ্যতা চিনিয়েছে। (যদিও তারা এই আলোর উৎস গ্রহণে অস্বীকার করেছে; ফলে বিকৃত ভ্রষ্ট সভ্যতার জন্ম দিয়েছে)। অন্যদিকে পথভ্রষ্ট আন্দোলন আজ পুরো বিশ্বে কালো ছায়া প্রসারিত করেছে। এটা কিছু কল্যাণকর অবদান রাখলেও পুরো মানবসমাজকে অশ্লীলতা ও গোমরাহিতে পূর্ণ করে ফেলেছে।

আর ইসলামি আন্দোলন সর্বদা মানুষের অধিকার রক্ষা করেছে। বিজ্ঞান ও এর অবদান মানুষের উপকারে লাগিয়েছে। মানুষের আকিদা-বিশ্বাস ও চরিত্র হিফাজত করেছে। কারণ, তা এই দ্বীনের অংশ ও আল্লাহর দ্বীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

tauhiderdak.com

সাত.
ইসলামি সভ্যতার জাগরণ

এখানে সভ্যতার জাগরণ দ্বারা এর বস্তুগত ও সাংগঠনিক দিক উদ্দেশ্য। যার উত্থান প্রথম প্রজন্ম থেকে কিছু দেরিতে হয়েছে। কিন্তু সভ্যতার আধ্যাত্মিক ও আদর্শগত দিক প্রথম মুহূর্ত থেকেই মদিনার মুসলিম-সমাজে ফুটে উঠেছিল; বরং ইতিপূর্বে মক্কায় ইসলামি জামাআত গঠনের সময় থেকেই তা হয়েছে।

এই বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

বর্তমানে মানুষ সভ্যতা শব্দটি জীবনের শুধু বস্তুগত ও সাংগঠনিক দিকেই প্রয়োগ করে; যদিও তা আভিধানিক অর্থ থেকে ভিন্ন নয়। কেননা, সভ্যতা হচ্ছে শহুরে মানুষের কার্যক্রম, বিপরীতে গ্রামের মানুষের অবস্থাকে গ্রাম্য সমাজ বলা হয়।

কিন্তু ইসলাম সভ্যতার বিশেষ ব্যাখ্যা ও পরিভাষা প্রণয়ন করেছে, যা দ্বারা অভিধানিক অর্থকে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন সালাতের শাব্দিক অর্থ দুআ; কিন্তু তা ইসলামি পরিভাষায় এমন কিছু নির্দিষ্ট আমল, যাতে দুআ রয়েছে ঠিক, তবে সেগুলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া রয়েছে। অভিধানে জাকাত হলো পবিত্রতা ও বৃদ্ধি; কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় তা হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও খাতে ব্যয় করা হয়। দ্বীনের শাব্দিক অর্থ হলো মানুষ যা কিছু ধারণ করে বা বিশ্বাস করে বা যা দ্বারা শাসিত হয় বা যার কাছে বিধান চায়; কিন্তু ইসলামি পরিভাষায় তা হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত নির্দিষ্ট ধর্ম।

সভ্যতা শব্দটিও এমন। অভিধানে তা হলো, সভ্য শহুরে মানুষের কাজ; কিন্তু ইসলামি পরিভাষামতে, সভ্যতা হলো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিশ্বকে গড়ে তোলা। এখানে বস্তুগত ও গঠনতান্ত্রিক বিষয়ের সাথে আদর্শিক বিষয়ও প্রবেশ করবে, যা এই দ্বীনের মূল অংশ। অর্থাৎ ইসলামি সভ্যতায় দুটো বিষয় এক করা হয়। বিপরীতে আধুনিক জাহিলিয়াতে দুটোকে বিচ্ছিন্ন করে একটির নাম দেওয়া হয় সংস্কৃতি Culture, যেখানে শুধু আদর্শ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অন্যটি সভ্যতা বা Civilization, সেখানে শুধু বস্তুগত ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনা থাকে।

tauhiderdak.com

মর্ডান জাহিলিয়াত এখানে এমন বিভাজন করেছে, যার কোনো বাস্তবতা নেই। কেননা. বস্তুগত ও সাংগঠনিক উন্নতি মানুষের জীবনে আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং তা দ্বারা প্রভাবিত এবং তাতে প্রভাব ফেলে। তেমনই আদর্শ কখনো শূন্য অবস্থায় থাকে না; বরং তা বস্তুগত ও বিন্যাসকাঠামোতে প্রভাব ফেলে। তাই এই পার্থক্য শুধুই তাত্ত্বিক, যার কোনো বাস্তবতা নেই। বর্তমান জাহিলিয়াতে এই অবাস্তব বিষয়টি স্থান করে নিতে পারছে; কারণ, পুরো জাহিলিয়াতই আদর্শ ও বাস্তবতার বিভাজনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিভিন্ন থিউরির ক্ষেত্রে চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়; কিন্তু বাস্তবায়নের সময় কোনো খোঁজ থাকে না। তারা তত্ত্ব ও বাস্তবের ভিন্নতায় সমস্যা মনে করে না।

আমরা পরিভাষা নিয়ে পশ্চিমা জাহিলিয়াতের সাথে প্রতিযোগিতা করছি না; বরং আমাদের কথা হলো, সভ্যতায় বস্তুগত ও আদর্শিক উভয় দিকই রয়েছে। 'ইসলামি সভ্যতা' হলো অবিচল আদর্শ এবং বস্তুগত ক্রম উন্নয়নের সমন্বয়। যেখানে অনিবার্যভাবে আদর্শ ও পরিবর্তনশীল বস্তুগত উন্নতির মাঝে সম্পর্ক বজায় থাকে; যাতে একে 'ইসলামি সভ্যতা' নামকরণ করা সম্ভব হয়। কারণ, যদি আদর্শ পালটে যায় এবং ইসলামের বিধান থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে তাকে আর এই নামে ডাকা যাবে না। আর যদি পরিভাষা পালটে শুধু বস্তুগত ও ব্যবস্থাপনাগত উন্নতির অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা জাহিলি সভ্যতা হয়ে যাবে, যা আল্লাহর দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মোটকথা, কোনো অবস্থাতেই বস্তুগত ও ব্যবস্থাপনাগত অবস্থা আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেক সভ্যতাকে একই সাথে দুটো বিষয় দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়, শুধু বস্তুগত ও সাংগঠনিক অবস্থা দ্বারা নয়; বরং উলটো আদর্শের ভিত্তিতে মূল্যায়নই মূল ও গ্রহণযোগ্য হবে। যার কারণও একেবারে স্পষ্ট। তা হলো, মানুষ সর্বনিম্ন বস্তুগত উপকরণেও বেঁচে থেকে সর্বোত্তম মানুষ হতে সক্ষম। কিন্তু আদর্শ ও মূল্যবোধ ছাড়া সে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে সক্ষম নয়, তার কাছে যতই বস্তুগত উন্নত উপকরণ থাকুক।

সাহাবা ﷺ-এর প্রজন্মের সাথে বর্তমান পশ্চিমা জাহিলি প্রজন্মের তুলনা করলেই বিষয়টা চূড়ান্তভাবে বুঝে আসে। দুই প্রজন্মের কারা সর্বোত্তম মানুষ? কারা মানুষের অনুভূতি, মানুষের চিন্তাধারা, মানুষের চরিত্র, মানুষের দূরদৃষ্টি এবং মানুষের উপযুক্ত কাজ ও প্রচেষ্টা করে বাস করত?

tauhiderdak.com

উত্তরটি নিঃসন্দেহে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত।

যেই প্রজন্মের কাছে বস্তুগত ও সাংগঠনিক সভ্যতার কিছু ছিল না, তারাই কিনা কোনো বিতর্ক ছাড়াই মানব ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর বর্তমান জাহিলিয়াত মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ বস্তুগত ও সাংগঠনিক উন্নত সভ্যতার ধারক হয়েও তারাই ইতিহাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সভ্যতার একটি। কেননা, তারা শুধু স্বার্থবাদী আদর্শ ও মূল্যবোধ ব্যতীত আর কিছুই চিনে না। তাই আমরা সে সোনালি প্রজন্মের উন্নত সভ্যতার বিপরীতে আধুনিক জাহিলিয়াতকে পতনশীল সভ্যতা নাম দিয়েছি।

তাই আমরা নিশ্চিন্তে বলছি, ইসলামই একমাত্র সভ্যতা। আর মুসলিম-সমাজই হচ্ছে একমাত্র সভ্য সমাজ। তাদের বস্তুগত উন্নতি ও অবকাঠামো যেমনই হোক।

কিন্তু সুস্থ স্বভাবের মানুষের স্বাভাবিক বিষয় হচ্ছে, তারা বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় দিক কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ব্যতীত একই সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে আদায় করতে চেষ্টা করে। ফিতরাত ও বাস্তব জীবনে এ পূর্ণতা মানুষের সুস্থ বুদ্ধির আলামত, যাকে আল্লাহ তাআলা জমিনের মাটি ও রুহের ফুৎকার দ্বারা সৃষ্টি করেছেন—

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ - فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

'(স্মরণ করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বললেন, "আমি (ঠিক করেছি) মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করব। সুতরাং যখন আমি তার আকৃতি ঠিক করে তাতে আমার (সৃষ্ট) প্রাণ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার সম্মানে সিজদায় পড়ে যেয়ো।"'[১৪৯]

ইসলাম ফিতরাতের (সুস্থ স্বভাব) দ্বীন হিসেবে একসাথে উভয় দিক তৃপ্ত করতে বলে; চাই তা আত্মা ও শরীর অথবা দুনিয়া ও আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত হোক।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

'তোমরা নামাজ আদায় করো এবং জাকাত দাও।'[১৫০]

১৪৯. সুরা সদ, আয়াত নং ৭১-৭২।

১৫০. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

'তোমরা খাও এবং পান করো।'[১৫১]

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দিয়ে পরকালের (সুখের) আবাস সন্ধান করো। দুনিয়ায় তোমার অংশ (বৈধ ভোগের পরিমাণ) ভুলে যেয়ো না।'[১৫২]

ইসলাম যদিও আত্মিক মূল্যবোধ ও আদর্শকে প্রাধান্য দিয়েছে, যা আসলে করণীয়, তবে তা বস্তুগত দুনিয়ার দিককে অবহেলা বা নিষ্ক্রিয় করেনি; বরং সবকিছুকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়েছে—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ - قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ - الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

'নারী, সন্তানসন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের অঢেল সম্পদ, ছাপযুক্ত ঘোড়া, গবাদিপশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কাম্যবস্তুর আকর্ষণ মানুষের জন্য মনোহর করা হয়েছে। এসব হলো পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল (জান্নাত)। বলুন, "আমি কি তোমাদেরকে এগুলোর চেয়ে ভালো কিছুর সংবাদ দেবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট এমন সব জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আরও রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনীরা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের

১৫১. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ৩১।

১৫২. সুরা আল-কাসাস, আয়াত নং ৭৭।

tauhiderdak.com

সবকিছু দেখেন।" যারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা তো ইমান এনেছি, তাই আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের দোজখের আজাব থেকে রক্ষা করুন।" যারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, (আল্লাহর) অনুগত, (সৎপথে) ব্যয়কারী ও শেষ-রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।'[১৫৩]

কিন্তু মানুষ যদি এক পার্শ্বের ওপর অন্য পার্শ্বকে প্রাধান্য দেয়, তাহলেই তার জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে; চাই সে আত্মিক দিককে প্রাধান্য দিয়ে দুনিয়ার অংশকে ত্যাগ করুক; যা সন্ন্যাসী, হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরোহিতরা করে। অথবা দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়ে আত্মিক বিষয় সম্পূর্ণ ত্যাগ করুক, যা আধুনিক জাহিলিয়াত করে। অন্যদিকে ইসলাম দুই পার্শ্বকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে; যার ফলে সুস্থ সঠিক মানুষ গড়ে ওঠে, যারা তাদের জীবনে সর্বোচ্চ স্তরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

তাই মুসলিম-সমাজে উত্তম আদর্শ ও উন্নত মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিতি আত্মিক দিক পূর্ণতার পর সভ্যতার বস্তুগত ও সাংগঠনিক দিকে উন্নতি সাধিত হওয়া ছিল একেবারে স্বাভাবিক বিষয় এবং তাদের সুস্থ বুদ্ধির আলামত।

যদিও বিষয়টা ঘটতে কিছু সময় লেগেছে, তবে প্রাচীন আরবজীবনে বস্তুগত সভ্যতার সবকিছু শুরু থেকে হওয়ার কারণে এতটুকু সময় দেরি হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কেননা, পূর্বে তাদের জীবনে পরিবর্তনের কোনো অনুভূতিই ছিল না।

অতঃপর ইসলাম এসে একেবারে অভ্যন্তর থেকে মানুষের অন্তর পরিবর্তন করে দেয়। ফলে ফিতরাত সব দিকে তার পূর্ণ সত্তা নিয়ে কার্যকর হয়ে ওঠে। আর এসব দিকের মাঝে বস্তুগত ও সাংগঠনিক দিকও রয়েছে, যা নবজন্ম ও ইসলামের বিশাল উজ্জীবিত প্রাণশক্তির প্রভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

বিজ্ঞানের জাগরণের ক্ষেত্রে আমরা যা বলেছি, এখানে বস্তুগত ও সাংগঠনিক উন্নতির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কারণ, এর জন্য সেই উপকরণ প্রয়োজন ছিল, যা বিজ্ঞানের জাগরণের জন্য কাঙ্ক্ষিত ছিল। যা ইসলামপূর্ব আরব বেদুইন জীবনে একেবারেই ছিল না বা অসম্পূর্ণ ছিল।

তাদের তখন ঐক্য, স্থিরতা, নিরাপত্তা ও প্রশান্তির প্রয়োজন ছিল। তেমনই দরকার ছিল বিশাল উজ্জীবিত প্রেরণা, যা এ ক্ষেত্রে পূর্বে তাদের অবহেলার ঘাটতি পূরণ

১৫৩. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৪-১৭।

tauhiderdak.com

করবে। ইসলাম এসব কিছুই পূর্ণভাবে ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে প্রথমে সভ্যতার আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পর বস্তুগত ও সাংগঠনিক অংশও উন্নত হয়।

মুসলিমরা বিজ্ঞানের জাগরণের জন্য যেভাবে গ্রিকদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তেমনই সভ্যতার বস্তুগত ও সাংগঠনিক অংশের সূচনার জন্য পারস্য ও বাজেন্টাইনের থেকে শিক্ষা অর্জন করেছে; যাতে তাদের বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্জিত হয়, যেভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বুঝ তৈরি হয়েছিল।

মুসলিম সেনাসংখ্যা বৃদ্ধির পর উমর ﵁-কে বলা হয়, 'যদি বিভিন্ন দপ্তর গঠন করতেন, ভালোই হতো।' তখন তিনি এতে আগ্রহী হন। এটা ছিল সাংগঠনিক একটি বিষয়, যার প্রয়োজন এই নবগঠিত রাষ্ট্র অনুভব করে; তাই দ্বিধা ছাড়াই অন্যদের থেকে গ্রহণ করেছে। এটা ছাড়াও আরও বহু কিছু গ্রহণ করেছে। ধীরে ধীরে একসময় এই নতুন সমাজ নিজেদের স্বতন্ত্র ধাঁচ-স্বাদ আবিষ্কার করে; যার ফলে অন্যদের থেকে গ্রহণের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। অতঃপর তারাই সভ্যতার সর্বক্ষেত্রে যেমন শহর-নগর গড়ে তোলা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদিতে বিশাল অবদান রাখে।

এখানে বিশেষভাবে একটি বিষয় বলা উচিত, এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম গ্রিক, রোমান ও পারস্য থেকে বিজ্ঞান বা বস্তুগত ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো বিভিন্ন কিছু গ্রহণ করেছে। একসময় তাদের নিজেদের বিশেষ ধাঁচ-ধরন অর্জিত হয়ে যায়। ফলে তারা আর কপি করেনি; বরং নিজেরাই প্রতিটা ক্ষেত্রে উস্তাদ হয়ে যায় এবং ইউরোপ সর্বক্ষেত্রে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে।

মুসলিমরা যখন গ্রহণ করেছে, তখনও তারা মর্যাদাবান ও উঁচু অবস্থানে ছিল—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং বিষণ্ণ হয়ো না। (প্রকৃত) ইমানদার হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[১৫৪]

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

'আসলে মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসুলের ও মুমিনদের।'[১৫৫]

১৫৪. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৩৯।

১৫৫. সুরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত নং ৮।

tauhiderdak.com

ইমানের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদার অনুভূতি দ্বারা অন্তর পূর্ণ ছিল। তাই তারা গ্রিক, রোমান ও পারসিকদের থেকে গ্রহণে নিজেদের তাদের থেকে ছোটো ভাবেননি; এমনকি তাদের প্রতি প্রয়োজনের কারণে তাদের সামনে নিজেদের তুচ্ছ বা দুর্বল অনুভব করেননি; বরং ভেবেছেন যে, তারাই ঊর্ধ্বে ও সম্মানিত; যদিও তারা অন্যদের প্রতি মুখাপেক্ষী। কারণ, তারা মুমিন এবং অন্যরা মুমিন নয়। যার ফলে তারা পার্শ্ববর্তী জাহিলিয়াতের কোনো কিছুতে মুগ্ধ বা ফিতনাগ্রস্ত হননি; বরং সম্মান ও মর্যাদাসহই তাদের জন্য যা উপকারী, তা গ্রহণ করেছেন এবং যেগুলো দ্বীন ও আকিদার বিরোধী, তা বর্জন করেছেন। কেননা, উঁচু স্থান তাদেরকে বাছাই করার সুযোগ দিয়েছে। অন্যদিকে দুর্বল, অনুগত ও মুগ্ধতার অবস্থায় বাছাই করার সুযোগ—এমনকি সক্ষমতাও থাকে না। তখন ভালো-মন্দ সব গ্রহণ করে; বরং ভালোর তুলনায় মন্দই বেশি নেয়, কারণ তা গ্রহণ করা সহজ ও সস্তা।

তাই আমরা আশ্চর্য হই না, যখন দেখি, শুরুযুগের মুসলিমরা গ্রিকদের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করা সত্ত্বেও তাদের রূপকথা অনুবাদ করেনি; এমনকি সেগুলোকে কোনো পাত্তাই দেয়নি; বরং শিরক ও কুসংস্কার হিসেবে দেখেছেন, যার কোনো মূল্য নেই।[১৫৬]

বস্তুগত ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তারা এমনই করেছেন। যেগুলোর প্রয়োজন মনে করেছেন, শুধু তা গ্রহণ করেছেন। আর যেগুলোয় শিরক, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, চিন্তাগত ভ্রান্তি ও আচরণগত বিচ্যুতি ছিল, তা গ্রহণ করেননি। তা ছাড়া তারা যা গ্রহণ করেছেন, সবই ছিল বিভিন্ন মাধ্যম-উপকরণ। মূলনীতি বা কর্মপন্থাগত কিছুই গ্রহণ করেননি। অতঃপর যা গ্রহণ করেছেন, সেগুলোকে দ্রুত নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনবিধানের অনুগত করে নেন; যার ফলে সেগুলোতে অনুকরণ নয়; বরং নিজেরাই মূল হয়ে যান।[১৫৭]

বিশেষত অন্যদের থেকে গ্রহণের ক্ষেত্রে মৌলিকত্ব চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মৌলিকত্ব অন্যদের জ্ঞান ও বস্তুগত সভ্যতার অবদান থেকে ফায়দা গ্রহণে বাধা দেয় না। এগুলো মূলত মানুষের সামষ্টিক প্রচেষ্টার ফসল, যা তারা বহু জাতি ও প্রজন্ম ধরে ক্রমধারায় বহন করে আসছে। তবে তা অন্যদের থেকে গ্রহণ করতে গিয়ে তাদের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়া বা নিজ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলাকে বাধা দেয়।

.....

১৫৬. অথচ মুগ্ধতার যুগে তহা হুসাইন বলেছে, 'যে গ্রিক রূপকথা পড়বে না, সে সাহিত্যিক হতে পারবে না।'

১৫৭. অন্যদিকে দেখুন, শেষ যুগে এসে মুসলিমরা কীভাবে নিজেদের শিকড় হারিয়ে পশ্চিমাদের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে!

tauhiderdak.com

মৌলিকত্বের প্রধান মাধ্যম হলো, ব্যক্তির জীবনে বিশেষ আকিদা ও মানহাজ থাকা। যার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সে মুসলিম হওয়া। কারণ, তখন তার নিকট সঠিক আকিদা ও জীবনব্যবস্থা থাকবে। তাই যদি কেউ প্রথম প্রজন্মের মতো মুসলিম হয়, তাহলে তার সর্বোচ্চ মৌলিকত্ব অর্জিত হয়ে যাবে। যা তাকে অন্যদের থেকে গ্রহণের সময় শুধু বিলীন হওয়া বা ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলা থেকেই রক্ষা করবে না; বরং দ্রুত তাদের স্বতন্ত্র ধাঁচ-পন্থা অর্জিত হবে এবং স্বল্প সময়ে শিষ্যত্বের অবস্থা থেকে উন্নত হয়ে দ্রুত অন্যদের শিক্ষক হয়ে যেতে সক্ষম হবে।

মুসলিম উম্মাহর (প্রথম প্রজন্মে) ক্ষেত্রে তারা অন্যদের থেকে যেসব বিষয় গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল, সেসব ময়দানে এটাই ঘটেছে। যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র, বস্তুগত ও সাংগঠনিক ক্ষেত্র। তাই তো দেখা যায়, ইউরোপ থেকে শিক্ষা করা এবং পরবর্তী সময়ে আবার ইউরোপকে শিক্ষা দেওয়ার মাঝে স্বল্প কিছু যুগ ব্যবধান ছিল।

tauhiderdak.com

ইসলামি সভ্যতার স্বতন্ত্রতা

তবে এই আলোচনায় আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলামি সভ্যতার বস্তুগত ও সাংগঠনিক আকর্ষণিক উন্নতি এবং তাদের মৌলিকত্ব অর্জন নয়; বরং আমাদের কাছে মূল হলো, তারা যেই বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য সভ্যতা থেকে স্বতন্ত্র এবং যা এই মুসলিম উম্মাহর বিশেষ একটি গুণ।

ইতিহাসের প্রতিটা সভ্যতার মাঝেই সাংগঠনিক, স্থাপত্য ও বস্তুগত কার্যক্রমের সাথে তাদের জীবনের বুঝ ও উদ্দেশ্যের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আবার সমস্ত সভ্যতায় কিছু বিষয় আছে, যা সবার মাঝেই রয়েছে। যার কারণ সবাই তো মানুষ। আর সেসব যৌথ বিষয় হয়তো কোনো

নির্দিষ্ট প্রবণতা বা নির্দিষ্ট প্রয়োজন। যেমন বৈঠকখানা, ঘরবাড়ি, খাবার, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি।

তবে এমন প্রয়োজনের দিকগুলো এখানে ধর্তব্য নয়; বরং মূল হলো জীবনের স্বাধীন অংশ, যা মানুষের বুঝ ও জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত এবং যা প্রয়োজনের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে এবং তাতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এনে দেয়।

যেমন একটি বাড়ি, যা একটি আশ্রয় এবং সেখানে মানুষ বাস করে। কিন্তু মুসলিম স্থাপত্য ও আধুনিক জাহিলিয়াতের বাড়ির দিকে প্রাথমিক দৃষ্টিতে তাকালেই তাদের চিন্তাধারা ও আচরণের বিশাল পার্থক্য স্পষ্ট হয়। কেননা, ইসলামি স্থাপত্যে বাড়ি হলো শিষ্টাচার, চরিত্র ও সম্ভ্রমের রক্ষাকবচ। কিন্তু আধুনিক জাহিলিয়াতে সব প্রকাশ ও উন্মুক্ত রাখা হয়, যা মূলত ঢেকে রাখা উচিত ছিল।

মুসলিম বাড়িতে বাড়ির মহিলারা আগন্তুকের সামনে আসে না; কারণ তারা সংরক্ষিত। তাই অতিথিদের জন্য বাড়িতে আলাদা স্থান রাখা হয়। যেখানে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, আপ্যায়ন করা হয় এবং প্রয়োজনে খাবার দেওয়া হয়। তবে বাড়ির নারী সদস্যরা তার সামনে যায় না বা সেও তাদের কাছে যায় না। তেমনই পরিবারের জন্য ব্যক্তিগত জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে যাপনের স্থান থাকে, যেখানে পুরুষ অতিথির সামনে উন্মুক্ত হতে হয় না। সেসব বাড়ির একেবারে স্বাভাবিক বিষয় হলো, তাদের শোয়ার ঘর সম্মুখে নয়; বরং ভেতরে থাকে। কেননা, মানুষ সেখানে পোশাক রাখে এবং সেখানে প্রবেশের জন্য এমনকি বাড়ির শিশু ও চাকরদের অনুমতি নিতে হয়।

tauhiderdak.com

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা সাবালক হয়নি, তারা যেন (তোমাদের কক্ষে প্রবেশকালে) তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি চায় : ফজরের নামাজের পূর্বে, যখন তোমরা দুপুরে তোমাদের পোশাক খুলে রাখো তখন এবং ইশার নামাজের পর : তোমাদের একান্তে থাকার তিনটি সময়। এই তিন সময়ের পর (তারা তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করলে তাতে) তোমাদের ও তাদের কোনো পাপ হবে না। তোমাদের তো একে অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধানসমূহ স্পষ্ট করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'[১৫৮]

অন্যদিকে আধুনিক জাহিলি স্থাপত্যে শোয়ার ঘর রাস্তার পাশে উন্মুক্ত থাকে, এ যুক্তিতে যে, যাতে আলো-বাতাস বেশি পাওয়া যায়। তবে তাদের এই যুক্তির মাঝে খোলামেলা ও উলঙ্গপনার আগ্রহ স্পষ্ট। সেখানে এটাই স্বাভাবিক যে, কোনো সংরক্ষিত স্থান নেই; কেননা, এই জাহিলিয়াতে কোনো সম্মানিত জিনিসকে সংরক্ষণ করা হয় না।

আমরা বাড়ি দ্বারা যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছি, তা শুধু আমাদের উদ্দিষ্ট অর্থ স্পষ্ট করার জন্য। অন্যথায় বস্তুগত ও ব্যবস্থাপনা সভ্যতার মাঝে স্বতন্ত্র কোনো লক্ষ্য নয়; বরং এগুলো শুধু সেই সভ্যতার চিন্তা-বুঝ ব্যক্ত করার মাধ্যম। এখানে চিন্তা-বিশ্বাস হচ্ছে কোনো সভ্যতার আসল মানদণ্ড। যার পরে আসে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শৈল্পিক উদ্ভাবন; যদিও শিল্পকলার জন্য আলাদা মানদণ্ড ও মানুষের উন্নতির মাপকাঠিতে নির্দিষ্ট ওজন রয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এটাই কখনো সভ্যতার মানদণ্ড হতে পারে না। কেননা, এটা তো শুধু কার্যক্রমের দক্ষতা। যা কোনো জাতির জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং আল্লাহ তাআলা সব জাতির প্রচেষ্টা অনুযায়ী এই দক্ষতা দান করেন।

১৫৮. সুরা আন-নুর, আয়াত নং ৫৮।

tauhiderdak.com

كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

'আমি এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আপনার প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করে থাকি। আপনার প্রতিপালকের দান (কারও জন্য) নিষিদ্ধ নয়।'[১৫৯]

যদি আমরা চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে সভ্যতার জাগরণে স্বতন্ত্রতা বের করতে পারব, যেভাবে পূর্বে ইসলামি বিজ্ঞানের জাগরণে স্বতন্ত্রতা ছিল।

নিশ্চয় দুনিয়াকে উন্নত করা এমন বিষয়, যা সব জাতির মানুষই জমিনের প্রতিনিধি হিসেবে করে থাকে—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'(স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে (আমার) এক প্রতিনিধি (মানুষ) বানাব।"'[১৬০]

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

'তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদের বসতি দান করেছেন।'[১৬১]

তবে আল্লাহর দেখানো পদ্ধতিতে দুনিয়াকে আবাদ করা এমন বিষয়, যা সমস্ত জাহিলি সভ্যতার বিপরীতে শুধু ইমানদার জাতির মাঝেই পাওয়া যায়; যদিও দুনিয়াকে উন্নত করার প্রচেষ্টা, শিল্প ও উৎপাদনে দুই সভ্যতা একই।

যখন আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সভ্যতার দিকে তাকাব, তখন প্রথমেই মনে হবে এটা মানুষকে সম্পূর্ণ গড়নে মূল্যায়ন করে। তার শরীর ও আত্মাকে, দুনিয়া ও আখিরাতকে এবং আদর্শ ও চরিত্রকে সমান ভারসাম্যে রাখে।

মদিনায় মসজিদে নববি ছিল মূল স্থাপনা ও প্রধান ভিত্তি। এটা ছিল ইবাদতের স্থান। সেখানে সবাই একত্রিত হতো। এটা ছিল মাদরাসা, যেখানে বড়ো ও ছোটো সবাই

১৫৯. সুরা আল-ইসরা, আয়াত নং ২০।
১৬০. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ৩০।
১৬১. সুরা হুদ, আয়াত নং ৬১।

tauhiderdak.com

শিক্ষা নিত। মোটকথা, সেখানে আখিরাতের সাথে দুনিয়া গ্রহণ করত। মানুষ আল্লাহ ও আখিরাতের স্মরণে লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার উন্নতি থেকে বিমুখ হয়ে যেত না; বরং তারা দুনিয়ার কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েও তাদের অন্তর আখিরাতের সাথে জুড়ে থাকত; ফলে তাদের দুনিয়ার জীবনের সব কাজই সামগ্রিক অর্থে ইবাদতে পরিণত হতো। আর মসজিদ ছিল এমন স্থান, যেখান থেকে তারা পাথেয় গ্রহণ করত; যাতে অন্যান্য কাজ প্রশান্তচিত্তে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস্তবায়ন করতে পারে—

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

> '(আল্লাহর পথের সন্ধানপ্রাপ্ত তারাই) যারা ইমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়ে থাকে।'[১৬২]

তেমনই এটা ছিল পুরো এলাকার বাসিন্দাদের একত্রিত হওয়ার স্থান, যেখানে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বত সৃষ্টি হতো, যা ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বিপরীতে আধুনিক জাহিলিয়াতের নাইটক্লাব, নাচগান ও অশ্লীলতাগুলো রাখুন। তারা সেসব স্থানে বিনোদন নেয়। এটাই তাদের পাথেয়, যা গ্রহণ করে তারা পরের দিন সকালে চাঙা হয়ে কাজে যায়।

দুই সভ্যতার বিশাল পার্থক্য লক্ষ করুন!

ইসলামি সভ্যতা দুনিয়াবি উন্নতির জন্য মানুষের সব ধরনের কার্যক্রম চর্চা করে, যেমন ব্যবসা, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রতিটা ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদনের চেষ্টা করে। কিন্তু এটা তার সমস্ত কাজে হালাল-হারাম, চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের জন্য করণীয়গুলো মান্য করে চলে।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

> 'তিনি পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার পথে-প্রান্তরে চলো এবং আল্লাহর দেওয়া জীবিকা থেকে আহার করো। তাঁর কাছেই (প্রত্যাবর্তনের জন্য তোমাদের) পুনরুত্থান (হবে)।'[১৬৩]

---

১৬২. সুরা আর-রাদ, আয়াত নং ২৮।

১৬৩. সুরা আল-মুলক, আয়াত নং ১৫।

tauhiderdak.com

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

'আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দিয়ে পরকালের (সুখের) আবাস সন্ধান করো। দুনিয়ায় তোমার অংশ (বৈধ ভোগের পরিমাণ) ভুলে যেয়ো না।'[১৬৪]

মুসলিমরা প্রথম কয়েক প্রজন্মে সর্বদিকে খুব উদ্যমী ছিল। চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সকল ব্যবসা তখন তাদের হাতে ছিল। পাশাপাশি সামুদ্রিক পথ এবং এশিয়া, আফ্রিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত স্থলপথসমূহের নিয়ন্ত্রণ ছিল। মুসলিম-বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শহর সে সময় শিল্পখাতে অনেক উন্নত ছিল। সে সাথে তাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলো শরিয়তের ইলম থেকে নিয়ে চিকিৎসা, সৌরবিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন, গণিতসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব বিষয়ে শিক্ষক-ছাত্রে পূর্ণ ছিল। এসব হচ্ছে সভ্যতার নিদর্শন, যা দ্বারা আমরা মুসলিম উম্মাহকে পরিমাপ করতে পারি।

তবে এই নিদর্শনগুলো এমন, যা জমিনে প্রতিষ্ঠিত যেকোনো জাতির পক্ষেই বাস্তবায়ন সম্ভব। ফলে তখন পরস্পর তারতম্য হবে পরিমাণের ভিত্তিতে, মানবিক মূল্যবোধের আলোকে নয়। তবে এখানে মুসলিমসভ্যতার বিশেষত্ব হচ্ছে, তারা যদিও অন্যসব জাতির পক্ষে যা সম্ভব, তাই বাস্তবায়ন করেছে, তবে এ ক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তাআলা-প্রদত্ত কর্মপন্থার আলোকে করেছে।

যেমন মুসলিমরা এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যবসা কার্যক্রম করেছে; কিন্তু এ সময় তারা সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ অর্জনের জন্য অন্যান্য জাতির ওপর সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেনি, আধুনিক জাহিলিয়াত যা তুচ্ছ যুক্তি দেখিয়ে করেছে; বরং মুসলিম বণিকরা সর্বত্র ইসলামের গুণাবলি, পবিত্রতা এবং চরিত্র বহন করে নিয়ে গেছে। তারা সেসব অঞ্চলে ইসলামও প্রচার করেছে। এমনটাই ঘটেছে ইন্দোনেশিয়াসহ আফ্রিকার বহু দেশে।

মুসলিমরা শিল্পোন্নতি করেছে। এই খাতে তারা মানুষের উপকারী বিষয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। যা মানুষের জীবনকে বৈধ সীমার ভেতরে রেখে সহজ ও সুন্দর করেছে—

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৬৪. সুরা আল-কাসাস, আয়াত নং ৭৭।

tauhiderdak.com

'বলুন, "স্বীয় বান্দাদের জন্য সৃষ্ট আল্লাহর দেওয়া সাজসজ্জা এবং পবিত্র জীবিকা কে নিষিদ্ধ করেছে?" বলুন, "ইমানদারদের জন্য পার্থিব জীবনে এসব বৈধ, আর কিয়ামতের দিন তো কেবল তাদের জন্যই।"'[১৬৫]

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

'তিনি তোমাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে তোমাদের জন্য তাপগ্রহণের (শীতবস্ত্র তৈরির) উপকরণ ও আরও বহু উপকার আছে। এদের থেকে তোমরা খাদ্যও পেয়ে থাকো। এগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যও আছে, যখন বিকেলে এদের চারণভূমি থেকে নিয়ে আসো এবং যখন সকালে এদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও।'[১৬৬]

কিন্তু তারা কখনো মানুষকে অনর্থক কাজে লিপ্ত করেনি। শিল্পপতিদের হারাম আয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মানুষের সম্পদ নিঃশেষ করেনি, যা বর্তমান জাহিলিয়াতে পুঁজিবাদ করে। তেমনই তারা মানুষকে দুনিয়ার জীবনের প্রতি এতটা আকৃষ্ট করেনি; যার ফলে তারা আখিরাত ভুলে যাবে বা সেসব উন্নত আদর্শ ভুলে যাবে, যা জমিনে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। যেমন সঠিক আকিদার প্রচার করা, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা, বাস্তব দুনিয়ায় আল্লাহর ন্যায়নীতি প্রয়োগ করা এবং এসব কিছু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি সাধন করে, তবে বিজ্ঞানকে মানুষের বিশ্বাস ধ্বংস, চরিত্র নষ্ট বা দুনিয়ায় অকল্যাণ ছড়ানোয় ব্যবহার করে না। তারা বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিল্প-সাহিত্যে অবদান রাখে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন মেনে চলে। তাই তাদের চিন্তাধারা স্রষ্টার প্রতি অস্বীকার ও নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায় না। তাদের শিল্পকলা মানুষকে অপচয়ের দিকে ধাবিত করে না এবং তাদের চরিত্র ও চিন্তা-মানসিকতা নষ্ট করে না। যা মর্ডান জাহিলিয়াতে হচ্ছে।

এগুলোর পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ এমন কিছু বিশেষ সংস্থা ও ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যার কোনো দৃষ্টান্ত আমরা অন্যান্য জাতির মাঝে খুঁজে পাইনি। যেমন বাইতুল মাল,

১৬৫. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ৩২।

১৬৬. সুরা আন-নাহল, আয়াত নং ৫-৬।

tauhiderdak.com

নিজামুল হিসবাহ বা সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের সংস্থা, দাতব্যসংস্থা, যেখানে মানুষ কল্যাণকর কাজে সম্পদ ওয়াকফ করে। যেমন শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে এবং অক্ষম ও পুঙ্গ ব্যক্তিদের দেখাশুনা করার খাতে।

মোটকথা, ইসলামি সভ্যতা শুধু দুনিয়াকে উন্নত করে না; বরং এর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, এটা আল্লাহ-প্রদত্ত পন্থায় দুনিয়াকে আবাদ ও উন্নত করে।

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোয় মুসলিম উম্মাহর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করেছি। পাশাপাশি সোনালি প্রজন্ম এ বৈশিষ্ট্যগুলো যে সর্বোচ্চ স্তরে বাস্তবায়ন করেছে, তাও আলোচনা করেছি। প্রতিটা বৈশিষ্ট্যে এটাও নিশ্চিত করেছি যে, মৌলিকভাবে এগুলো এমন নয়, যা শুধু সেই প্রজন্মের জন্য নির্দিষ্ট; বরং সবই এই উম্মাহর স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা স্থায়ী হওয়াই উচিত। তাই সেই প্রজন্মের জীবনে এগুলো থাকাই তাদের স্বতন্ত্রতা ছিল না; বরং তারা যে সর্বোচ্চ স্তরে এ বৈশিষ্ট্যগুলো বাস্তবায়ন করেছেন, তা-ই ছিল তাদের স্বতন্ত্রতা। তারা ইসলামের আদর্শ ও বাস্তবতা একই সাথে বাস্তবায়ন করেছেন।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোনো এক কারণে (বাস্তবে বহু কারণে) উম্মাহ সেই উঁচু স্তরে টিকে থাকতে পারেনি, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনে চর্চিত হয়েছে; বরং তারা সর্বক্ষেত্রে সেই মর্যাদার স্তর থেকে অধঃপতিত হয়।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, ইসলাম একেবারে শেষ হয়ে গেছে। যা অনেক সরল ব্যক্তির কাছে মনে হয়, যাদের কাছে ইসলামের শক্তি ও মর্যাদার অবস্থানের পর এই পতন অনেক ভয়াবহ মনে হচ্ছে। তেমনই এই দ্বীনের শত্রুরা মানুষকে নতুন করে ইসলামের বিশ্ব শাসনের অবস্থানে ফিরে আসার ব্যাপারে হতাশ করার জন্য এমন কথা বোঝায়। তারা বলে, সেই ইসলাম কোথায়, যা নতুন করে ফিরে আসার অপেক্ষা করছ? এটা তো প্রথম এক বা দুই প্রজন্ম পরেই হারিয়ে গেছে, যা আর ফিরে আসবে না!

এই উম্মাহ তার উত্তম আদর্শের স্তর থেকে পতিত হওয়ার পরেও তাদের তেমন সমস্যা হতো না, যদি ইসলামের স্বাভাবিক সীমায় বিদ্যমান থাকত। কারণ, সেই উত্তম আদর্শ সকল প্রজন্মের ওপর আবশ্যকীয় নয়। আল্লাহ তাআলা তা কারও ওপর ফরজ করে দেননি; বরং সেই মহান ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় মেহনতের মাধ্যমে এত ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন, যাঁদেরকে রাসুলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং গড়ে তুলেছেন।

tauhiderdak.com

যদি উম্মাহ আল্লাহর ফরজকৃত সর্বনিম্ন স্তরে অবশিষ্ট থাকত, তাহলে দুনিয়ায় কল্যাণ বিরাজমান থাকত এবং ইতিহাস আমরা এখন যেমন দেখছি, এর ভিন্ন পথে চলত। এটা শুধু মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রে নয়; বরং সমগ্র মানবতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছায় এই উম্মাহর জন্মের পর থেকেই পুরো মানবজাতির ভাগ্য তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। ফলে যদি তারা কাঙ্ক্ষিতভাবে তাদের দায়িত্ব আদায় করে, তাহলে তাদের ও পুরো মানবজাতির কল্যাণ অর্জিত হবে। আর যদি তারা দায়িত্ব আদায়ে অবহেলা করে, তবে জাহিলিয়াত এসে পুরো দুনিয়ার ওপর চেপে বসবে।

কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, এই উম্মাহ শুধু তাদের অনুকরণীয় স্তর থেকেই পতিত হয়নি, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল। বরং তারা অনেক ক্ষেত্রে তাদের ফরজকৃত স্তর থেকেও পতিত হয়েছে। যার ফলে তাদের এবং তাদের পরে পুরো মানবসভ্যতার ওপর বহু অকল্যাণ চেপে বসেছে।

সামনের অধ্যায়ে আমরা এই উম্মাহর দীর্ঘ ইতিহাসে বিচ্যুতির ধারা বর্ণনা করব।

tauhiderdak.com

অধঃপতনের গতিপথ

উঁচু শিকড় থেকে উম্মাহ আজ অতল গহিনে পতিত হয়েছে। বিশাল এক দূরত্ব তাদের চিন্তাকে হতবুদ্ধি করে ফেলেছে। যে জাতি একসময় এত উঁচু স্তরে উঠেছিল, যেখানে পূর্বে-পরে ইতিহাসের কোনো জাতিই পৌঁছাতে পারেনি, তারা কীভাবে বর্তমানের মতো পরাজয়, ভ্রষ্টতা ও অধঃপতনের এত অতল গর্তে পতিত হতে পারে? যাদের থেকে অপদস্থ বর্তমান ইতিহাসের আর কেউ নেই!!

এটা কি এই জাতির জন্য স্বাভাবিক কোনো বিষয়?

ইতিহাসে এমন বহু জাতি ছিল, যারা দুনিয়ায় প্রবল প্রতাপের সাথে অনেক শতাব্দী শাসন এবং বিশ্বের বিশাল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করেছে। তারা দুনিয়ার শক্তির এত মাধ্যম অর্জন করেছিল, যা গণনার ঊর্ধ্বে। অতঃপর একসময় সেগুলো এমনভাবে বিলীন হয়ে গেছে, যেন কখনো তা ছিল না। যেমনটা ঘটেছে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে, যারা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সাম্রাজ্য। তেমনই ছিল পারস্য সাম্রাজ্য, যারা বিশ্বনেতৃত্বে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। এ ছাড়াও সব জাতির ক্ষেত্রেই শক্তি ও কর্তৃত্ব বা ধ্বংস ও বিলুপ্তি আল্লাহর অপরিবর্তনীয় নীতির ভিত্তিতে ঘটেছে। আল্লাহর ইচ্ছার আলোকে, যা মানুষের জীবনে এসব নীতি বাস্তবায়ন করে—

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) ভূমিকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ হুকুম দেন। কেউ তাঁর হুকুম পেছনে রাখতে পারে না। আর তিনি খুব দ্রুত হিসাব নিয়ে থাকেন।'[১৬৭]

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

১৬৭. সুরা আর-রাদ, আয়াত নং ৪১।

tauhiderdak.com

'তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের (ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত শাস্তির) বিধানেরই প্রতীক্ষা করছে? কিন্তু আপনি আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর বিধানে কোনো ব্যতিক্রমও পাবেন না।'[১৬৮]

কিন্তু আকিদাভিত্তিক জাতি—তাদের ওপর কি সেসব নীতি প্রযোজ্য, যা জাহিলিয়াতের ওপর বাস্তবায়িত হয়?

ইবনে খালদুন ইতিহাস গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, এমন কিছু সুনান বা নীতি রয়েছে, যার ভিত্তিতে কোনো রাষ্ট্রের ভাগ্যের চাকা ঘোরে। তা হলো 'বার্ধক্যের নীতি'। তার মতে, একটি রাষ্ট্র দুর্বল অবস্থায় জন্ম নেয়, অতঃপর বড়ো ও শক্তিশালী হয় এবং এর ভিত মজবুত হয়। সর্বশেষ তা বার্ধক্যে পতিত হয়, যেমন কোনো মানুষ বৃদ্ধ হয়। তখন তার অঞ্চল সংকুচিত হয় এবং শক্তি হ্রাস পায়; ফলে বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হয়। আধুনিক যুগের ইংরেজ ঐতিহাসিক টয়েনবি ইবনে খালদুন থেকে নকল করে একই চিন্তা পুনরাবৃত্তি করেছে।

ইবনে খালদুনের মত এবং পরবর্তী সময়ে টয়েনবি যা পুনরাবৃত্তি করেছে, তা জাহিলিয়াতের ক্ষেত্রে হয়তো সঠিক হতে পারে। কারণ, জাহিলিয়াতগুলো স্বয়ং কোনো 'জাতি'র ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই যখন আল্লাহর নীতি অনুযায়ী প্রতিটি জাতি মানুষের মতোই বৃদ্ধ হয়, তখন হতে পারে সেই জাতি যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে, তা নির্দিষ্ট একটা সময় পরে বার্ধক্যে পতিত হবে।[১৬৯] চাই যৌবনে তার শক্তি যত বেশি হোক; যার ফলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতো, তারা কখনোই ধ্বংস হবে না।

কিন্তু আকিদাভিত্তিক উম্মাহ কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী নয়; বরং আকিদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে উম্মাহ। আর আকিদা এমন বিষয়, যা চিরস্থায়ী। এটাই তাদের এবং জাহিলিয়াতের মাঝে গড়ে ওঠা জাতির মাঝে মূল পার্থক্য। আর এ পার্থক্যের ফলেই এ জাতি এমন নীতির অধীনে পরিচালিত, যা জাহিলি জাতির জন্য প্রযোজ্য নীতি থেকে ভিন্ন এবং তাদের পরিণতি ওদের থেকে ভিন্ন।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, আকিদাভিত্তিক উম্মাহর (অর্থাৎ মুসলিম জাতি) ওপর প্রযোজ্য নীতি ইবনে খালদুনের এ ধারণার বিপরীত যে, প্রতিটা জাতি একসময়

.....

১৬৮. সুরা ফাতির, আয়াত নং ৪৩।

১৬৯. তবে আমার মতে এটা সুন্নাহ নয়; যদিও ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা এই ধারণার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায়। তবে সেসব ক্ষেত্রে আমার মতে, সেই শক্তিশালী জাতিগুলোর ভোগবিলাস হচ্ছে মূল রোগ; যার ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে।

tauhiderdak.com

বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা, তাদের ইতিহাস যদিও ধারাবাহিক নিচের দিকে যাচ্ছে, তবে এখানে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। অনেক ঊর্ধ্ব জাগরণ এই উম্মাহ প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন ক্রুসেডারদের ত্রাস সালাহুদ্দিনের সময়ে, তাতারদের পরাজিতকারী সাইফুদ্দিন কুতুজের সময়ে এবং ফাতিহ মুহাম্মাদের যুগ থেকে ইউরোপের অভ্যন্তরে বিজয়ের দীর্ঘ যাত্রায় তা দেখা গেছে।

অন্যদিকে এই উম্মাহর ওপর দুর্বলতা, ভাঙন, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত এত দুর্যোগ আসার পরেও তার জন্মের চোদ্দোশ বছর পরেও অস্তিত্ব থেকে বিলীন হয়ে যায়নি। এটা তো এতই দীর্ঘ সময় যে, ইতিহাসের অন্য কোনো জাতি এত লম্বা সময় অস্তিত্বে থাকেনি। শুধু এতটুকুই নয়; বরং তারা বর্তমানে এক নবজন্ম প্রত্যক্ষ করছে, যেখানে এই উম্মাহ বাচ্চা-জন্মের প্রচণ্ড কষ্টসহ চাপ সহ্য করছে।

তারা এত সমস্যাগ্রস্ত হওয়ার পরেও আজও পর্যন্ত টিকে থাকাই প্রমাণ করে যে, তারা সে নীতির অধীন নয়, যা ইবনে খালদুন ধারণা করেছে যে, বার্ধক্যের কারণে সব জাতিই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বাস্তবতার সাথে যদি আরেকটি সত্য বিষয় যুক্ত করি যে, আজ পুরো বিশ্বের সর্বত্র ইসলামি জাগরণ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তৃতীয় সত্য হলো, বর্তমানে ইসলাম বিশ্বের এমন সব অঞ্চলে প্রবেশ করছে, যেখানে পূর্বে কখনো পৌঁছেনি। যেমন জাপান, কোরিয়া, ফিনল্যান্ড ইত্যাদি। এ ছাড়া পশ্চিমে মানুষ এখন দলে দলে এই দ্বীনে প্রবেশ করছে। এসবের ভিত্তিতে বার্ধক্যের কারণে ধ্বংসের নীতি এমন জাতির ওপর প্রয়োগের কোনো ক্ষেত্রই বাকি থাকে না, যারা আকিদার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেবল নির্দিষ্ট কোনো জাতির ভিত্তিতে নয়।

হ্যাঁ, এটা অন্যান্য শক্তি ও ক্ষমতাধারী জাতি, রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের মতো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে কেন পতন ঘটল? কীভাবে ঘটল? কেন তারা সুউচ্চ অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি? এমনকি সর্বনিম্ন স্তরেও অবশিষ্ট থাকেনি, যা থেকে নিচে নামা উচিত ছিল না এবং ধরে রাখতে পারলে তারা আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে শাসন করে যেতে পারত।

তেমনই মনে এ প্রশ্নও জাগে, তাহলে ইসলাম কোথায়? এই উম্মাহর জীবনে এর ভূমিকা কী? কেন ইসলাম এই উম্মাহকে পতন থেকে রক্ষা করতে পারেনি? জাহিলিয়াতে আক্রান্ত জাতির সাথে আকিদাভিত্তিক জাতির পার্থক্য কী রইল, যদি এটা অধঃপতন হতে হতে একসময় জাহিলি জাতির মতো হয়ে যায়; বরং কিছু ক্ষেত্রে জাহিলি জাতি থেকেও খারাপ অবস্থায় চলে যায়?

তাহলে দ্বীনের মূল্য কী? বাস্তব জীবনে এর ভূমিকা কী?

এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য একটা আছে। এই দ্বীন কোনো মেশিন নয়, যা নিজে থেকেই কাজ চালিয়ে যেতে পারবে; বরং তার জন্য মানুষের অন্তর প্রয়োজন, যারা এটা বহন করবে।

আল্লাহ তাআলা যদি চাইতেন, তাহলে মানুষকে হিদায়াত গ্রহণে বাধ্য করতে পারতেন। তাহলে কারও পক্ষে বিরোধিতা, অধঃপতন বা বিচ্যুত হওয়া সম্ভব হতো না। যে নীতি আসমান-জমিনের সবকিছুর ওপর প্রযোজ্য। এগুলো তাদের নির্ধারিত অক্ষে চলে, যা থেকে এক চুল পরিমাণ সরতে পারবে না, যতদিন না আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত দিনে পুরো জগতের অবস্থা পরিবর্তন করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে 'বস্তু' বানাননি, যাকে ইচ্ছাবিহীন শুধু বাধ্য করা হবে; বরং তাদের স্বেচ্ছায় কর্মঠ ও দুই পথের একটি বাছাইয়ের ক্ষমতা দিয়েছেন, হয়তো হিদায়াতের পথ, নয়তো ভ্রষ্টতার পথ। যার বিপরীতে তাকে তার কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। তাই দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য যা ঘটে, সব তার কাজের ফসল। এগুলো ঘটে এমন নীতির ভিত্তিতে, যা আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করে দিয়েছেন; যাতে এর আলোকে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয় এবং নিজের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ তো কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[১৭০]

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

'এর কারণ এই যে, আল্লাহ কোনো জাতিকে কোনো নিয়ামত দান করলে তা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[১৭১]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

১৭০. সুরা আর-রাদ, আয়াত নং ১১।

১৭১. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৫৩।

tauhiderdak.com

'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে; তিনি চান তাদেরকে তাদের কতিপয় কর্ম (কর্মের শাস্তি) আস্বাদন করাতে; যাতে তারা ফিরে আসে।'[১৭২]

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আর যদি গ্রামবাসীরা ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।'[১৭৩]

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

'তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের সামনে প্রতিটি (আনন্দের) জিনিসের দরজা খুলে দিলাম। এভাবে তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা নিয়ে আনন্দিত, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করি। তখনই তারা নিরাশ হয়ে যায়।'[১৭৪]

মানুষের জীবনের সব জিনিসের মতো এই দ্বীনও তাকে বহনকারী অন্তরের অগ্রসর বা প্রত্যাখ্যানের পরিমাণের ভিত্তিতে কার্যকর হয়। দ্বীনের বিধান যতটুকু মান্য বা ত্যাগ করবে, সে অনুযায়ী ফল পাবে। কিন্তু সর্বাবস্থায় এই দ্বীন এবং অন্যান্য জীবনবিধানের মাঝে কিছু মৌলিক পার্থক্য থেকে যাবে।

প্রথমত, এই দ্বীন হচ্ছে একমাত্র সঠিক পথ এবং এখানে যে প্রতিফল পাওয়া যাবে, তা অন্যসব কর্মপন্থার ফল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অনেক উন্নত। তাই এটাই হচ্ছে এমন কর্মপন্থা, যা করা আবশ্যক এবং অন্য সকল মত-পথ ত্যাগ করা আবশ্যক। কারণ, সেগুলোর পরিণতি মন্দ এবং দুনিয়া-আখিরাতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, যেসব অন্তর এ দ্বীন গ্রহণ করবে—চাই তা ব্যক্তি হোক বা সমাজ—কখনো যদি এসব অন্তর ভ্রষ্টতার কোনো মাধ্যমে আক্রান্ত হয়, তাহলে

১৭২. সুরা আর-রুম, আয়াত নং ৪১।
১৭৩. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ৯৬।
১৭৪. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ৪৪।

tauhiderdak.com

এগুলো সেসব অন্তর থেকে ধীরে নষ্ট হবে, যেগুলো একেবারে কোনো আকিদা গ্রহণ করেনি। কেননা, আকিদা গ্রহণের ফলে তাদের অন্তর থাকে গঠনে শক্তিশালী ও অধিক সংযুক্ত।

তৃতীয় পার্থক্য হলো, যদি কখনো অন্তর খারাপ হয়ে যায়, তবে সর্বদা এই দ্বীনই হবে সবচেয়ে সফল চিকিৎসা। কারণ, এটাই সঠিক চিকিৎসা। তবে সর্বাবস্থায় সব দায় মানুষের অন্তরের ওপরেই চাপবে, এটা কি গ্রহণ, না ত্যাগ করবে! তাকে প্রদত্ত দায়িত্বের ভিত্তিতে আমল করবে, নাকি দায়িত্বে অবহেলা করবে!

যখন কিয়ামতের দিন এই উম্মাহকে দ্বীনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, কীভাবে তার থেকে দ্বীন হারিয়ে গেছে; অথচ তাদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন এই দ্বীনের সাক্ষী হওয়ার জন্য বাছাই করেছেন; যাতে সমস্ত মানুষের ওপর সাক্ষী হতে পারে? কীভাবে তারা সেসব দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ফরজ করেছেন; যাতে তারা বাস্তব দুনিয়ায় আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে পারে—

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

'আর এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী (সেরা) জাতি বানিয়েছি; যাতে তোমরা মানুষের ব্যাপারে সাক্ষী হও, আর রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের ব্যাপারে।'[১৭৫]

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

'আর এ কুরআন তো আপনার জন্য ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপদেশ এবং তোমাদেরকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করা হবে।'[১৭৬]

১৭৫. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১৪৩।

১৭৬. সুরা আজ-জুখরুফ, আয়াত নং ৪৪।

tauhiderdak.com

যেখান থেকে সূচনা

উম্মাইয়া শাসনামল

এই উম্মাহর জীবনে বিচ্যুতি খুব দ্রুতই শুরু হয়, উমাইয়া যুগ থেকেই।

এখানে উম্মাহর ইতিহাস বর্ণনার কোনো ক্ষেত্র নয়, তেমনই অধঃপতনের গতিপথের ইতিহাস বর্ণনারও ক্ষেত্র নয়। আমরা এখানে শুধু বিস্তৃত রেখাগুলো অঙ্কন করব, যা দ্বারা পথের মাইলস্টোন স্পষ্ট হয়। পূর্বে যেভাবে আমরা সোনালি প্রজন্মের সংক্ষিপ্ত আলাপ করেছি, যেখানে শুধু মৌলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয়েছি। যতটুকু হলে আমাদের সামনে দ্বীন বাস্তবায়নের সামগ্রিক সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে, শুধু ততটুকুই। তেমনই এখানে অধঃপতনের গতিপথের ততটুকু আলোচনাই করব, যা দ্বারা আমাদের সামনে বর্তমান দুঃখজনক অবস্থার মূল কারণগুলো স্পষ্ট হয়। এর কারণ হলো, আমাদের মূল উদ্দেশ্য ইসলামি ইতিহাসের বিস্তৃত গবেষণা করা নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আমাদের বর্তমান বাস্তবতার বিচ্যুতি ও কারণের রূপরেখা স্পষ্ট করা; যাতে এর আলোকে মুক্তির পথ বের করতে পারি।[১৭৭]

পূর্বে যেমন বলেছি, উমাইয়া শাসনের যুগ থেকেই বিচ্যুতি শুরু হয়েছে। তবে সেগুলো কোনো মৌলিক বিচ্যুতি ছিল না; বরং শুধু উঁচু স্তর থেকে পতন ছিল। যদিও পূর্বে যারা সর্বোত্তম পরিবেশে বাস করেছে এবং এর স্বাদ আস্বাদন করেছে, তারা এই অধঃপতনের ফলে অনেক সংকট ও সংকীর্ণতা অনুভব করেছিল।

.....

১৭৭. অধঃপতনের আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে নেওয়া জরুরি মনে করছি। এই কিতাবে কেবল মুসলিমদের শাসনামলের অনাকাঙ্ক্ষিত ও সমস্যাজনক বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছে। যেগুলো ধীরে ধীরে মুসলিম উম্মাহকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে গেছে। কিন্তু মুসলিম শাসন ও শাসকদের অবদান, সৌন্দর্য, সফলতা ও কল্যাণকর দিক এই বইয়ের বিষয়বস্তু নয়। অথচ এর সংখ্যাই বেশি। ফলে বইটাকে আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। মুসলিম ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়ন ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হিসেবে দেখা যাবে না। তার জন্য আপনাকে ইসলামি ইতিহাস নিয়ে লিখিত মুসলিম গবেষকদের বই পড়তে হবে। যেমন ইসমাইল রেহান, আলি সাল্লাবি প্রমুখদের ইতিহাসসম্পর্কিত বই। পাশাপাশি আত্মসমালোচনার আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলিমদের ইতিহাস নিয়ে প্রাচ্যবিদদের মতো নেতিবাচক হওয়া যাবে না।

tauhiderdak.com

নিঃসন্দেহে খিলাফতে রাশিদার পথ থেকে উমাইয়া খিলাফতের বেশ কিছু দূরত্ব ছিল। উমাইয়া খিলাফতের সময় সামগ্রিক জীবন ও রাজনৈতিক কর্মপন্থা এমন নতুন দিকে ধাবিত হয়, যা মানুষ নববি যুগ ও খিলাফতে রাশিদার যুগে প্রত্যক্ষ করেনি। তা সত্ত্বেও এই শাসনামল দ্বীনের সীমার ভেতরে ছিল; যদিও কিছু কিছু বিষয়ে ব্যতিক্রম হয়েছে।

মানুষ প্রথম যে পরিবর্তনে বিস্ময়াভূত হয়ে যায়, তা ছিল খিলাফত থেকে রাজতন্ত্রে স্থানান্তর হওয়া। তবে এটা সত্য, শরিয়তের এমন কোনো দলিল নেই, যা শাসনের জন্য খিলাফত বা রাজত্ব[১৭৮] নির্দিষ্ট করে দেয়; বরং শাসক খলিফা হোক বা সুলতান বা

.....

১৭৮. এই পয়েন্টে এসে অনেকে বিচ্যুত হয়ে বলে, ইসলামে কোনো শাসনব্যবস্থা নেই। এটা বলে মূলত তারা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহর বিধানে অবহেলাকে বৈধতা দিতে চেষ্টা করে; যদিও তারা ভালো করেই জানে, এটা সেই ব্যবস্থা নয়, যে জন্য তারা চেষ্টা করছে। অতঃপর একদিকে চিন্তাযুদ্ধ ও অন্যদিকে শরিয়াহ-শাসন থেকে দূরত্বের কারণে অনেক মানুষ আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে এই মিথ্যাচার বিশ্বাস করে বসে। তারা একে শুধু বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক ইবাদতের সমষ্টি মনে করে। অথবা শুধু অন্তর নরমকারী বয়ানের মাঝে সীমাবদ্ধ মনে করে। যার সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবন বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠার কোনো সম্পর্ক নেই। হুবহু যেমন ছিল ইউরোপের বিকৃত গির্জার ধর্ম।

এখানে আমাদের একটা বিষয় ভালো করে বোঝা দরকার। তা হলো, মানবরচিত ব্যবস্থায় শাসনের ধরন অনেক গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, তাদের নিকট এটাই ক্ষমতার উৎস, যা এক ধরন থেকে অন্য ধরনে পরিবর্তন হয়। যার ফলে আইনের পন্থা ও দিক ভিন্ন হয়। যার ভিত্তিতে স্বৈরাচার থেকে নিয়ন্ত্রিত শাসন ভিন্ন হয় এবং গণতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্র ভিন্ন হয়। অন্যদিকে ইসলামে ক্ষমতার উৎস একটি, যা শাসনের পদ্ধতি যতই পরিবর্তন হোক কখনোই পালটায় না। তা হলো, ইসলামে শাসন-কর্তৃত্ব মানুষের হাতে নয়; বরং তা আল্লাহর জন্য। যেখানে শরিয়তের নস নেই, সেখানে ফুকাহারা ইজতিহাদ করে ঠিক; কিন্তু সর্বশেষ তা শরিয়তের উদ্দেশ্য ও সামগ্রিক নস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। যার ফলে সব আইন আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তোমরা আল্লাহ ও পরকালে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসুলের ওপর ন্যস্ত করো।' (সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ৫৯)

এটা সত্য যে, মুসলিম উম্মাহ সঠিক অবস্থায় শুরা পরিষদের সিদ্ধান্ত ও বাইআতের মাধ্যমে শাসক নির্বাচন করে। তবে শুধু স্বাধীনভাবে নির্বাচন করাই শাসককে বৈধতা দেয় না; বরং তাকে বৈধতা দেয় একমাত্র আল্লাহর বিধানে শাসন করা। এখন যদি উম্মাহ স্বাধীনভাবে তাকে নির্বাচন করে; কিন্তু সে ইসলামি আইনে শাসন না করে, তাহলে মুসলিম উম্মাহর শাসক হবে না।

সুতরাং পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেখানে ক্ষমতার উৎস নির্ধারণে মূল গুরুত্ব দেয়, সেখানে ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধুই আল্লাহর আইনের ওপর নিবদ্ধ থাকে। কেননা, এটাই সরকারকে বৈধতা দেয়। তাই যেই প্রশাসন আল্লাহর আইনে শাসন করবে, তাই শরয়ি শাসন। সেই প্রশাসনের 'ধরন' যেমনই হোক; যদিও ঐতিহাসিক

tauhiderdak.com

রাজা, সবার ওপর আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন আবশ্যক এবং এর ফলে সে এমন বৈধ শাসক হয়ে যাবে, যাকে শ্রবণ ও আনুগত্য করতে মানুষ বাধ্য থাকবে। এটা আল্লাহর আয়াত এবং রাসুলের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম খলিফা ﷺ বলেছেন, 'আমি যে বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য করি, তাতে তোমরা আমার আনুগত্য করো। আর যদি আমি আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্যতা করি, তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করবে না।'

সোনালি যুগের মুসলিমরা যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, নিঃসন্দেহে তা ছিল সবচেয়ে সঠিক ও ন্যায়সংগত। কারণ, সেখানে মুসলিমরা কোনো নির্দিষ্ট বংশে আবদ্ধ ছিল না; বরং যে সবচেয়ে যোগ্য ছিল, তাকেই বাছাই করা হতো।

তবে যেভাবেই হোক মানুষ এ পরিবর্তন মেনে নেয়; যদিও প্রথমে তারা আশ্চর্য হয়েছিল। কারণ, প্রথম ব্যবস্থা যদিও অধিক সঠিক ও ন্যায়সংগত ছিল, তবে তাতে শেষের দিকে অনেক বিভক্তি ও বিরোধের হৃদয়বিদারক ঘটনা তৈরি হয়েছিল। বিপরীতে নতুন ব্যবস্থায় স্থিরতা অনেক বেশি ছিল, যা দ্বারা মানুষের মাসলাহাত ও স্বার্থ বেশি অর্জিত হয়েছে।

তবে এই বিষয়ে বেশি আলোচনার সুযোগ নেই। কেননা, উমাইয়াগণ যা করেছে, সেটা ইসলামের স্পষ্ট নস বা বিধানের বিপরীত নয়।[১৭৯] তবে সে সময় এমন কিছু ঐতিহাসিক বাঁক নিয়েছে, যার পেছনে তখনকার সময়ে ইসলামি সমাজজীবনে অনেক কারণ ছিল। যেমন স্বল্প কিছু বছরে ইসলাম বিশ্বের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করা সে জনগোষ্ঠীকে ইসলামি দীক্ষা দেওয়ার

অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, খিলাফতে রাশিদাই হচ্ছে সর্বোত্তম; কারণ, সেখানে আল্লাহর শরিয়াহ পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৭৯. উম্মতের ইজমামতে সাহাবায়ে কিরামের আমল আমাদের জন্য দলিল। এ জন্য সাহাবায়ে কিরাম যেই পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচন করেছেন, সেটাই ইসলামের পদ্ধতি বলে বিবেচিত হবে। যুগে যুগে ফুকাহায়ে কিরাম সাহাবায়ে কিরামের পদ্ধতিকেই ইসলামি ইমারাতের খলিফা বা ইমাম নির্বাচনের পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন। এ জন্য ইসলামে খলিফা নির্বাচন নিয়ে কোনো নির্দেশনা নেই—এই ধরনের ধারণা সঠিক নয়। ফলে বলা যায়, বংশীয়ভাবে ক্ষমতায় আরোহণ কোনো প্রকার শুরা ও যোগ্যতা ছাড়া, এটি শরিয়াহসম্মত পন্থা নয়। তবে কেউ যদি সাহাবায়ে কিরামের পদ্ধতির বাইরে গিয়ে জোরপূর্বকভাবে হোক কিংবা বংশীয়ভাবে শাসকের মসনদে চলে আসে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি তথা ইসলামি শরিয়াহকে স্বীকৃত রাখে, তাহলে মুসলিমদের জন্য তার আনুগত্য আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ, আনুগত্যের ভিত্তি হলো আল্লাহর শরিয়ত। যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবে, মুসলিমরা তার আনুগত্য করতে বাধ্য। আর যে আল্লাহর শরিয়তকে প্রত্যাখ্যান করে, মুসলিমরা তার আনুগত্য করতে বাধ্য নয়।

tauhiderdak.com

সেই সুযোগ ছিল না, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে গড়ে ওঠা প্রথম প্রজন্ম পেয়েছিল। তাই তাদের জীবনের কোনো ক্ষেত্রই প্রথম যুগের মতো উন্নতভাবে পরিচালিত হয়নি, বিশেষত রাজনীতি। কেননা, ভালোভাবে রাজনীতি পরিচালনা করা শুধু শাসকের বিষয় নয়; বরং এটা পুরো সমাজের কাজ। যারা শাসকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে এবং আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে গেলে তা না মেনে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবে।

যার জন্য প্রয়োজন ছিল জনগণকে সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর মতো উঁচু স্তরের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা এবং তাদের অন্তরে ইসলামি রাজনীতির নীতিমালা এমনভাবে বসিয়ে দেওয়া; যাতে ভিন্ন কিছু হলেই মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে। যদি খিলাফতে রাশিদার যুগ দীর্ঘ হতো, তাহলে সেটা সেসব মূলনীতি ও ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা উম্মাহ খুব দ্রুত উসমান ﷺ-এর হত্যার ফিতনা দ্বারা আক্রান্ত হয়। যার পেছনে ভেতর থেকে ইহুদিরা ও বাইরের শত্রুদের চক্রান্ত ছিল। যার ফলে বিভক্তি দেখা দেয় এবং আলি ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ-এর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনেক সাহাবি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকে এই ভয়ে, যাতে বিভক্তির রেখা বিস্তৃত না হয়। অতঃপর তারা আলি ﷺ-এর শাহাদাতের পর উমাইয়াদের কৃত পরিবর্তন মেনে নেয়। এই আশায় যে, মুসলিমদের জীবনে হয়তো ফিতনা নির্মূল হবে, যতক্ষণ না তা দ্বারা ইসলামের স্পষ্ট কোনো নসের বিরোধিতা হচ্ছে না।

যাহোক, দুটো বিষয়ের কারণে বিপর্যয় চেপে বসে। যেগুলো এই উম্মাহর আয়ুতে খুব গভীর প্রভাব ফেলেছে; যদিও প্রথমদিকে তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল—

> প্রথম বিষয়, খিলাফতের পরিবর্তে বংশীয় শাসন শুরু হওয়া।
>
> দ্বিতীয়, পুরো উম্মাহ ধীরে ধীরে শাসকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা ত্যাগ করে দেয় এবং তাদের নিজস্ব কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়।

প্রথম বিষয়টার মধ্যে ইসলামের কোনো দলিলের সরাসরি বিরোধিতা নেই। আর এটা দ্বারা ইসলামি রাজনৈতিক ক্ষেত্র ও জনজীবনে কোনো ক্ষতি হতো না, যদি উম্মাহ শাসকের কাজ পর্যবেক্ষণে রাখত এবং আল্লাহ ও রাসুল ﷺ-এর আদেশ অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্ব বাস্তবায়ন করত। কেননা, আমরা বলেছি, আল্লাহর শরিয়াহ বাস্তবায়ন হচ্ছে মূল ধর্তব্য, শাসনের ধরনে নয়।

tauhiderdak.com

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ

'ইমানদার পুরুষেরা ও ইমানদার নারীরা একে অপরের সুহৃদ। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়িম করে এবং জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে।'[১৮০]

হাদিসে এসেছে,

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ

'অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করতে থাকো। জালিমের হাত মজবুত করে ধরো এবং তাকে টেনে তুলে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। নতুবা আল্লাহ তাআলা তোমাদের (নেককার ও গুনাহগার) পরস্পরের অন্তরকে একত্রিত করে দেবেন (জালিমদের অন্তরের ন্যায় করে দেবেন)।'[১৮১]

কিন্তু মূল সমস্যা বাধে, যখন উমাইয়া যুগে মুসলিমদের জীবনে দুটো বিষয় একত্রিত হয়। একদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষ্যমতে ক্ষমতাকে কামড়ে ধরা শাসক[১৮২] এবং অন্যদিকে উম্মাহ শাসকের পর্যবেক্ষণ ত্যাগ করা।

উম্মাহ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কল্যাণের আদেশ ও মন্দের নিষেধ থেকে অবহেলার একটা কারণ হতে পারে, ফিতনার সময় সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর অবস্থানের ভুল অনুকরণ। যে অবস্থা তাঁদের স্বাভাবিক ছিল। তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ে এই অবস্থান গ্রহণ করা সঠিক নয়। কেননা, সাহাবিদের এই অবস্থানের কারণ ছিল বিভক্তি ছড়িয়ে পড়ার ভয়, অর্থাৎ অনিষ্টতা হওয়ার ভয়। কিন্তু পরিবেশ স্থিতিশীল হওয়ার পর উম্মাহ শাসকদের কাজ পর্যবেক্ষণ না করা, নসিহত থেকে চুপ থাকা এবং হকের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা না করাই ছিল মূলত অনিষ্টতা।

.....

১৮০. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ৭১।

১৮১. শুআবুল ইমাম, হাদিস নং ৭১৩৯।

১৮২. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমার পরে ৩০ বছর খিলাফত থাকবে, অতঃপর শাসন কামড়ে ধরা শাসক আসবে।' (তাবারানি)

tauhiderdak.com

তবে এই পতনের সবচেয়ে বড়ো কারণের দায়ভার স্বয়ং উমাইয়াদের ওপরেই বর্তায়। তা ছিল, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথে উমাইয়াদের কঠোর আচরণ। যার ফলে মানুষ তাদের কোনো কাজের প্রতিবাদ করতে ভয় পেত। এভাবেই খিলাফতে রাশিদার যুগে প্রচলিত রাজনৈতিক নীতির প্রয়োগ হারিয়ে যায় এবং পরবর্তী অবস্থাটি শাসন ও জনগণের মধ্যে আবশ্যকীয় রীতি হয়ে যায়।

এই কঠোরতার পক্ষে উমাইয়াদের যত যুক্তিই থাকুক, এটাই ছিল অধঃপতনের পথের ভয়াবহ সূচনা , যা সময়ের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদিনের সঠিক পথ থেকে উম্মাহকে অনেক দূরে নিয়ে যায়।

তৃতীয়, মুসলিম উম্মাহর জীবনে উমাইয়াদের মাধ্যমে তৃতীয় যে বিচ্যুতি শুরু হয়েছে. তা ছিল বাইতুল মাল থেকে এমন অত্যধিক সম্পদ খরচ করা, যা খুলাফায়ে রাশিদিন খরচ করেননি। উমর ﵁-এর দায়িত্ব গ্রহণের পর মুসলিমরা বাইতুল মাল থেকে তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন, যা দ্বারা তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন। কিন্তু যখন তাঁর স্ত্রী দৈনিক খোরাক থেকে স্বল্প পরিমাণ বাঁচিয়ে সপ্তাহের শেষে তাঁর জন্য পিঠা বানিয়ে দিতে সক্ষম হলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'যেহেতু তুমি তা বাঁচাতে পেরেছ, তার মানে এটা অতিরিক্ত। এটা বাইতুল মালে ফিরিয়ে দাও।'

এটা উমর ﵁-এর সংবেদনশীলতা থেকে তৈরি হয়েছে, যাকে ইসলাম গড়ে তুলেছে। এই ভয়ে, যাতে প্রয়োজন ছাড়া মুসলিমদের সম্পদ থেকে এক টাকাও গ্রহণ হয়ে না যায়। এই সতর্কতা ছিল ইসলামের আশ্চর্য দৃষ্টান্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা সেই সোনালি প্রজন্মের অন্তরে গড়ে দিয়েছিল। এটা ছিল তাদের অতিরিক্ত ইবাদত, যা আল্লাহ মানুষের ওপর ফরজ করেননি; বরং তারা আল্লাহর নৈকট্যের জন্য তা করে উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছেন। যা শুধু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। সেই উঁচু স্তর থেকে মানুষের ওপর আল্লাহ তাআলার ফরজকৃত স্তরে নেমে আসা মন্দ বা অদ্ভুত কোনো বিষয় নয়; বরং মানুষ যদি এই স্তরে অটল থাকে এবং এখান থেকে পতন না হয়, তাহলে তাদের প্রশংসা করা হবে। কেননা, এটাই সেই সীমা, যে গণ্ডির ভেতরে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবন স্থির থাকবে। কেউ যদি এখান থেকেও অধিক নৈকট্যশীল হতে চায়. তাহলে সে আল্লাহ তাআলা থেকে মুহসিনদের প্রতিদান পাবে।

উমাইয়ারা বিলাসিতা করে বাইতুল মাল থেকে দানদক্ষিণা ও হাদিয়া দিয়ে মানুষের অন্তর তাদের, তাদের শাসন ও রাষ্ট্রের দিকে আকৃষ্ট করত। তাদের এই কাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এটা বলা যায়, তারা ভুল ব্যাখ্যা করেছে। যার ভিত্তিতে মানুষকে তাদের দিকে

tauhiderdak.com

আকৃষ্ট করাও সম্পদ খরচের খাত হিসেবে গণ্য করেছে, কারণ তারাই ইসলামি রাষ্ট্র। তাই তাদের শক্তিশালী হওয়া দিনশেষে ইসলামকে প্রতিষ্ঠাকরণ।

তারা যদি এমন চিন্তা করে থাকে, তবুও তা অনেক দূরবর্তী তাবিল। কেননা, অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য অর্থ দেওয়া হয় শুধু আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশের জন্য, কোনো নির্দিষ্ট শাসকের আনুগত্যে প্রবেশের জন্য নয়।

যদিও উমাইয়াদের জন্য ব্যক্তিগত সম্পদ দ্বারা মানুষকে তাদের রাষ্ট্র ও শাসনের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং বিরোধীদের সন্তুষ্ট করা বৈধ ছিল; আর তাদের হাতে পর্যাপ্ত সম্পদ ছিল, যা দ্বারা তা যাকে ইচ্ছা করতে সক্ষম ছিল; কিন্তু জনগণের সম্পদ দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এ ছাড়া এটা ছিল এমন বিদআত, যা পরবর্তীরা গ্রহণ করে নেয়। দিনে দিনে এর বিস্তৃতি ও ব্যবহারের লক্ষ্যে পরিবর্তন হয়েছে।

চতুর্থ বিষয়, যা হয়তো উমাইয়াদের দৃষ্টিতে বিচ্যুতি ছিল না এবং তখনকার কোনো মুসলিম এর প্রতিবাদ করেনি। তা ছিল রাষ্ট্রকে আরবীয়করণের প্রচেষ্টা, বিশেষ করে পারসিকদের বিপরীতে। যার উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রীয় পদ থেকে পারস্যের মুসলিমদের দূরে রাখা এবং তাদের ওপর সর্বদা চাপ সৃষ্টি করে রাখা; যাতে তারা অনুভব করে যে, তারা আরবদের থেকে নিচে।

হয়তো উমাইয়ারা তাদের সামনে এই আচরণের যৌক্তিকতা দেখতে পায়। কেননা, পারসিকরা ইতিপূর্বে আরবকে তুচ্ছ ও নিচু দৃষ্টিতে দেখত। যার প্রেরণা ছিল, তারা ছিল প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ক্ষমতাশীল রাষ্ট্র। অন্যদিকে আরবরা তুচ্ছ যাযাবর, যারা বস্তুগত সভ্যতার সকল মাপকাঠিতে পারস্যের তুলনায় অনেক নিচে ছিল।

কিন্তু ইসলাম আসার পর সকল মানদণ্ড ও পরিমাপ উলটে যায়। রিবয়ি বিন আমির ইমানের শক্তিতে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যান এবং গাধার ক্ষুরে তাদের সম্মানের চাদর ছিন্ন করেন। তাদের দিকে কোনো জাহিলিয়াতের প্রতি মুমিনের দৃষ্টিপাতের মতো দৃষ্টি ফেলেন। তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন এই বিশ্বাসে যে, তারা উঁচু আর ওরা নিচু।

অতঃপর এ গ্রাম্য যাযাবর, যারা সন্ধ্যা ও সকালের মাঝে 'মানুষের জন্য নির্বাচিত উত্তম জাতি' পরিণত হয়েছে, তাদের সাথে পারস্যের যুদ্ধ শুরু হয়, যারা ছিল বিশাল

tauhiderdak.com

সমরশক্তি ও বাহিনী এবং প্রাচীন ঐতিহ্য ও ক্ষমতার ধারক; কিন্তু এত সব কিছু ইমান ও হকের শক্তির সামনে টিকতে পারেনি, যা নিয়ে মুমিনদের এক দল উঠে এসেছিল। তারা জাহিলিয়াতের দুর্গগুলো মাটির সাথে মিটিয়ে দেয়। সেই স্থানে নতুন এক ধরনের প্রাসাদ গড়ে তোলে। যার ভিত ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'।

পারসিকরা যুদ্ধের পরাজয়ের পর আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে, যা তারা অন্তত আরবদের হাতে আশা করেনি। যে পারসিকদের ক্ষমতার শিকড় ইতিহাসের গভীরে বিস্তৃত ছিল, হকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এই গভীর শিকড় কোনো কাজে আসেনি। কয়েক মুহূর্তেই সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

তবে পারসিকদের প্রথম প্রজন্ম নিশ্চয়ই বিজয়ী আরবদের প্রতি অনেক বিদ্বেষ পোষণ করত; এমনকি তারা ইসলামে প্রবেশ করা সত্ত্বেও। কারণ, যদি পারসিকরা রোমের সামনে পরাজিত হতো, তাহলে তারা ছিল পরস্পর সমান প্রতিপক্ষ। তাই এক পক্ষ অন্য পক্ষ থেকে শক্তিশালী আঘাত খেতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এই আশা ছিল যে, পরবর্তী চক্রে তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু আরব...! এই প্লাবনে সবকিছু এমনভাবে মুছে গেছে, কেমন যেন তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। যার ফলে পারস্যের প্রথম প্রজন্মের জন্য তা মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। যারা একই সাথে সম্মানের যুগ ও ভাঙন প্রত্যক্ষ করেছে।

তাই উমাইয়ারা শাসন গ্রহণের পর মনে করেছে, তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আবশ্যক; যাতে তারা নতুন করে মাথা তুলতে না পারে! তাই রাষ্ট্রকে আরবীয়করণের প্রচেষ্টার অর্থ ছিল পারসিকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের সুযোগ না দেওয়া।

ইতিহাসের এত শতাব্দী পর এসে আমরা এটা নিশ্চিত বলতে পারব না যে, উমাইয়ারা কি খালিস নিয়তেই দ্বীন রক্ষার চেষ্টা করেছে; যাতে হিংসুকরা তা নষ্ট করতে না পারে, না তা তাদের অন্তরের আরবত্বের সাথে মিশ্রিত ছিল। যা বর্তমান যুগের দ্বীন থেকে বিচ্যুত কুফরি আরব জাতীয়তার অর্থে নয়। তবে এই অর্থে যে, আরবরা রিসালাতের ধারক। তাই তাদের উচিত দ্বীনের বিষয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা; যাতে দ্বীন বিকৃতি থেকে রক্ষা পায়।

তবে বিষয়টা যা-ই হোক, পারসিকরা উমাইয়াদের হাতে সত্য দ্বীনের পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখেনি, যা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

tauhiderdak.com

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

'তবে তারা যদি তাওবা করে এবং নামাজ কায়িম করে আর জাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের ধর্মের ভাই (বলে গণ্য হবে)।'[১৮৩]

তাই যদিও প্রথম প্রজন্ম হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করত, তবে আমার ধারণা, যদি তারা সত্য ইসলাম ও মুমিনদের পক্ষ থেকে তাদের ভাইদের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধের বাস্তবায়ন দেখত, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের অন্তর থেকে তাদের বাবাদের বিদ্বেষ দূর হয়ে যেত এবং তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দ্বীন মান্য করত। এই বিদ্বেষ পুষে রাখত না এবং ভেতর থেকে ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করত না। যা করেছিল শুউবি দলের লোকেরা, যারা উমাইয়াদের বিরুদ্ধে আব্বাসি অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। এটা মূলত ছিল পারসিকদের বিদ্রোহ; যদিও অন্তত কিছু দিন বাহ্যিক শাসন আরবদের হাতে থাকে। অতঃপর তারা শুউবি চিন্তার বিষ রাষ্ট্রের মাঝে প্রচার শুরু করে, যার মূলে ছিল ইবনে মুকাফফা। তারা পুরো সমাজে পাপ-পঙ্কিলতার বিস্তার ঘটায়—যেমনটা করেছে বাশার ও আবু নাওয়াস।

১৮৩. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ১১।

tauhiderdak.com

আব্বাসি শাসনামল

অতঃপর আব্বাসিরা আসে। তারা খিলাফতে রাশিদার যুগ ফিরিয়ে আনার জন্য আসেনি!

বরং তারা এসেছে উমাইয়াদের হাতে শুরু হওয়া অধঃপতনের ধারায় আরোহণ করে আরও অধিক বিচ্যুতির দিকে যাওয়ার জন্য। এটা আসমানি রীতি, যখন কোনো জাতি সামষ্টিকভাবে ভালোর আদেশ ও মন্দের নিষেধ ত্যাগ করে, তখন এমনই হয়। শাসকরা হক প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে এতে বাধ্য করে।

উমাইয়াদের যুগের ভ্রষ্টতার পরিমাণ অনেক সীমাবদ্ধ ছিল; যদিও সোনালি যুগের সাথে তুলনা করলে অনেক বড়ো ও মন্দ দেখা যেত। তবে শাসকের কথা বাদ দিলে সামগ্রিক উম্মাহর মাঝে ইমানের সততা, কুরআন-সুন্নাহ থেকে গ্রহণের আবশ্যকতা, আল্লাহর পথে জিহাদে সততা তখনও অবশিষ্ট ছিল। তেমনই সঠিকভাবে উম্মাহর অর্থ বাস্তবায়িত হচ্ছিল, সামষ্টিকভাবে তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আচরণবিধি পারস্পরিক আচরণে প্রয়োগ করত, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করত। সামগ্রিকভাবে পুরো উম্মাহর মাঝে ইসলামের চেতনা অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত ছিল; যদিও শাসকদের বিচ্যুতির ফলে ইসলামের কিছু মর্ম বিপর্যস্ত হয়েছিল। তাই তখন আর সোনালি যুগের মতো আল্লাহর ন্যায়নীতি বাস্তবায়িত হতে দেখা যেত না। অন্যদিকে শাসকের জুলুমের কারণে মানুষ পূর্বের প্রজন্মের মতো শাসকের কাজ পর্যবেক্ষণে আগ্রহী ছিল না; যদিও প্রথম প্রজন্মে শাসকগণ জনগণের পক্ষ থেকে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণের পূর্বে নিজেরাই নিজেদের কাজ সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকতেন।

ইসলামের বিজয় বিস্তৃত হয়, একসময় কনস্টান্টিনোপলের দরজায় আঘাত করে। ইসলাম পূর্বে হিন্দ থেকে পশ্চিমে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামি রাষ্ট্র এতটা শক্তিশালী হয় যে, শত্রুরা তাদের ভয় পেতে শুরু করে। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে হাজার বার হিসাব করত। সে সমাজে মন্দের ওপর ভালো প্রভাব বিস্তার করে নেয়। যার ফলে শাসকের জুলুম ও অবাধ্যতা শুধু তাদের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন সামগ্রিকভাবে পুরো উম্মাহ ইসলামের নিয়ামত, নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিরতা ভোগ করছিল। যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামি বিজ্ঞান ও সভ্যতার জাগরণ হয়।

tauhiderdak.com

আব্বাসিদের যুগে পূর্বের উমাইয়াদের সকল বিচ্যুতি বিদ্যমান ছিল। যার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। অতঃপর এতে আরও কিছু নতুন বিচ্যুতি যুক্ত হয়।

শাসন কামড়ে ধরা বংশীয় শাসন তো বিদ্যমান ছিলই, সেই সাথে সঠিক পথ থেকে তারা আরও বিচ্যুত হয়। উমাইয়ারা যেখানে তাদের রাষ্ট্রকে স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিকে বাছাই করত, সেখানে আব্বাসিরা একে শুধুই উত্তরাধিকার সম্পত্তি বানিয়ে ফেলে। যারা একে নিজেদের পালা হিসেবে গ্রহণ করত। এমনকি দশ বা এগারো বছরের বাচ্চার পালা হলে সে-ই মসনদে বসত। যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের বহু বিধানের পাশাপাশি স্বয়ং রাষ্ট্রের শক্তিতে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ ছাড়া যুবরাজ হওয়া বা ক্ষমতায় বসার জন্য এমন ভয়াবহ সব চক্রান্ত হতো, যা শুনলে শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। সর্বোপরি বিভিন্ন গভর্নররা সুলতানের দুর্বলতার ফলে অন্যদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়, বিশেষ করে তুর্কিদের ওপর। যার ফলে তারা ক্ষমতায় চেপে বসে এবং ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রিক আদর্শ নষ্ট করে দেয়।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সাথে হিংস্র আচরণ, যা উমাইয়ারা শুরু করেছিল, এর তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে এমন হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়, যা কোনো মুসলিম কল্পনা করতে পারে না।

উমাইয়াদের যুগে শুরু হওয়া বাইতুল মালের সম্পদে বিলাসিতা আব্বাসিদের যুগে এসে জাকাত, ভূমিকরসহ অন্যান্য উৎস থেকে প্রচুর অর্থ আসার ফলে এমন পর্যায়ে চলে যায়, যা ছিল অকল্পনীয়। উমাইয়ারা যেখানে বিরোধীদের মুখ বন্ধ ও তাদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং নিজ শাসনের দিকে মানুষকে টানার জন্য অর্থ প্রদান করত, সেখানে আব্বাসি খলিফাদের কাছে কোনো তোষামোদি গায়ক এসে যদি তার প্রশংসায় কয়েক পঙক্তি বলত, তাহলে মুসলিমদের বাইতুল মাল থেকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিত। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمِ التُّرَابَ

'যখন তোমরা অতিমাত্রায় প্রশংসাকারীদের দেখবে, তাদের চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করবে।'[১৮৪]

.....

১৮৪. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩০০২।

tauhiderdak.com

উমাইয়াদের যুগে প্রকাশিত বিচ্যুতিগুলো যদি আব্বাসিদের হাতে আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের যুগে আরও ভয়াবহ বিচ্যুতি যুক্ত হয়েছে, যা সর্বশেষ আব্বাসি শাসনের পতন ঘটিয়েছে। যেগুলোর কিছু প্রভাব আজও উম্মাহর মাঝে বিদ্যমান। উম্মাহ অপেক্ষায় আছে কেউ এসে তাদেরকে এগুলো থেকে মুক্ত করবে।

ফিরকা ও দলাদলির ফিতনার ব্যাপকতা...

আলি ﵁-এর যুগে খারিজিদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং তারা উমাইয়া যুগেও বিদ্যমান ছিল। এই খারিজিদের প্রতিক্রিয়ায় মুরজিয়াদের প্রকাশ ঘটে। এ দুই দলের উৎস ছিল উসমান ﵁-এর শাহাদাতের ফিতনা এবং আলি ﵁ ও মুআবিয়া ﵁-এর মাঝে সংঘাত। আব্বাসি যুগে এসে এই বিভক্তি চূড়ান্ত বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় অভ্যন্তরীণ কারণের সাথে বহিরাগত কারণ ছিল।

আব্বাসি যুগে বিজ্ঞান-কার্যক্রম সক্রিয় হয়। যার পাশাপাশি গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা থেকে অনুবাদ-কার্যক্রম ব্যাপকতা লাভ করে। যেখানে বহু কিছু ছিল, যা বাস্তবেই উম্মাহর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু মুসলিমরা এক ধরনের চিন্তা দ্বারা ধোঁকা খেয়ে যায়। যা তারা নিজেদের জন্য উপকারী মনে করে আরবিতে রূপান্তর করে ফেলে। কিন্তু এখান থেকে অনেক মন্দ ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই মন্দ জিনিস ছিল গ্রিক দর্শন।

এই দর্শনবিদ্যার যতই ঝলক থাকুক, তা ছিল নিরেট জাহিলি চিন্তাধারা। এই জাহিলি চিন্তা কোনো অবস্থাতেই ইসলামের সাথে মিশ্রিত হওয়া উচিত ছিল না। যে ইসলামের পবিত্র আলো স্বমহিমায় উজ্জ্বল। যা দুটো স্বচ্ছ মৌলিক উৎস থেকে আহরিত। আল্লাহ তাআলার কিতাব ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ। যে আলোর উজ্জ্বলতায় সেই সোনালি প্রজন্ম বাস করেছে; ফলে তারা এমন হতে পেরেছেন।

এই দর্শনচিন্তায় সবচেয়ে খারাপ বিষয় ছিল, বাস্তবতাশূন্য যুক্তিবাদিতা। যা সবকিছুকে নিষ্প্রাণ চিন্তায় পরিণত করে, যেখানে কোনো জীবন ও নড়াচড়া নেই। এ ছাড়া বুদ্ধির ভূমিকাকে এত বড়ো করা হয় যে, একসময় তা সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা হয়ে যায়।[১৮৫]

১৮৫. বিস্তারিত জানার জন্য 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ে 'যুক্তিবাদ' অধ্যায় দেখুন।

tauhiderdak.com

এই চিন্তাধারা খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ করে, সেখানে 'ধর্মতত্ত্ব' নামে এক নবধারা সৃষ্টি করে। যেখানে গির্জার মিথ্যা বিশ্বাসগুলো যেমন ত্রিত্ববাদ, আল্লাহ তাআলার কাল্পনিক সন্তান, চিরন্তন পাপ, ক্রুশ, উৎসর্গ ইত্যাদিকে গ্রিক দর্শনের সাথে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়।

খ্রিষ্টানরা তাদের এসব মিথ্যা গালগল্প, যা কোনো বুদ্ধিমানের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে একটু যৌক্তিক করার চেষ্টা হিসেবে গ্রিক দর্শনের দ্বারস্থ হয়; কিন্তু তারা ব্যর্থ ও হতাশ হয়। তাদের বাইবেলের মতোই ধর্মতত্ত্ব একই ভ্রান্তির শিকার হয়। তাই মুসলিমদের জন্য এমন কিছু প্রয়োজন ছিল না। কেননা, তারা এমন পবিত্র আলোর ধারক, যা তার প্রকৃতির বহিরাগত সকল সাহায্য থেকে অমুখাপেক্ষী স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বচ্ছ উৎস থেকে উৎসারিত হচ্ছে।

কিন্তু একদিকে দর্শনের ফিতনা, অন্যদিকে আব্বাসি খলিফাদের পক্ষ থেকে ইসলামের বিষয় নিয়ে মুসলিম আলিমদের সাথে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিতর্কের ক্ষেত্র খুলে দেওয়া এবং সে যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এসব বিতর্কে অংশ নেওয়ার জন্য গ্রিক দর্শনের দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে এটাই সে যুগের চিন্তাগত সম্প্রীতিতে পরিণত হয়।

এই গ্রিক দর্শন ও গ্রিক যুক্তিবাদের আবর্জনা থেকে বহু দল জন্ম নেয় এবং মুসলিমদের চিন্তায় বহু ভ্রান্তি ছড়িয়ে যায়। মুসলিম চিন্তার ওপর গ্রিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের উদাহরণ মুতাজিলাদের কথা বলা হয়। যারা ওহির ওপর বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেয় এবং সবকিছু এমনকি আকিদার ক্ষেত্রে এটাই চূড়ান্ত হিসেবে ধরে।

এ ছাড়াও ছিল বাতিনি ফিরকা, যা বিশেষভাবে আব্বাসি যুগে বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইসলামি ভূমিতে শিকড় ছড়িয়ে দেয়; এমনকি তারা স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। মুসলিমরা কয়েক শতাব্দী যাবৎ তাদের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে। সবগুলোতেই গোপনে মুসলিম-বিশ্বে থাকা ইহুদি চক্রান্তকারীদের হাত ছিল। যারা বাহ্যত মুসলিম দাবি করত; কিন্তু বাস্তবে ইসলাম ধ্বংসের জন্য কাজ করত এবং প্রতিবার জনগণের মন-মস্তিষ্কে তাদের কিছু ভ্রান্ত চিন্তার বীজ রেখে যেত।

ফিরকা ও বিভক্তির অপরাধ শুধু এতটুকু ছিল না।

গ্রিক দর্শনে ধোঁকাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীরা যেখানে বাস্তবতাশূন্য যুক্তিবাদিতা দ্বারা ইসলামি ধর্মতত্ত্ব গড়ে তুলেছে, যেভাবে খ্রিষ্টানরা পূর্বে খ্রিষ্ট ধর্মতত্ত্ব বানিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে ইসলামি আকিদা ও ইসলামি জীবনের ওপর মুরজিয়াদের সব শাখা-প্রশাখার ক্ষতিকর প্রভাব গ্রিক দর্শনের ক্ষতির চেয়ে বহু গুণ বেশি ছিল।

tauhiderdak.com

ইমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস অথবা বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির বিষয়। আমলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ দ্বীন পালনের জায়গায় আমলের গুরুত্ব কমিয়ে ফেলা। মৌখিকভাবে মুসলিম স্বীকৃতিকেই ইমানের মূল বানিয়ে ফেলা। ব্যক্তির জীবনের সামগ্রিক দর্শন ও কর্মকাণ্ডকে ইমান ও দ্বীনের দাবি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা ছিল ভয়াবহ একটি বিচ্যুতি।

তাওহিদের আকিদার বুঝে এই ভয়াবহ বিচ্যুতি যদিও ইসলামি জীবনে সাথে সাথেই তেমন প্রভাব ফেলেনি। কেননা, ইসলাম বাস্তব জীবনে যে বিশাল প্রাণ উজ্জীবিত প্রেরণা দিয়েছিল, তা তখনও আকিদার দাবি অনুযায়ী আমলের রূপে সক্রিয় ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে দায়িত্ব থেকে অবহেলার স্বভাবগত প্রবণতার ফলে অবস্থা পালটে যায়। এ ছাড়াও এসব কথা সর্বদা চর্চিত হচ্ছিল, দ্বীনের দাবি অনুযায়ী আমল আবশ্যক নয়, অন্তরের ইমানই যথেষ্ট, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কালিমার সত্যায়ন ও স্বীকৃতি দেবে এবং তা অন্তরে স্থির থাকবে, তার কাঙ্ক্ষিত ইমান পূর্ণ হয়ে যাবে ইত্যাদি। এই চিন্তাগুলো অবস্থা পুরো পরিবর্তন করে ফেলে।

যে দ্বীনকে নাজিল করা হয়েছে এমন এক বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য, যেখানে আল্লাহর শরিয়াহ ও জীবনবিধান পরিচালিত হবে, সেই দ্বীনের মধ্যেই ইমান থেকে আমলকে বের করার শুধু কল্পনা করাও অদ্ভুত ব্যাপার। এ জন্যই কি আল্লাহ দ্বীন নাজিল করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন? যাতে মানুষরা শুধু অন্তরে সত্যায়ন ও মুখে স্বীকৃতি দেবে, আর বাস্তব জীবন জাহিলিয়াত দ্বারা পরিচালিত অবস্থায় ছেড়ে দেবে, যা অন্তর বিশ্বাস করে না এবং মুখে স্বীকৃতি দেয় না?!

এই জাহিলি সমাজকে কীভাবে বাস্তব প্রত্যক্ষ 'আমল' ছাড়া পরিবর্তন করা সম্ভব? যে আমলের ফলাফল হবে বাতিলের ভ্রান্ত চিন্তা-বিশ্বাস বিলুপ্ত করা, নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করা, যা মানুষকে গাইরুল্লাহর গোলাম বানায় এবং সকল জাহিলিয়াতের মানুষ ও জিন শয়তানের বানানো নষ্ট চরিত্র-আচরণের ধারা পরিবর্তন করা। বিপরীতে যে আমল দ্বারা সমাজে সঠিক আকিদা ও আল্লাহর শরিয়ত অনুয়ায়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আচরণবিধি প্রচলন করা হবে, যা আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত মানদণ্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলো কি আমল ছাড়া সম্ভব?

অতঃপর ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার পর কীভাবে তা রক্ষা করবে জাহিলিয়াতের চিরস্থায়ী শত্রুতা থেকে, এই শাসনকে ধ্বংসের অবিরাম চেষ্টা থেকে এবং এই শাসনের পরিবর্তে তাগুতের শাসন প্রতিষ্ঠার সকল ব্যবহৃত মাধ্যম থেকে; যেমন শত্রু

tauhiderdak.com

বাহিনীর আক্রমণ, ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের আক্রমণ, কুফরি প্রশাসনের শত্রুতা এবং বিদআতি আচরণবিধির আক্রমণ থেকে?!

এসব কি শুধু অন্তরের সত্যায়ন ও মুখের স্বীকৃতি দ্বারা সম্ভব?

কোনো সুস্থ মানুষের মধ্যে কি এটা সম্ভব যে, তার মধ্যে কোনো বিষয়ের ইমান থাকবে; কিন্তু তার বাস্তব জীবনে ইমানের কোনো প্রমাণ থাকবে না? এটা শুধু এমন ব্যক্তির মাঝে হতে পারে, যার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে গেছে এবং সে ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে; যার ফলে তার থেকে দায়িত্ব উঠে গেছে।

এটা সত্য যে, কারও মধ্যে ইমান থাকা সত্ত্বেও তার থেকে ইমানের বিপরীত আচরণ পাওয়া যায়। তবে তা প্রবৃত্তির চাহিদার চাপে, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, এগুলো মানুষের জন্য আকৃষ্ট করে দেওয়া প্রবৃত্তি—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

'নারী, সন্তানাদি, স্বর্ণ-রৌপ্যের অঢেল সম্পদ, ছাপযুক্ত (সুন্দর) ঘোড়া, গবাদিপশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কাম্যবস্তুর আকর্ষণ মানুষের জন্য মনোহর করা হয়েছে। এসব হলো পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী।'[১৮৬]

কিন্তু এই কাজগুলো কোনো কারণ ও প্রমাণ ছাড়া ঘটে না! কারণ হচ্ছে আমরা যা বলেছি, মানুষের ওপর এসব প্রবৃত্তির চাপ। আর প্রমাণ হলো, তার ইমানের এমন শক্তি ছিল না, যা তার প্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম হবে। আর এই অবস্থায় গুনাহ হয়ে গেলে তা মূল ইমানকে বিলুপ্ত করে না। তবে তার থেকে সাময়িকের জন্য ইমানের প্রভাব চলে যায়। যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

'জিনাকারী ব্যক্তি জিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না।'[১৮৭]

---

১৮৬. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৪।

১৮৭. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ৬৭৮২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৭।

tauhiderdak.com

এই হাদিসের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয় যে, ইমান শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার সাথে মানুষের প্রতি মুহূর্তের আমলের গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এটা কি ইবাদত, না গুনাহ? এটা কোন স্তরের ইবাদত এবং কোন স্তরের গুনাহ?

উক্ত আলোচনা থেকে দুটো বাস্তবতা বুঝে আসে—

- আমল ইমানের সাথে সম্পৃক্ত। (প্রতিফলন হিসেবে, মূল অস্তিত্ব হিসেবে নয়)
- ইমান দৃঢ় ও দুর্বল হয়। ইবাদতের মাধ্যমে শক্তিশালী হয় এবং গুনাহের মাধ্যমে দুর্বল হয়। (কুফর ও শিরকের মাধ্যমে পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।)

বিলাসিতা

আব্বাসি যুগের সবচেয়ে ক্ষতিকর আরেকটি বিচ্যুতি ছিল, সর্বদিক থেকে সম্পদ আসার প্রভাবে তাদের জীবনে ব্যাপক বিলাসিতা এসে গিয়েছিল। উমাইয়া যুগের শুরু থেকে মোটামুটি বিলাসিতা ও অপচয় শুরু হয়েছে; তবে তা ছিল সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে। এর কারণ ছিল মানুষের হাতে স্রোতের বেগে সম্পদ আসার পাশাপাশি ধীরে ধীরে তারা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর তাকওয়ার স্তর থেকে অধঃপতিত হয়।

পূর্বেও উমর ﷺ-এর যুগে এমন সম্পদ এসেছিল, যা সেই যুগের হিসেবে অনেকটা অকল্পনীয় ছিল। উমর ﷺ-এর কাছে মাগরিবের নামাজের সময় বাহরাইনের খিরাজ উত্তোলনকারী কর্মকর্তা আগমন করে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কত আছে সাথে?' সে বলল, 'পাঁচ লাখ দিরহাম।' তিনি বললেন, 'পাঁচ লাখ কত তা জানো?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ ও এক লাখ।' তিনি এবার বললেন, 'যাও, তুমি স্বপ্ন দেখছ মনে হয়। আমার কাছে সকালে এসো।' সকালে আসার পর যখন নিশ্চিত হলেন যে, বাস্তবেই পাঁচ লাখ আছে, তখন তিনি মিম্বরে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, 'হে লোক সকল, সম্পদ অনেক বেড়ে গেছে। যদি চাও তাহলে ওজন করব, যদি চাও টুকরি ভরে দেবো।'

কিন্তু সে সময়ের হিসেবে এত পরিমাণ সম্পদ, যা শুধু রূপকথার গল্পেই বর্ণিত হয়, তাও মুসলিমদের নষ্ট করতে পারেনি। যাদের পরিচালক ও শাসক ছিল উমর ﷺ। যিনি বাইতুল মালে একটি পিঠা পরিমাণ সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যা তাঁর স্ত্রী তাঁদের পরিবারের জন্য নির্ধারিত স্বল্প ভাতা থেকে অতিরিক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

tauhiderdak.com

অন্যদিকে উমর ﵁ প্রধান সাহাবিদের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করতে চলে যাওয়া থেকে বিরত করে তাঁদের নিজের পাশে রাখেন; যাতে তাঁরা মানুষের ওপর আল্লাহ তাআলার শাসন বাস্তবায়নের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন।

কিন্তু উমাইয়া যুগের শেষে এবং বিশেষভাবে আব্বাসি যুগে এসে মানুষ অপচয়ের পর্যায়ে সম্পদ ব্যয় করতে থাকে।[১৮৮]

শাসক-পরিবারের জন্য বাইতুল মাল থেকে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া ছিল, যা থেকে তারা অত্যধিক ব্যয় করত। এ ছাড়াও তাদের জন্য ব্যক্তিগত বাইতুল মাল ছিল, যেখানে বছরের পর বছর সম্পদের স্তূপ জমা হতো।

মন্ত্রীরা তাদের ব্যক্তিগত ও খলিফাদের থেকে প্রাপ্ত উপহারের সম্পদে শাসকদের মতো বিলাসিতায় জীবনযাপন করত। সে যুগের হিসেবে পুরো বিশ্বের সম্পদের তুলনায় তাদের ব্যাবসায়িক সম্পদ আসলেই রূপকথার মতো ছিল। কেননা, প্রাচ্য থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পুরো বিশ্বের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে ছিল।

এভাবে তাদের পকেট পূর্ণ হয় এবং সম্পদের বন্যা বয়ে যায়। অন্যদিকে তাদের অন্তর গাফিল হতে থাকে এবং তাদের হাত থেকে আল্লাহর শক্ত রশি ছুটে যেতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের মাঝে অত্যধিক অপচয় ছড়িয়ে যায়।

ইসলামি প্রাচ্যে অপচয়ের কিছু নমুনা দেখুন।

আব্বাসিরা বিবাহের অনুষ্ঠানকে অনেক গুরুত্ব দিত। যেমন মাহদি তার ছেলে হারুনের (রশিদ) সাথে জুবাইদার বিয়েতে এমন অলিমার আয়োজন করে, যা ইতিপূর্বে ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়নি। সেদিন মানুষকে স্বর্ণের পাত্র-ভর্তি রূপা এবং রূপার পাত্র-ভর্তি স্বর্ণ, মিশক ও আম্বর দেওয়া হয়। জুবাইদাকে এত অলংকারে সাজানো হয় যে, সে এগুলোর ভারে হাঁটতে পারছিল না।[১৮৯]

মামুন তার বিয়েতে স্ত্রী বুরানকে এক লাখ দিনার ও পঞ্চাশ লাখ দিরহাম মোহর প্রদান করে। সেদিন রাতে আম্বরের তিনটি বাতি জ্বালায়, যা থেকে অনেক ধোঁয়া বের হয়।

---

১৮৮. আন্দালুসেও এমনটাই ঘটেছিল।

১৮৯. খলিফা মামুনুর রশিদ ও তাঁর স্ত্রী ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যও অনেক সম্পদ ব্যয় করতেন। খলিফার সাথে আলিমদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি তাদের নসিহাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন নিয়মিত। তার স্ত্রী প্রচুর টাকা দান-সদাকা করতেন। নিজ অর্থায়নে জনকল্যাণমূলক অবকাঠামোও নির্মাণ করে দিতেন।

tauhiderdak.com

ফলে জুবাইদা বলে, 'যে অপচয় হয়েছে, তা যথেষ্ট। আম্বরের এই বাতিগুলো নিয়ে শুধু বাতি নিয়ে আসো।'

খলিফা হারুনুর রশিদের বিয়েতে শুধু খলিফা মাহদির খরচ হয় ১৩,৮৮,০০০ দিনার। এ ছাড়া হারুনুর রশিদ নিজেও বিশাল পরিমাণ খরচ করেছেন। জুবাইদা মামুনের কাছে নিশ্চিত করেছেন যে, বিয়ের খরচ ৩৫ থেকে ৩৭ মিলিয়ন দিরহামের মধ্যে ছিল।

মামুন অপচয়ে তার বাবা রশিদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যা তার স্ত্রী বুরান বিনতে হাসান বিন সাহলের জন্য খরচ থেকে স্পষ্ট হয়। তাবারি বলেন, 'বিয়ের যাত্রাপথে মামুন আদেশ দেয়, যাতে হাসান বিন সাহলকে দশ মিলিয়ন দিরহাম ও ফামুস সুলহ অঞ্চলের সমুদয় রাজস্ব প্রদান করা হয়।' ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি তাকে পারস্য ও আহওয়াজ অঞ্চলের পুরো এক বছরের রাজস্ব প্রদান করেন।

আন্দালুসের নমুনা হলো, মুসলিম-বিশ্বের উমাইয়াদের বানানো প্রাসাদের মধ্যে একটি ছিল মামুন বিন জিননুনের তুলাইতিলার নির্মিত একটি প্রাসাদ। সে এই প্রাসাদটি নির্মাণে বহু অর্থ খরচ করে। সে প্রাসাদের মাঝে রঙিন কারুকার্যখচিত কাচের গম্বুজ তৈরি করে। সে গম্বুজে এমনভাবে পানি প্রবাহিত করে, যেন মনে হয় ওপর থেকে চতুষ্পার্শ্বে পানি পড়ছে। সেখানে মামুন উপবেশন করত এবং বাতি জ্বালানোর পর এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হতো।

এগুলো প্রাচ্যের আব্বাসি ও আন্দালুসের উমাইয়াদের জীবনে বিলাসিতা ও অপচয়ের স্বল্প কিছু নমুনা। এ ছাড়াও আরও অনেক অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেখানে মানুষ ব্যাপকভাবে ভোগবিলাস ও দুনিয়ার পেছনে মত্ত হয়ে গিয়েছিল।

আব্বাসি প্রাচ্যে ও পশ্চিমে উমাইয়া (আন্দালুসে) শাসনে এই সভ্যতা বিস্ময়কর স্থাপত্য-শিল্প উদ্ভাবন করে, যার নিদর্শন এখনো বিদ্যমান রয়েছে। যা তাদের অতুলনীয় দক্ষতা, প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিংসহ অন্যান্য বিজ্ঞানের উন্নতির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেখানে ছিল ভোগবিলাসের প্রতি আগ্রহ ও আখিরাত ছেড়ে দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ততা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে বস্তুগত ভোগে মগ্নতার নিদর্শন।

এগুলো ইসলামি চেতনার সাথে অগ্রসর হয়নি; বরং সেই সভ্যতার মাঝে ছিল দ্বীন থেকে বিচ্যুতি[১৯০], যা কিছু কাল পরেই তাদেরকে অনিবার্য ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়।

.....

১৯০. এ কথা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, সভ্যতার সব ক্ষেত্রই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বা একসাথে নষ্ট হয়েছিল;

tauhiderdak.com

এই ভোগবিলাসের অংশ হিসেবে আরও দুটো ফিতনা আক্রমণ করে। একটি ছিল দাসীর আধিক্য। দ্বিতীয় ছিল 'গায়িকা দাসী', যারা খলিফা, আমির, উজির ও ধনীদের প্রাসাদ পূর্ণ করে ফেলে।

মুসলিম-বিশ্বের সাথে শত্রুদের চলমান যুদ্ধের ফলে দাসীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তারা বাজারে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। তাদের উপস্থিতিতে অনেক বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সমাজের ছড়িয়ে পড়া ভোগবিলাসের সাথে তাদের অস্তিত্ব নতুন বিলাসিতা যুক্ত করে এবং পূর্বের ফাসাদের সাথে নতুন ফাসাদ বৃদ্ধি করে। ফলে তারা সম্পদের মতো ফিতনায় পরিণত হয়।

তাদের থেকে সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হলো খলিফা, আমির ও উজিরদের প্রাসাদে তাদের মন্দ কার্যক্রম। এ ছাড়া তাদের কারণে প্রাসাদে ব্যাপক বিনোদন শুরু হয়; যার ফলে তাদের মালিকরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে গাফিল হয়ে যায়। তাদের মাঝে অনেকে ছিল ইহুদি ও খ্রিষ্টান, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট ঘৃণা পোষণ করত। আর এই ঘৃণা থেকে প্রাসাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র, কুমন্ত্রণা ও ফিতনা ছড়াত; যার ফলে শাসকরা জনগণের পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ত্যাগ করে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকত; অথচ তাদের জন্য আবশ্যক ছিল সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকা। তা ছাড়া তারা মুসলিম শাসক, যাদের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা।

ব্যাপক অর্থ-সম্পদ ও অধিক পরিমাণে দাসী থাকার ফলে সেখানে আরেকটি প্রবণতা দেখা দেয়, যা আরও ক্ষতিকর ছিল এবং তাদেরকে অনেক গাফিল বানিয়ে রাখত। যাকে ইতিহাসে 'গায়িকা দাসী' বলা হতো। যার ফলে তারা প্রাসাদে ঢোল-তবলা আর গান নিয়েই ব্যস্ত থাকত। এর ভিত্তিতে সেখানে নতুন এক পেশা বের হয়, যা দিয়ে অনেক মানুষের জীবিকা নির্বাহ হতো। তা ছিল সুন্দর কণ্ঠের দাসী খুঁজে এনে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চড়া দামে বিক্রি করা বা নিজেদের অনুষ্ঠানের জন্য সাথে রাখা।

তবে এটা সত্য যে, এই অবস্থা একদিনে হয়ে যায়নি; বরং দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অধিক সময়ে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের পতন ঘটে। তবে ইসলাম তখনও জমিনে টিকে ছিল। যার কিছু কারণ ছিল।

বরং তখনও অনেক কল্যাণ অবশিষ্ট ছিল। কারণ, তা ইসলামি আদর্শ ধারণ করেছিল। কিন্তু সর্বশেষ যখন ভ্রষ্টতা মূল সততার ওপর প্রাধান্য পেয়ে যায়, তখন আল্লাহর সুন্নাহ অনুযায়ী চূড়ান্ত আজাব চলে আসে।

tauhiderdak.com

এই অন্যায়-দুর্নীতি প্রথমে শুরু হয় খলিফা ও আমিরদের প্রাসাদে। অতঃপর সাধারণ ধনীদের প্রাসাদে। একসময় রাজধানীতে তা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়, যা অধিকাংশ মানুষ প্রত্যাখ্যান করত না; চাই তারা এতে অংশগ্রহণ করুক, বা এতে তাদের কোনো অংশ না থাকুক। তবে শুরুর দিকে ইসলামি অন্যান্য ভূমিগুলো এই আঞ্চলিক অনিষ্টতায় প্রভাবিত হয়নি। কেননা, তারা তখনও আল্লাহর দ্বীনের ওপর ইমানের চাহিদামতে জোরালোভাবে ইসলাম চর্চা করত।

একসময় অনিষ্টতা খিলাফতের রাজধানী থেকে আঞ্চলিক রাজধানীগুলোয় সংক্রমিত হয়ে যায়। এটাই আল্লাহর নীতি যে, কোনো অঞ্চলে অনিষ্টতা প্রকাশিত হয় যখন মানুষ কল্যাণের আদেশ ও মন্দের নিষেধ থেকে অবহেলা করে। এটাই আব্বাসি সমাজে ঘটেছিল।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও জলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে; তিনি চান তাদেরকে তাদের কতিপয় কর্ম (কর্মের শাস্তি) আস্বাদন করাতে; যাতে তারা ফিরে আসে।'[১৯১]

কারণ, যখন বাধা দেওয়া না হয়, তখন অনিষ্টতা ছড়াতে থাকে এবং গভীরে শিকড় গেঁড়ে বসে; ফলে অধঃপতন ঘটে।

সে সমাজের বহু ক্ষেত্রে অনিষ্টতা ছড়িয়ে যায় এবং তা শক্তিশালী হয়। প্রতিটা ফিতনা এসে সমাজের নতুন কোনো শ্রেণিকে গ্রাস করে নিত। একসময় তাতারদের হাতে আব্বাসি শাসনের পতন হয়। এভাবে ক্রুসেডের হাতে আন্দালুসের পতন হয়।

কিন্তু ইসলাম সর্বদাই বিদ্যমান ছিল, আছে এবং থাকবে।

তবে মানুষের অন্তরে আকিদার বীজ জীবন্ত ছিল। হ্যাঁ, এটা ঠিক; গুনাহ, বিদআত, মন্দ, দ্বীনকে আবশ্যকীয়ভাবে গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ফলে তাতে অনেক ধুলার আস্তরণ পড়েছিল; কিন্তু তা জীবিত ছিল। এমন ব্যক্তির অপেক্ষায় ছিল, যিনি এসে ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করবেন; ফলে তা আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। তাই যখন সালাহুদ্দিন আইয়ুবি এসে মানুষকে বলেছেন, 'তোমরা ক্রুসেডের সামনে পরাজিত

১৯১. সূরা আর-রুম, আয়াত নং ৪১।

tauhiderdak.com

হয়েছ আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে। আবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ব্যতীত তোমরা বিজয়ী হতে পারবে না।' তেমনই কুতুজ এসে যখন তার বিখ্যাত ডাক দেয়, '(ওয়া ইসলামাহ) হায় ইসলাম!' তখন ইমানের বীজ নতুনভাবে জেগে ওঠে। মুসলিমরা মিশর ও শামে ক্রুসেডের ওপর জয়ী হয়। যেখানে মূল যুদ্ধ হয় হিত্তিনের ময়দানে। একইভাবে তারা আইনে জালুতের যুদ্ধে তাতার বাহিনীর ওপর জয়ী হয়, যা ছিল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক বাঁক। কারণ, তখন থেকে স্বয়ং তাতার বাহিনী ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। পরে তারা ইসলামের পক্ষে অনেক শক্তিশালী যোদ্ধায় পরিণত হয়।

আব্বাসি শাসনের পতন হয়। তবে আব্বাসি যুগে সমাজে অনিষ্টতার এত মাধ্যম ছড়িয়ে যাওয়ার পরও মানুষের মাঝে বহু কল্যাণ অবশিষ্ট ছিল। যা এ উম্মাহর আরও বহু শতাব্দী বেঁচে থাকা এবং ইতিহাসে নতুন চক্র ঘুরে আসার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আন্দালুসেও ইসলামি রাষ্ট্রের পতন হয়। যেখান থেকে মুসলিমদেরকে হিংস্রভাবে বিতাড়িত করা হয়। একাধারে প্রায় দুইশ বছর ধরে খুঁজে খুঁজে আদালতের টর্চার সেলে পশুর মতো শাস্তি দেওয়ার ফলে একসময় সে অঞ্চল থেকে ইসলামের অস্তিত্ব মুছে যায়। কিন্তু বিশ্বের অপর এক স্থানে শক্তিশালী নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের উদয় হয়, যা আরও পাঁচশ বছরের অধিক সময় মাথা উঁচু করে টিকে থাকে।

ভ্রান্ত সুফিবাদ

তবে এই তৃতীয় খিলাফতের সার্বিক বিষয় আলোচনার পূর্বে আমরা আব্বাসি যুগের আরেকটি বিচ্যুতি নিয়ে কথা বলব। যা আব্বাসি শাসনের পতনের পরে বিদ্যমান ছিল; বরং নতুন রাষ্ট্রের সূচনা থেকেই তাতে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেয়। এই উম্মাহর জীবনে এটা এত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল যে, স্বয়ং পুরো উম্মাহ অধঃপতিত হয়।

এটা ছিল ভ্রান্ত সুফিবাদ।

আব্বাসি সমাজে যে ভোগবিলাস ছড়িয়ে গিয়েছিল, এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সুফিবাদের জন্ম হয়। সমাজের পাপ-পঙ্কিলতা এবং আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের স্মরণ থেকে অবহেলায় অতিষ্ঠ হয়ে সৎ ব্যক্তিরা নিজেদের বাঁচানোর চিন্তা শুরু করে। ফলে তারা নিজেদের কাপড় গুটিয়ে নেয় এবং এই নষ্ট সমাজ থেকে পলায়ন করে; যাতে আল্লাহর সাথে পবিত্র সৎ জীবনযাপন করতে পারে।

tauhiderdak.com

সুফিবাদে যেসব ভ্রান্ত চিন্তা এবং ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ও প্যাগান ধর্ম থেকে যত কার্যক্রম প্রবেশ করেছে, সেগুলোর কথা বাদ দিলেও কেউ এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, সুফিবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সব অনিষ্টতা থেকে নির্জনতা ও দূরত্ব বজায় রাখা। এবং পবিত্র পরিবেশে নিভৃতে অবস্থান করা।

যদিও এখানে অন্তরের পরিশুদ্ধির মেহনত আছে, যা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত; দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে মুক্ত হওয়ার মেহনত আছে, যা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত; আখিরাতের স্মরণ রয়েছে, যা ইসলামের মধ্যে রয়েছে। (এটাই মূলত প্রকৃত আত্মশুদ্ধি ও জুহদের কার্যক্রম) কিন্তু ভ্রান্ত সুফিবাদের মধ্যে নেতিবাচকতা ও সন্ন্যাসী কার্যক্রম রয়েছে, যা ইসলামের মধ্যে নেই। দুনিয়ার জীবন নিয়ে অবহেলা রয়েছে, যা ইসলামের মধ্যে নেই।

এই নেতিবাচক সুফিবাদ মূলত বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে টিকে থাকার প্রচেষ্টা থেকে পলায়ন। এমন এক 'বিশেষ জগতে' পলায়ন, যা আবেগ দ্বারা তৈরি। যেখানে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যের কাল্পনিক বা সত্যিকার অনুভূতি লাভ করে। ফলে 'আমল' ছেড়ে শুধু এই অনুভূতি নিয়ে বসে থাকে, যা নাকি তার পথ সংক্ষিপ্ত করে দেবে।

আমল হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম। কিন্তু মাধ্যমের দিকে পৌঁছানোর জন্য কি আবার কোনো মাধ্যম প্রয়োজন?

ভ্রান্ত সুফিরা দুনিয়ার জীবনের আমল ও মেহনত থেকে বিমুখ থাকে, তেমনই তারা বিকৃত সমাজকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা থেকে দূরে থাকে। এগুলো ত্যাগ করে তারা শুধু সেসব আবেগ ও অনুভূতির মাঝে মগ্ন থাকে, যেখানে তাদের ধারণা হয় যে, তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে গেছে, আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত এবং আল্লাহর নুরের সাগরে সাঁতার কাটছে। ফলে তারা ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করে না; কেননা, এর ওপর তো আর কিছু নেই!!

এগুলো এমন অনুভূতি, যেখানে বাস্তবেই মানুষের ডুবে থাকা সম্ভব; ফলে তারা এতে আত্মমগ্ন হয়ে যায় এবং তা থেকে জাগ্রত হয় না।

অতঃপর আত্মিক প্রশিক্ষণ মানুষের সামনে বিস্ময়কর এক জগৎ উন্মোচন করে দেয়। যেভাবে শারীরিক প্রশিক্ষণ মানুষকে শক্তি ও সক্ষমতা দেয় এবং সেই শক্তি ব্যবহারের যোগ্য করে তোলে। যেভাবে বুদ্ধির প্রশিক্ষণ মেধাকে সতেজ করে এবং বুঝ ও আত্মস্থ করার সক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। তেমনই আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ মানুষের অন্তরকে সচ্ছল ও উজ্জ্বল করে তোলে। ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক বাধার সীমা ছাড়িয়ে এমন জগতে চলে যায়,

tauhiderdak.com

যেখানে কোনো সীমা নেই। আর এর স্বাদ আরও প্ররোচিত করে।

কিন্তু ইসলাম এমন সব গায়িবি বিষয় নিয়ে পড়ে থাকাকে গ্রহণ করে না। ইসলাম জমিনে একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছে।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

'আমি স্পষ্ট নিদর্শনসহ আমার রাসুলদের পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড দিয়েছি; যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে।'[১৯২]

মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা শুধু আগ্রহ বা প্রত্যাশা দ্বারা হয় না। যেভাবে মানুষের জীবনের কিছুই শুধু আগ্রহ ও প্রত্যাশা দ্বারা ঘটে না; বরং আগ্রহ বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা এবং প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া আবশ্যক।

নির্দিষ্টভাবে স্বয়ং মুসলিমদেরকে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব দিয়েছেন; যাতে তারা পুরো মানবজাতিকে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে—

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

'আলিফ-লাম-রা। (এটি) একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি; যাতে আপনি মানুষকে তাদের রবের হুকুমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে আনতে পারেন।'[১৯৩]

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।'[১৯৪]

---

১৯২. সুরা আল-হাদিদ, আয়াত নং ২৫।

১৯৩. সুরা ইবরাহিম, আয়াত নং ১।

১৯৪. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১০৪।

tauhiderdak.com

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'[১৯৫]

কল্যাণের আদেশ ও মন্দের নিষেধ হচ্ছে বাস্তব দুনিয়ায় দ্বীনের সকল কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ। এটা এমন বাহ্যিক প্রচেষ্টা, যা বাস্তব জীবনে ব্যয় করা হয়। এটা জীবনের সকল ক্ষেত্রে উত্তম একটি অবস্থা।

আর এখানেই হচ্ছে ভ্রান্ত সুফিবাদ ও ইসলামের মূল পার্থক্য। সুফিবাদ হচ্ছে নেতিবাচকভাবে বিরত থাকা এবং ইসলাম হলো উত্তমভাবে মুখোমুখি হওয়া। দ্বীনের দাওয়াতে স্পষ্টভাবে দুনিয়ার ভোগসামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়ার নির্দেশনা এসেছে—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ - قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ -الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'নারী, সন্তানসন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের অঢেল সম্পদ, ছাপযুক্ত ঘোড়া, গবাদিপশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কাম্যবস্তুর আকর্ষণ মানুষের জন্য মনোহর করা হয়েছে। এসব হলো পার্থিব জীবনের ভোগের সামগ্রী। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল (জান্নাত)। বলুন, "আমি কি তোমাদেরকে এগুলোর চেয়ে ভালো কিছুর সংবাদ দেবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন সব জান্নাত রয়েছে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আরও রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনীরা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ

১৯৫. সূরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

tauhiderdak.com

বান্দাদের সবকিছু দেখেন।" যারা বলে, "হে আমাদের রব, আমরা তো ইমান এনেছি, তাই আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন।"'[১৯৬]

হুবহু সুফিবাদেও দুনিয়ার ভোগসামগ্রী থেকে মুক্ত হওয়া এবং স্বল্প পাথেয় নিয়ে ক্ষান্ত থাকার কথা বলা হয়; কিন্তু পার্থক্য হলো, দুনিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার চর্চার মাধ্যমে যে বিশাল আত্মিক শক্তি অর্জিত হয়, তা ব্যয় করবে কোথায়?

ইসলাম বলে, এই শক্তি বাস্তব দুনিয়ায় উন্নত আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যয় করা হবে। আর নেতিবাচক ও ভ্রান্ত সুফিবাদ এই শক্তিকে শুধু অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আবেগের উন্নতিতে ব্যয় করে।

একটি সত্যিকার অর্থে বাস্তব জগৎকে সংশোধন করে। ব্যক্তি ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করে। এ দুটোকে নিকৃষ্ট অবস্থা ও পরিবেশ থেকে উঠিয়ে এমন উঁচু স্তরে পৌঁছে দেয়; যার ফলে মানুষ তখন তার শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত সব শক্তি দ্বারা খিলাফতের দায়িত্ব আদায় করে এবং আল্লাহর কর্মপন্থা অনুযায়ী জমিনকে আবাদ করে। এটাই সামগ্রিক বিস্তৃত অর্থে আল্লাহর আবদ বা 'বান্দা' হওয়ার মর্ম। যা বাস্তবায়নের ফলে মানুষের সর্বোচ্চ অস্তিত্ব ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

আর অপরটি সমাজকে সব মন্দসহ ছেড়ে দেয়। সংশোধনের চেষ্টা করে না। নিজেকে সংশোধনের চেষ্টায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই চেষ্টায় হয়তো সে আত্মিক দিকে সফল হয়; কিন্তু মানুষ হিসেবে আল্লাহ তাআলা তাকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সে তার বাস্তবতা ও ইতিবাচকতা হারিয়ে ফেলে। এ ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজকৃত দায়িত্ব 'মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে' তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা তো একেবারেই ত্যাগ করে।

ধরুন কারও কাছে এমন কোনো সুপ্ত শক্তি আছে, যা দ্বারা বিশাল অঞ্চল আবাদ করা, সেখানে ক্ষতিকর পোকামাকড় পরিষ্কার করা, ফসল বোনা ও পানি দেওয়া সম্ভব। যা থেকে ফুল-ফল উৎপন্ন হবে। ফলে এর ফসল থেকে বহু মানুষ জীবনধারণ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবে। কিন্তু সে এই শক্তি বিচ্ছিন্ন একটা ভূমিতে ব্যয় করে, আর বাকি সমস্ত জমিতে ঝোপঝাড় ও পোকামাকড়ের আস্তানা হওয়ার জন্য ফেলে রাখল। তার শক্তির কত নিকৃষ্ট অপচয় হবে?!

.....

১৯৬. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৪-১৬।

tauhiderdak.com

এটা হলো ভ্রান্ত সুফিবাদের উদাহরণ, যারা মানুষের শক্তির অপচয় করে; যদিও তারা ধারণা করে যে, তারা আত্মিক শক্তি জমা ও সঞ্চয় করছে। তেমনই এটা সুফিবাদীদের মানুষের জীবন সংশোধন থেকে বিরত থাকার দৃষ্টান্ত; যদিও তারা ধারণা করে, তারা মানুষকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করছে।

মানুষ যতই চেষ্টা করুক, ফেরেশতাদের মতো আমল করতে পারবে না—

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

'তারা রাতদিন (আল্লাহর) গুণগান করে, (কখনো তাতে) অবহেলা করে না।'[১৯৭]

আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও হিকমতে মানুষকে ফেরেশতাদের মতো ইবাদতের দায়িত্ব দেননি। অন্যথায় তাকে ফেরেশতা হিসেবেই সৃষ্টি করতেন। যারা স্বচ্ছ নুরের তৈরি এবং তাদের মাটির দেহ নেই। জীবন নিয়ে তাদের কোনো চিন্তাও নেই।

বরং তিনি দয়া ও বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষকে জমিনের মাটি দ্বারা বানিয়েছেন এবং রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। তাকে শরীর দিয়েছেন, যা স্বেচ্ছায় সক্রিয় হয়। বুদ্ধি দিয়েছেন, যা দ্বারা চিন্তা করা যায়। স্বাধীন প্রাণ দিয়েছেন। তাদের বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছেন, যা একদিকে ফেরেশতাদের থেকে ভিন্ন এবং অন্যদিকে জড়বস্তু ও প্রাণী থেকে ভিন্ন। এমন ইবাদত, যাতে তার পুরো গঠন যুক্ত হয়—শরীর, বুদ্ধি ও অন্তর। তার শরীরের সব কর্ম ইবাদত, তার বুদ্ধির সব চিন্তা ইবাদত এবং অন্তরের সব অনুভূতি ইবাদত, যদি এগুলো আল্লাহর দিকে অভিমুখী হয় এবং আল্লাহর বিধান মান্য করা হয়—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ

'বলুন, "আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই।"'[১৯৮]

যখন সে তা করবে, তখন সর্বোচ্চ স্থানে, আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির সবচেয়ে উপযুক্ত থাকবে। যার প্রমাণ হলো আল্লাহর সবচেয়ে ইবাদতকারী বান্দা, আল্লাহর সৃষ্ট সবচেয়ে মহান মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি বলেছেন,

১৯৭. সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং ২০।

১৯৮. সুরা আল-আনআম, আয়াতন নং ১৬২-১৬৩।

tauhiderdak.com

وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

'আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমি অধিক তাকওয়াবান। অথচ আমি রোজা রাখি এবং তা থেকে বিরতও থাকি, (রাতে) সালাত আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই, আবার আমি নারীদের বিবাহও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[১৯৯]

এই হাদিস শোনার পরও কি কেউ ধারণা করতে পারবে যে, সে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বেশি ইবাদতকারী?

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদত কেমন ছিল?

রবের সাথে যখন নির্জনে অবস্থান করতেন, তখন এত বেশি ইবাদত করতেন যে, তাঁর পবিত্র পা-দুটো ফুলে যেত। তখন আয়িশা ﵂ তাঁকে বলতেন, (يَا رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ) 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এমন করছেন! আল্লাহ তো আপনার পূর্ব-পরের সবকিছু ক্ষমা করে দিয়েছেন।' তখন তিনি সত্যিকার গভীর ইবাদতকারী বান্দার মতো জবাব দিতেন, (يَا عَائِشَةُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) 'হে আয়িশা, আমি কি শোকরগোজার বান্দা হব না?'[২০০]

তা সত্ত্বেও তিনি কেমন ছিলেন?

তিনি ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ইতিবাচক শক্তিধারী।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে মেহনতে, আল্লাহর পথে জিহাদে, সাহাবিদেরকে সর্বদিকে উত্তম আদর্শ হিসেবে তারবিয়াহ ও সর্বক্ষেত্রে উত্তম শক্তির অধিকারী করে গঠনে এবং এমন উম্মাহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজ শক্তি ব্যয় করেছেন, যাঁদের ব্যাপারে স্বয়ং তাঁদের স্রষ্টা ও দুনিয়ায় প্রেরণকারী আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

১৯৯. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ৫০৬৩; সহিহু মুসলিম, হাদিস নং ১৪০১।
২০০. সহিহু মুসলিম, হাদিস নং ২৮২০।

tauhiderdak.com

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে।'[২০১]

তিনি নিজ শক্তি ব্যয় করেছেন জমিনে আল্লাহর ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায়। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, যুদ্ধ, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও চিন্তাগত গঠন বিন্যাসে। সেই সাথে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের কার্যক্রম, স্ত্রী-সন্তানের দেখাশোনা, ভরণপোষণ, দিকনির্দেশনা, শিক্ষাদান ইত্যাদি সবকিছুই করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ হচ্ছেন কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের আদর্শ। তিনি হচ্ছেন দুনিয়াতে এই দ্বীন বাস্তবায়নের সর্বোত্তম নমুনা।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا

'বস্তুত তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।'[২০২]

ভ্রান্ত সুফিরা বলে, তারা নাকি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা কামনা এবং আল্লাহর অধিক জিকির করে। তাহলে কেন তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বোত্তম, বাস্তব ও কার্যকরভাবে অনুসরণ করে না? কেন তাঁর মতো মন্দ পরিবেশের মুখোমুখি হয়ে তা ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে এর পরিবর্তে সঠিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে না?[২০৩]

এটাই হচ্ছে ইসলাম ও ভ্রান্ত সুফিবাদের মূল পার্থক্য। একদিকে উত্তম প্রচেষ্টা, অন্যদিকে নেতিবাচকতা। এদিকে মন্দের মোকাবিলা, সেদিকে সমাজ বিচ্ছিন্নতা। এদিকে দুনিয়ার সামগ্রীর বৈধতা ও গ্রহণ করার সাথে সাথে অন্তরে দুনিয়াবিমুখতা। আর সেখানে দুনিয়া থেকে এমনভাবে নিজেকে গুটিয়ে রাখা হয়, যা আগ্রহ নষ্ট করে ফেলে এবং হৃদয়ের আবেগ-উত্তাপ সব শুকিয়ে যায়।

.....

২০১. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

২০২. সুরা আল-আহজাব, আয়াত নং ২১।

২০৩. এখানে জেনে রাখা আবশ্যক যে, অনেক এমন আছে, যারা সুফি ছিলেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ ছিলেন। যারা আফ্রিকা ও এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে ইসলাম ছড়িয়ে দিয়েছেন, যেখানে তা পূর্বে পৌঁছেনি। এমন পরহেজগার ব্যক্তিদের ওপর আমাদের আলোচনা প্রযোজ্য হবে না।

tauhiderdak.com

নেতিবাচক সুফিবাদে তাওয়াক্কুলের পরিবর্তে তাওয়াকুল (চেষ্টাহীন নির্ভরতা) জন্ম নেয়। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল তো গভীর ইমান থেকে আসে। কুরআনে এর আলোচনা ইমানের সাথে মিলিত অবস্থায় এসেছে—

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

'অতএব মুমিনরা যেন আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।'[২০৪]

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

'মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ইমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।'[২০৫]

এই তাওয়াক্কুল হলো আল্লাহর দ্বীনের অনেক বিষয়ের মতোই উত্তম এক প্রেরণা। যা কোনো মুমিন আসবাব গ্রহণের সাথে করে থাকে।

অন্যদিকে সুফিরা যে তাওয়াকুল চর্চা করে, (কিন্তু বলে এটা নাকি তাওয়াক্কুল) সেটা সুফিবাদের সব বিষয়ের মতো কর্মহীনতার দিকে ধাবিত করে। তারা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের দোহাই দিয়ে আসবাব গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

এটা তাকদির ও ফায়সালার বহু আকিদা নষ্ট করে ফেলে। ফলে এটা উত্তম প্রেরণার পরিবর্তে হতাশা সৃষ্টিকারী নেতিবাচক আকিদায় পরিণত হয়েছে। মন্দ পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা না করার ভ্রান্ত আকিদার দিকে নিয়ে গেছে।

আল্লাহ তাআলা প্রথম প্রজন্মকে শিক্ষা দিচ্ছেন—

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

'বলুন, "আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের হবে না। তিনি আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর ওপরই

২০৪. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৬০।
২০৫. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ২।

tauhiderdak.com

মুমিনদের ভরসা করা উচিত।"[২০৬]

তারা যাতে জেনে রাখে, যুদ্ধের ময়দানে গমন তাদেরকে হত্যা করতে পারে না; বরং আল্লাহর নিকট নির্ধারিত তাকদির তাদের ওপর বর্তায়, সে যেখানেই থাকুক। ফলে তারা সর্বশক্তি নিয়ে শত্রুর দিকে ধাবিত হতেন।

তাদের আরও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ - وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ

'কাফিররা যেন মনে না করে যে, তারা বেঁচে গিয়েছে। তারা কখনো (শাস্তি প্রদানে আমাকে) অপারগ করতে পারবে না। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পারো শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরকেও আতঙ্কিত রাখবে।'[২০৭]

তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তাআলা কখনো কাফিরদের এই দ্বীনকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার সুযোগ দেবেন না; বরং অবশ্যই এই দ্বীন দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। তা সত্ত্বেও তারা সাধ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করেছেন। অর্থাৎ চেষ্টা করেছেন এবং আসবাব গ্রহণ করেছেন। তারা এটা বলেননি, 'যেহেতু আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করে দেবেন, তাহলে এটাই যথেষ্ট। আমরা তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে কোনো কাজ করব না।'

প্রথম যুগের মুসলিমদের জীবনে তাকদিরের বিশ্বাস ছিল শক্তিশালী এক প্রেরণা, যা তাদের সামনের দিকে ধাবিত করত। কিন্তু ভ্রান্ত সুফিদের তাওয়াকুল (কর্মহীন ভরসা) একে ভিন্ন দিকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা আসবাব গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এই যুক্তিতে যে, 'যা তোমার ভাগ্যে লেখা আছে, তা আসবেই।' তারা নিজ কর্মের দায় গ্রহণ থেকে দূরে থাকে এই যুক্তিতে যে, যা তার থেকে হয়েছে, তা আল্লাহর তাকদিরেই হয়েছে। খারাপ অবস্থা যেমন রোগ, অক্ষমতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি পরিবর্তন না করে বসে থাকে এই বলে, যা ঘটেছে, আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়েছে; যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে ভিন্ন কিছু ঘটত।

২০৬. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ৫১।
২০৭. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৫৯-৬০।

tauhiderdak.com

এই ধরনের সুফিবাদ দুনিয়াকে দ্বীনের আলোকে উন্নত করে গড়ে তোলা থেকে বিরত থাকে। কারণ, দুনিয়া হলো নিকৃষ্ট এবং তাদের একমাত্র করণীয় হলো আখিরাত। তাই মানুষের জন্য দুনিয়াতে ন্যূনতম জীবিকা দ্বারা বেঁচে থাকাই যথেষ্ট। যাতে নিজ অন্তর দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। যাতে আখিরাতের প্রস্তুতিস্বরূপ অন্তরের পরিশুদ্ধি নিয়ে সর্বদা মগ্ন থাকতে পারে।

এতে সন্দেহ নেই যে, দুনিয়ার সামগ্রী কমানো এবং দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার আহ্বান ইসলামের মৌলিক দাবি। এটা হলো 'জুহদ', যেদিকে আমরা ইঙ্গিত করেছি। কিন্তু দুনিয়াকে দ্বীনের আলোকে আবাদ করা থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় এবং দুনিয়ার জীবনে মগ্ন হওয়া থেকে বিপরীত ক্ষেত্র।

আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে কাজ ও উদ্যমের প্রেরণা দিয়েছেন চাহিদা ও প্রবৃত্তির সুরতে, যার সবচেয়ে স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

'নারী, সন্তানাদি, স্বর্ণ-রৌপ্যের অঢেল সম্পদ, ছাপযুক্ত (সুন্দর) ঘোড়া, গবাদিপশু ও ক্ষেত-খামার ইত্যাদি কাম্যবস্তুর আকর্ষণ মানুষের জন্য মনোহর করা হয়েছে।'[২০৮]

আল্লাহ তাআলা এ প্রবণতাগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাআলা অনর্থক কাজ থেকে মুক্ত। তেমনই এ জন্যও সৃষ্টি করেননি যে, মানুষ আত্মশুদ্ধির নামে এগুলোকে একেবারে মেরে ফেলবে; বরং এগুলো সৃষ্টি করেছেন যাতে এগুলো তাকে দুনিয়াকে দ্বীনের আলোকে আবাদ করার ক্ষেত্রে সাহায্য ও উদ্বুদ্ধ করে। এ কাজ সেই খিলাফতের অংশ, যে জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'(স্মরণ করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে (আমার) এক প্রতিনিধি (মানুষ) বানাব।"'[২০৯-১০]

---

২০৮. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৪।

২০৯. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ৩০।

২১০. ভ্রান্ত সুফিবাদ নিয়ে আলোচনার অংশ থেকে অনেক অংশ বিয়োজন করা হয়েছে। কারণ, কাঙ্ক্ষিত

tauhiderdak.com

পূর্বের সবকিছুর সাথে আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি, তারা শুধু নিজের মাঝে ইসলাম বাস্তবায়নের পথে হাঁটতে গিয়ে মূল ইসলাম থেকে কতটা দূরে চলে গেছে এবং এতে কত সমস্যাজনক কিছু যুক্ত করেছে। আল্লাহর পথ তো এটা নয়। এসব হচ্ছে কিছু মুখলিস সত্যবাদী বিদআতমুক্ত সুফিদের অবস্থা। এখন যদি এতে বিদআত ও কুসংস্কার প্রবেশ করে, তাহলে অবস্থা কী হবে?

এতে সন্দেহ নেই যে, সুফিদের ইতিহাসে অনেক পির বা মুরিদ ছিলেন, যারা মুখলিস আলিম, জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথের মুজাহিদ, ভালোর আদেশকারী ও মন্দ কাজে নিষেধকারী এবং দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীনের প্রচারক ছিলেন। তাদের ব্যাপারে যেমন পূর্বে বলেছি, ভ্রান্ত সুফিবাদের হুকুম তাদের ওপর প্রযোজ্য হবে না। তারাই মূলত জাহিদ।

যদি আমরা আব্বাসি যুগে ফিরে আসি তাদের বিচ্যুতিগুলো পরিমাপ করার জন্য, তবে আমরা দেখি, সেগুলো অনেক বিশাল ছিল এবং দ্বীনের অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল।

এসব সামষ্টিক বিচ্যুতির চাপে আব্বাসি শাসন ধসে পড়াই স্বাভাবিক ছিল। এসব বিচ্যুতির মাঝে কিছু আছে, যার একটিই কোনো শাসনের ভিত ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। যেমন প্রাসাদের অত্যধিক ভোগবিলাস, বিদেশিরা সুলতানকে নিয়ে খেলা করা, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির দুর্বলতা। এসব কিছুর সাথে যখন পূর্বে বর্ণিত বিচ্যুতিগুলো যুক্ত হবে, তখন রাষ্ট্রের পতন কোনো অবাক হওয়ার বিষয় নয়; বরং আশ্চর্যের বিষয় ছিল, এত সমস্যাসহ এত সময় বিদ্যমান থাকা।

মানুষের জীবনে আল্লাহর নীতির বাস্তবায়নার্থে পতন আসে। এগুলো এমন নীতি, যা কাউকে ছাড় দেয় না; এমনকি মুখে কালিমা পাঠ করলেও।

যদিও তাতার বাহিনী আব্বাসি শাসনকে ধ্বংস করে দেয়, যারা আব্বাসি শিয়া উজির এবং বাগদাদে বাসকারী ইহুদিদের গোপন আহ্বানে এসেছে। ফলে তাতারদের অবস্থানের পুরো সময়ে তাদের স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি। অথচ অন্যদিকে তাতাররা একটানা চল্লিশ দিন মুসলিমদের জবাই করে রক্তনদী প্রবাহিত করেছে।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী এই বিষয়ের আলোচনা বেশি দীর্ঘ হয়ে গেছে। আবার লেখকের অন্য একটি বই 'মাফাহিম', যেটি রুহামা পাবলিকেশন থেকেই 'চিন্তার পরিশুদ্ধি' নামে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে হুবহু এই আলোচনাগুলোই বিস্তারিত এসেছে। এ জন্য আমরা এখানে বেশ কিছু অংশ বিয়োজন করেছি, তবে আলোচনার সারাংশ ঠিক রেখেছি। এই কাজটি কিতাবটির আরও কিছু জায়গায় আমরা সংগত কারণেই করেছি।

tauhiderdak.com

এই বাস্তবতা সত্ত্বেও এই ধরনের বিষয় দ্বারা আব্বাসিদের মতো বিশাল শাসনের পতন ঘটত না, যদি তারা সত্যিকার মুসলিম-রাষ্ট্রের মতো সচেতন থাকত। আল্লাহর শত্রুদের সন্ত্রস্ত করার জন্য শক্তি প্রস্তুত করা এবং ইসলামের শত্রুদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার মতো আদেশগুলো মান্য করত।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের (মুমিনদের) ছাড়া অন্যদের সাথে ঘনিষ্ঠতা করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে ত্রুটি করে না। তোমরা যাতে কষ্ট পাও, তারা তা-ই চায়। তাদের মুখের কথায় শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। আর তাদের মনে যা লুকিয়ে আছে, তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ পরিষ্কার করে দিলাম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।'[২১১]

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

'আর আপনার প্রতিপালক তো (তাঁর) বান্দাদের জন্য জুলুমকারী নন।'[২১২]

কিন্তু এত সমস্যাসহ রাষ্ট্রের পতন সত্ত্বেও এটা স্বয়ং মুসলিম উম্মাহর পতন ছিল না; যদিও উম্মাহ এতে সমস্যাসহ যুক্ত ছিল। কারণ প্রথমত, ইসলাম এই উম্মাহর মাঝে যে বিশাল উজ্জীবিত প্রেরণা দিয়েছে, তা তখনও শেষ হয়ে যায়নি। দ্বিতীয়ত, ইসলামি সঠিক আকিদা তখনও জীবিত ছিল; যদিও তাতে ধুলো জমেছিল। ফলে তা শুধু এমন কারও অপেক্ষায় ছিল, যিনি ধুলো সরিয়ে দেবেন; যাতে আবার তা নতুন করে শিকড় থেকে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

২১১. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১৮।
২১২. সুরা ফুসসিলাত, আয়াত নং ৪৬।

tauhiderdak.com

উসমানি শাসনামল

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রাণশক্তি উসমানি শাসনের জন্মের সময় এই উম্মাহ সর্বশক্তি ও পূর্ণ উদ্যম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, যেন উম্মাহর নব জন্ম হয়েছে।

দ্বীনের খিদমতের আগ্রহের সততা এবং এই পথে রক্ত ও সম্পদ ব্যয় করার দিক থেকে তাদের মাঝে আমরা তাবিয়িদের স্তরের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। দ্বীনের জন্য তাদের চেষ্টা ছিল সাহাবি ও তাবিয়িদের চেষ্টার পূর্ণতা। যারা উমাইয়া যুগে কুসতুনতুনিয়া জয়ের চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহ তাআলার মানদণ্ডে তাদের জন্য এটা যথেষ্ট যে, তারা ক্রুসেডার ইউরোপের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে এবং বিশাল ভূমিতে ইসলামের জয় এনে দিয়েছে। ফলে লক্ষ-কোটি মানুষ ইসলামে প্রবেশ করেছে।

আল্লাহ তাআলার মানদণ্ডে তাদের জন্য এটা যথেষ্ট যে, তারা একটানা পাঁচশ বছর মুসলিম-বিশ্বকে ক্রুসেড আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। যার ফলে ক্রুসেডাররা উসমানি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত বাইতুল মাকদিস দখলের জন্য প্রাচ্যের দিকে অভিমুখী হওয়ার দুঃসাহস করেনি।

আল্লাহ তাআলার মানদণ্ডে তাদের জন্য এটা যথেষ্ট যে, তারা অধঃপতনের সময়েও ইসলামি ভূমিতে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে বাধা দিয়েছে। যার ফলে খিলাফতের পতন পর্যন্ত এই বিদেশিরা তাদের জবরদখলের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

তেমনই তারা ইলম ও আলিমদের সম্মান করত, যা তাদের পাল্লায় যুক্ত হবে।

এসব কিছু আল্লাহর নিকট অনেক বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভয়াবহ সব বিচ্যুতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়; চাই তা রাষ্ট্রের হোক বা রাষ্ট্রের অধীনে পুরো উম্মাহর হোক। যা সময়ের সাথে সাথে খারাপ পরিণতি ডেকে এনেছে।

এটাই সর্বপ্রথম খিলাফাহ, যা আরবদের হাতে ছিল না। শুরুতে এই ব্যাপারটা কোনো প্রভাব ফেলেনি। যার কারণ ছিল, তাদের ইখলাস ও দৃঢ় সংকল্পের সততা। মুসলিম-বিশ্বকে একত্রিত করা এবং সবাইকে একক শক্তিশালী নেতৃত্বের অধীনে আনার কঠিন প্রচেষ্টা; যাতে আব্বাসি শাসনের শেষ যুগে উম্মাহ যে বিচ্ছিন্নতায় ভুগছিল, তা থেকে রক্ষা পায়।

tauhiderdak.com

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা প্রভাব ফেলতে থাকে। যখন আরবজাতি, যারা প্রায় নয়শ বছর ইসলামের প্রাণ ছিল, তারা নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। আর তাদের শাসকরা আরবি ব্যতীত অন্য ভাষায় সম্বোধন করতে থাকে, যে ভাষায় ইসলাম নাজিল হয়নি। ফলে এ নিঃসঙ্গতা উসমানি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থার পালাবদলে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে একসময় ধূর্ত শত্রুরা পুরো উম্মাহকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়ে যায়। আর এই বিভক্তি করার ক্ষেত্রে তারা 'আরব' ও 'তুর্কি' জাতীয়তাবাদকে নিকৃষ্টভাবে ব্যবহার করে।

উসমানি শাসনামলের আরেকটি সমস্যা ছিল সামরিক শাসন, যেখানে কিছুটা অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটা কখনো স্বৈরাচারের পর্যায়ে চলে যেত।

এটা সত্য যে, পূর্বেও রাজনৈতিক স্বৈরাচার হয়েছে। যা উমাইয়া যুগ থেকে শুরু হয়ে আব্বাসি যুগে বিদ্যমান ছিল। এটা শাসন কামড়ে ধরা শাসকদের একটি মূল বিচ্যুতি ছিল, যার মাধ্যমে তারা খিলাফতে রাশিদার পথ থেকে ছিটকে পড়ে। যাদের শাসনের ছায়ায় মানুষ সর্বোত্তম আল্লাহর ইনসাফের নিয়ামত ভোগ করেছিল।

তবে আমার মতে, উসমানি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার শুধু উমাইয়া ও আব্বাসিদের মতো কিছু ছিল না। তবে স্বয়ং উসমানি শাসনে আঞ্চলিক কারণে নিয়ন্ত্রণ ছিল একটু বেশি, যা সাধারণত আর্মিরা রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের পর করে থাকে।

রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার জন্য শক্তিশালী শত্রুদের মোকাবিলা করে ধ্বংস বা অনুগত করার প্রয়োজন ছিল উসমানি শাসনের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের একটি মূল কারণ। কিন্তু ইসলামি চেতনা কোনো অবস্থাতে স্বেচ্ছাচারিতাকে কোনো কারণেই বৈধতা দেয় না; বরং সর্ব হালতে শাসক ও জনগণের ওপর আল্লাহর ইনসাফ বাস্তবায়ন আবশ্যক করে।

এর সাথে যুক্ত হয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ত্রুটি, যা অবস্থাকে আরও খারাপ করে। রাষ্ট্রের যেকোনো অঞ্চলে স্বল্প সময়ের জন্য গভর্নর নিযুক্ত করা হতো। অধিকাংশ সময় তা হতো সর্বোচ্চ দুই বা তিন বছর। অতঃপর দায়িত্ব থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হতো।

এই নীতি দ্বারা রাষ্ট্রের অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য ছিল। আর সেটা হলো, সমস্ত ক্ষমতা খলিফার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা। গভর্নরদেরকে নিজের অঞ্চল নিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ না দেওয়া, যা আব্বাসি যুগের শেষ দিকে ঘটেছে এবং তা একসময় আব্বাসি শাসনকে বিক্ষিপ্ত করে পতনের দিকে নিয়ে যায়। এই নতুন ব্যবস্থা উসমানি রাষ্ট্রকে

tauhiderdak.com

তাদের অঞ্চলগুলোর ওপর দীর্ঘ সময় নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে। যার ফলে বন্ধু ও শত্রু সকলের মনেই সমানভাবে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা হয়।

তবে অন্যদিকে এই ব্যবস্থার কিছু ত্রুটি ছিল। কোনো কর্মকর্তা যদি পূর্ব থেকে জানে যে, সে তার পদে স্বল্প সময় থাকতে পারবেন, তখন তার পক্ষে জনগণের অধিকার ও ইনসাফ রক্ষার দিকে মনোযোগী থাকা সম্ভব হয় না। তবে যদি সে আলিমদের চরিত্র বা ফেরেশতাদের স্বভাবধারী হয়, তাহলে ভিন্ন কথা; বরং তার সার্বক্ষণিক চেষ্টা থাকে কীভাবে বড়ো পরিমাণ সম্পদ জমা করতে পারবে; যাতে বাকি জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাতে পারে।

এগুলো তো ছিল শাসকদের অপরাধের ফিরিস্তি। আর জনগণের অবস্থাও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত ছিল না।

এই উম্মাহর ওপর প্রদত্ত সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের দায়িত্ব শাসকরা বহু পূর্বেই ছুড়ে ফেলেছিল। যা উসমানি সামরিক শাসনের পরিবেশে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল না; বরং দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক ছিল।

তবে রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগত ও সামাজিক গণ্ডিতে ইমানের চাহিদামতে আমল করার অবস্থা অনেক ভালো ছিল, বিশেষত আব্বাসিদের শেষ যুগের তুলনায়। কারণ, তখন পুরো সমাজ ভেঙে যায় এবং চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে তারুণ্যে উদ্দীপ্ত হাতে নব জন্ম নেওয়া রাষ্ট্র, যাদের ছিল দৃঢ় সংকল্প, যা কোনো নতুন রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন, যারা শক্তিশালী শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে জমিনে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ ছাড়া ছিল সামরিক শাসিত রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ; এগুলো মানুষের মধ্যে ইসলামি চেতনার নিকটবর্তী চারিত্রিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে। যেখানে আব্বাসিদের ভোগবিলাস ও গাফিলতি তাদেরকে তা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু প্রতিটা শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়, জমিনে প্রতিষ্ঠিত সব শাসনই ঢিলে হয়ে যায়। অবস্থা যখন এমন দাঁড়ায়, তখন জীবিত ও মৃত পিরদের সাথে বহু রূপকথা ও ধারণাপ্রসূত বিষয় যুক্ত হয়। 'দ্বীনদারিতা' হয়ে যায় শুধু পিরের ওপর, তার কারামত, অবস্থা, গাইব জানার ক্ষমতা, ওষুধ ছাড়া রোগীকে সুস্থ করার ক্ষমতা, জাদু কাটা, শরীর থেকে জিন বের করার ক্ষমতায় বিশ্বাস করা। তেমনই তাদের কাছে দ্বীনপালন পরিণত হয় শুধু মাজার ও অলিদের সাথে সম্পর্ক, তাদের জন্য মান্নত ও কুরবানি করা। দ্বীনের সঠিক বিধানমতে আমল করা ব্যতীত জনগণের নিকট এটাই দ্বীন হয়ে

tauhiderdak.com

ক্ষয়। আল্লাহ তাআলার কিতাবে ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতে যা বর্ণিত হয়েছে, তা তারা ত্যাগ করে।

এভাবে ধীরে ধীরে জীবন থেকে দ্বীনের সত্যিকার উদ্দেশ্য হারিয়ে যায়। যেখানে শুধু কল্পিত আধ্যাত্মিকতা অবশিষ্ট থাকে, যা ভ্রান্তি ও সামাজিক প্রথার সাথে মিশ্রিত।

এ রাষ্ট্রে সামাজিক প্রথার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখানে তা উল্লেখ করা উচিত মনে করছি। তুর্কিরা এমন জাতি, যারা খুব শক্তভাবে সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাকে আগলে রাখে। এখানে একটি উদাহরণ বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হবে।

তুর্কিদের বাড়িঘরে সাধারণত কার্পেট বিছানো থাকে; এমনকি পুরো ঘরে কার্পেট না থাকলে সেখানে অন্তত এমন কিছু বিছানো থাকে, যা দ্বারা প্রতিটা কামরায় চলাচলের জায়গাগুলো সংযুক্ত থাকে। মুসলিম তুর্কি ঘরের রীতি ছিল প্রত্যেকে ঘরের বাইরে বা ঘরে ঢুকেই দরজার পাশে জুতো খুলে ফেলত। অতঃপর বাইরের জুতোর পরিবর্তে পরিষ্কার জুতো পরে নিত, যা দ্বারা ঘরের কার্পেটে হাঁটাহাঁটি করবে। আবার যখন টয়লেটে যেত, তখন টয়লেটের দরজার সামনে এই জুতোগুলো রেখে ভেতরে ঢুকে এমন কিছু পরে নিত, যা পানির জন্য উপযুক্ত। প্রয়োজন শেষে টয়লেট থেকে বের হয়ে প্রথমেই পা শুকিয়ে নিত, অতঃপর শুকনো জুতোগুলো আবার পরিধান করে ঘরে চলাচল করত।

নিঃসন্দেহে এটা ইসলামি রীতি, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হতো পুরো ঘর নামাজের জন্য পবিত্র রাখা। আর মুসলিমের ঘরে নামাজের স্থান থাকা একেবারেই স্বাভাবিক, যা ইসলামের আদেশ অনুযায়ী পবিত্র রাখতে হয়।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেক্যুলার তুর্কিতে কামালপন্থীরা সম্পূর্ণরূপে দ্বীন ত্যাগ করছে, তারা নামাজ-রোজা পড়ত না, দ্বীনে বিশ্বাস করত না; তবুও আপনি তাদের ঘরে সেই একই রীতি দেখতে পাবেন।

আমরা যখন এই জাতির সুদৃঢ় স্বভাব সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন আমাদের এটা বুঝে আসবে যে, কীভাবে এই জাতি দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামি প্রথা রক্ষা করেছে। তারা ব্যতীত অন্য কোনো জাতি; এমনকি আরবজাতির পক্ষেও তাদের মতো ইসলামি প্রথা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না; যার ফলে তারা শাসকজাতি বা শাসক রাষ্ট্রের জাতি হিসেবে পুরো মুসলিম-বিশ্বে দীর্ঘকাল যাবৎ এই রীতি প্রতিষ্ঠা রেখেছে।

tauhiderdak.com

কিন্তু শেষ দিকে এসে এগুলো ছিল শুধুই প্রথা, যাতে কোনো প্রাণ ও চেতনা ছিল না।

ইসলামি চরিত্র ও ইসলামি আচরণবিধি প্রথা ও ঐতিহ্যে পরিণত হওয়া ভালো বিষয়। কারণ, সমাজ ও নব প্রজন্ম যুগের পর যুগ তা আঁকড়ে রাখে। যেখানে তারা সহজেই তা গ্রহণ করে এবং কোনো কষ্টকর প্রচেষ্টা ছাড়া সরাসরি তা তাদের মাঝে চর্চিত হয়।

তবে এটা তখনই উত্তম হবে, যদি এতে মূল ইমানি চেতনার অস্তিত্ব থাকে। যা থেকে এই প্রথা উৎসারিত হয়েছে এবং এর বাস্তব নমুনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু যদি এই চেতনা অবশিষ্ট না থাকে এবং মূল ইমান হারিয়ে যায়, যা থেকে সর্বপ্রথম এই প্রথার উৎপত্তি হয়েছে, তখন এই প্রথা শুধু ঐতিহ্যরূপে পালিত হয়; তখন এসব প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যদি এর সাথে শক্তিশালী কিছু এসে সংঘাতে লিপ্ত হয়। কারণ, যুদ্ধে মূলত প্রথা দ্বারা লড়াই হয় না; বরং প্রথার পেছনে সুপ্ত চেতনাই থাকে মূল শক্তি। তাই যদি মূল চেতনা হারিয়ে যায়, তবে অটল থাকতে পারবে না।

তাই আমরা যখন দেখি, (সামনের অধ্যায়ে আলোচিত হবে) এসব ঐতিহ্য একের পর এক বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যখন শত্রুরা পরিকল্পিতভাবে এর ওপর চিন্তাযুদ্ধের হাতিয়ার দ্বারা আক্রমণ করেছে। মুসলিম-বিশ্বের সমস্ত দেশ এই যুদ্ধে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় অবিচল থাকতে সক্ষম হয়নি।

বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি, প্রসিদ্ধ 'তুর্কি হিজাব'।

এই হিজাব ছিল সম্পূর্ণ ইসলামি একটি বিধান[২১৩]। তুর্কিরা ইসলামের মাধ্যমে এর ব্যাপারে জানতে পারে। অর্থাৎ তারা এটা সেই জাতি থেকে গ্রহণ করেছে, যাদের থেকে তারা ইসলাম শিক্ষা করেছে। যেকোনোভাবেই হোক, মুসলিম-বিশ্বে দীর্ঘ সময় যাবৎ এই পর্দার বিধান পালিত হয়ে আসছিল।

কিন্তু পূর্বে বর্ণিত বিচ্যুতিগুলোর ফলে মুসলিম-বিশ্বে যখন সত্যিকার ইসলামি চেতনা হ্রাস পায়, তখন হিজাব শুধু প্রথা হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। যা খুব

.....

২১৩. মূর্খরা এটা নিয়ে চ্যাঁচামেচি করে যে, হিজাব ইসলামি কিছু নয়; বরং এটা হলো বেদুইন আরবের প্রথা, মুসলিমরা তাদের ইসলামের পরেও বংশপরম্পরায় তা আগলে রেখেছে শুধু। এই কুযুক্তির মাধ্যমে তারা ইসলামের বাস্তব ঘটনা অস্বীকারের দুঃসাহস করে। আয়িশা ﵂ বলেছেন, 'আনসারি নারীদের আল্লাহ রহম করুন। হিজাবের আয়াত নাজিলের পর তাঁরা সবাই নিজেদের কাপড় তুলে নিয়ে মাথা ও চেহারায় প্যাঁচিয়ে নেয়।' সুতরাং তা ইসলামপূর্বে প্রচলিত কোনো প্রথা ছিল না; বরং আল্লাহ তাআলা এই আদেশ দিয়েছেন, যা মুসলিমরা বাস্তবায়ন করেছে।

tauhiderdak.com

কঠিনভাবে পালিত হতো। পুরো মুসলিম-বিশ্বের কোনো নারী যদি তা ছেড়ে দেওয়া ও বিরুদ্ধাচরণের দুঃসাহস দেখাত, তবে তাকে চরিত্রহীন ভ্রষ্টা নারী গণ্য করা হতো।

সামাজিক প্রথা হিসেবে কঠোরভাবে পালিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমারা যখন বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন শুরু করে, নারী-স্বাধীনতা ও পর্দা ত্যাগ করা, নারীদেরকে রাস্তায় বের হয়ে আসার প্ররোচনা দেয়, তখন তা অর্ধ শতাব্দীও টিকে থাকতে পারেনি। মুসলিম-বিশ্বের নারীরা পর্দাহীন, কাপড় পরেও উলঙ্গ, পুরুষকে আকৃষ্টকারী হয়ে ঘরের বাইরে বের হয়ে আসে। যে বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ হাজার বছরেরও অধিক পূর্বে বলে গেছেন।

কারণ, হিজাব তখন শুধুই একটি প্রথা হিসেবে ছিল। প্রথা হিসেবেই এটা পালিত হতো, হিজাবের বিধানের মূল বিশ্বাসগত সচেতনতা ও জীবন্ত ইমান থেকে নয়।

আপনি সেই অবস্থার সাথে বর্তমানের বিশ্বাস ও চেতনাসহ পর্দাকারী মেয়েদের তুলনা করুন। বর্তমান জাহিলিয়াত তার সর্বশক্তি নিয়ে তাদেরকে নিন্দা ও বিদ্রুপ করছে, কখনো জেল ও শাস্তির মাধ্যমে বাধা দিচ্ছে। তবুও কি তারা পর্দা খুলে ফেলেছে? বা অবাধ্য নারীদের ডাকে সাড়া দিয়েছে, যারা তাদের এটা খুলে ফেলতে বলছে?

এটা হচ্ছে আকিদা থেকে উৎসারিত আচরণ ও প্রথা থেকে উৎসারিত আচরণের মাঝে পার্থক্য। আপনি এভাবে ইসলামের অন্যসব বিষয় পরিমাপ করুন।

যখন আপনি বুঝবেন, এখন পুরো ইসলাম——এমনকি ইবাদত ও আচরণ সব শুধু প্রথায় পরিণত হয়েছে। যা পালিত হয় শুধু প্রথা হিসেবে; কিন্তু বাস্তবে তা ইমানি চেতনাহীন, তখন আপনি অনুধাবন করতে পারবেন, কীভাবে উম্মাহর অধঃপতন হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পূর্বের পাতাগুলোতে এই উম্মাহর প্রায় চোদ্দোশ বছরের ইতিহাস দ্রুততার সাথে শুধু ইঙ্গিত দিয়ে গেছি। এত দ্রুত পাঠ করার দ্বারা আসলে ঘটনাপ্রবাহের সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে না। কেননা, কোনো ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। বা আমরা এখানে যেমন বলেছি, তেমন একধারায় এগিয়ে চলে না; বরং সব ঘটনা পরস্পর সংযুক্ত অবস্থায় মানবজীবনে ঘটে এবং তাদের সমাজ ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে এর প্রভাব ফেলে। যার ফলে ফলাফল শুধু একটি কারণের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয় না, তা যতই শক্তিশালী হোক। অথবা আলাদাভাবে সব ঘটনার দিকেও করা যায় না।

tauhiderdak.com

তেমনিভাবে ঐতিহাসিক বাস্তবতা অনেক ধীর গতিতে চলে এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল ও পরস্পর অনুপ্রবেশকৃত অবস্থায় থাকে। যেখানে ঘটনাবলি আমরা এখানে যেভাবে চিত্রায়িত করেছি, তেমন সমান্তরাল ধারায় চলে না; বরং রেখাগুলো প্যাঁচ লাগানো ও একটা অপরটার মধ্যে প্রবেশকৃত থাকে। কোনোটা দ্রুত চলে, আবার অন্যটা একটু ধীরে চলে। কখনো থেমে যাওয়ার মতো মনে হয়, আবার একসময় চলা শুরু করে। সর্বশেষ আমাদের সামনে এমনভাবে ফলাফল দেখায়, কেমন যেন এটাই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। অথচ কখনো তা হয় শুধু চলার পথের একটি ধাপ, যার পর আবার নব উদ্যমে চলা শুরু করবে।

মোটকথা, বাস্তব চিত্র আমরা যেভাবে উপস্থাপন করেছি, তেমন নয়। তবে আলোচনার প্রয়োজনার্থে ও সংক্ষিপ্তকরণের স্বার্থে আমরা তা করেছি।

আলোচনার প্রয়োজনার্থে ইতিহাসের রেখাগুলো বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রতিটা নিয়ে এককভাবে আলোচনা হয়, কেমন যেন এটাই ছিল বাস্তবতা। আর সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনে আমরা ভাসমান রেখা চিত্রায়িত করি। আর ভুলে যাই, চূড়ান্ত ফলাফলের পেছনে এটা একমাত্র কারণ ছিল না; বরং এর পাশে আরও বহু রেখা ছিল। বহু সুপ্ত চ্যানেল ছিল, যা এগুলোর মাঝে সংযুক্ত করেছে। প্রকাশ না হয়ে এসবের সম্পর্ক দৃঢ় করেছে।

আমরা মূলত পূর্বের পাতাগুলোতে মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস লিখিনি; এমনকি এর বিচ্যুতির ইতিহাসও নয়; বরং আমরা নির্দিষ্ট রেখা চিহ্নিত করেছি, নির্দিষ্ট অবস্থা দেখিয়ে দিয়েছি। মনে করি এটা চিত্রের মাঝে স্পষ্ট। আমরা এই সুতোকে প্যাঁচ লাগানো বান্ডিল থেকে বের করেছি। অতঃপর নাম দিয়েছি, ভ্রষ্টতার গতিপথ।

বিষয়টা যা-ই হোক, অনেকগুলো ভ্রষ্টতা একত্রিত হয়ে পরস্পর প্রতিক্রিয়া করেছে। ফলে সর্বশেষ অধঃপতন ঘটেছে। সর্বোচ্চ চূড়া থেকে সর্বনিম্ন গর্তে, দীর্ঘ পথ, যা মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

সেই সোনালি যুগে সর্বোচ্চ চূড়ায় বাসকারী কোনো ব্যক্তি কি বিশ্বাস করবে যে, তাদের ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের পক্ষে এতটা গর্তে পতিত হওয়া সম্ভব? আবার বর্তমান-প্রজন্মের এই গহিন গর্তে বাস করছে এমন কেউ কি বিশ্বাস করবে যে, তারা ইতিহাসের এই সোনালি প্রজন্মের পরবর্তী প্রজন্ম?!

কেমন যেন দুটো ভিন্ন প্রজন্ম, যাদের মাঝে কোনো সামঞ্জস্যতা নেই।

tauhiderdak.com

অধঃপতনের পদরেখা

পূর্বের অধ্যায়ের শেষে আমরা উম্মাহর জীবনের শেষ দিকের বিচ্যুতির দীর্ঘ রেখার দিকে সামান্য ইঙ্গিত করেছি। আমরা এখানে উম্মাহর জীবনের শেষ দুই শতাব্দী, বিশেষ করে শেষ শতাব্দীর আলোচনা একটু বিস্তারিত করতে চাই। যা একদিকে এটা বর্ণনা করবে, কীভাবে আমরা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছি। অন্যদিকে এই আলোচনা থেকে আমাদের সামনে বর্তমান বাস্তবতার মূল বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনগুলো স্পষ্ট হবে। যাতে আমাদের জন্য পরবর্তী সময়ে মুক্তির পথ বের করা সহজ হয়।

১. বিশ্বাসগত অধঃপতন

আমরা যখন শেষ দুই শতাব্দী এবং বিশেষ করে শেষ শতাব্দীর দিকে তাকাই, তখন দেখি, মুসলিমদের হৃদয়ে সত্যিকার ইসলামের ব্যাপারে অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছে। তারা বাস্তব জীবনে ইসলাম থেকে বহু দূরে। অর্থাৎ চিন্তাগত ভ্রান্তি ও আচরণে দ্বীন থেকে বিচ্যুতি।

পূর্বযুগে আচরণগত বিচ্যুতি ছিল। যা উম্মাহর ওপর ভয়ানক সব বিপদ টেনে এনেছে। যেমন একদিকে তাতার বাহিনী এসে খিলাফত ধ্বংস করে দিয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিম থেকে ক্রুসেড বাহিনী ইসলামের নুর নিভিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু তখন তাদের চিন্তাধারা শুদ্ধতার নিকটবর্তী ছিল। কারণ, আকিদাগত ভ্রষ্টতা অনেক সীমিত পরিসরে ছিল। যদিও ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছিল, তবে সামগ্রিক উম্মাহর তুলনায় তা ছিল অনেক স্বল্প।

কিন্তু যখন চিন্তাধারা-বিকৃতি বিস্তৃত হয়ে এটাই সমাজের মূল বিষয়ে পরিণত হয়, তখন অবস্থা পালটে যায়। তখন শুধু আচরণগত বিচ্যুতি একমাত্র কারণ ছিল না যে, একটা উৎসাহমূলক ভাষণ বা মর্মস্পর্শী ওয়াজে অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে; বরং অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, প্রথমে চিন্তাধারা পরিশুদ্ধ করার জন্য বিশাল মেহনত করতে হবে, অতঃপর আমল ঠিক করতে হবে। অথবা একই সাথে দুটোকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। যা কোনোভাবেই সহজ কোনো কাজ নয়।

tauhiderdak.com

চিন্তাধারা এমনভাবে নষ্ট হয় যে, তাদের আচরণের কিছুই আর আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীন যেভাবে নাজিল হয়েছে, তেমন ছিল না।

যে প্রজন্মের ওপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নাজিল হয়েছে এবং তাঁরাই প্রথম ইমান এনেছে, তাঁদের কাছে এই কালিমা ছিল এত বিশাল বস্তু, যা মানুষের সম্পূর্ণ অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে এবং এর পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বাস্তবতা জন্ম দেয়।

এটা ছিল পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা জীবনের সকল দিক ও ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ, জীবনের ছোটো কিংবা বড়ো কোনো কিছুই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও এর দাবি থেকে বাইরে নয়। কালিমার দাবি হলো, আল্লাহর নাজিলকৃত সবকিছুর সামনে আত্মসমর্পণ করা এবং সাধ্যানুযায়ী আমল করা।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا

> 'অতএব যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করো, (তাঁর কথা) শোনো এবং আনুগত্য করো।'[২১৪]

এই কালিমার প্রভাব তাঁদের হৃদয়ের ওপর এতটা বিশাল ছিল যে, কেমন যেন তা নতুন হৃদয়ে পরিণত হয়েছে, যার পূর্বে কিছুই ছিল না। এর পাশাপাশি বাস্তব জীবনে এমন পরিবর্তন হয়েছে, যেন তা নতুন জীবন, যেখানে অতীতের কিছুই নেই; এমনকি তাঁদের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়াও পালটে যায়। প্রতিটার পেছনে নতুন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, যা পূর্বে ছিল না। ফলে এগুলো প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা পূর্বে ছিল না।

এমনকি জাহিলি জীবনের যে স্বল্প কিছু অবশিষ্ট ছিল এবং ইসলাম তা মেনে নিয়েছিল, সেগুলো জাহিলি যুগের অবস্থায় ছিল না; বরং মূল থেকে পরিবর্তন করে ফেলে; যদিও বাহ্যিক সুরতে সাদৃশ্য ছিল। কেমন যেন ইসলামের সাথে এর নব জন্ম হয়েছে।

সাহসিকতার গুণ জাহিলি যুগেও ছিল, যা ইসলাম এসে মেনে নিয়েছে; বরং উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু এটা কি সেটাই ছিল? কখনোই না। কেননা, জাহিলিয়াতের সাহসিকতা ছিল শুধু অন্ধ আবেগ, যা ইসলাম প্রচণ্ডভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

২১৪. সুরা আত-তাগাবুন, আয়াত নং ১৬।

tauhiderdak.com

'যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম-অহমিকা পোষণ করেছিল—জাহিলি যুগের অহমিকা...।'[২১৫]

ইসলাম আহ্বান করেছে সত্যিকার মৌলিক বীরত্বের দিকে। তা হলো, সত্যের জন্য সাহস, বাতিলের জন্য আবেগ নয়। শুধুই আল্লাহর পথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য, প্রসিদ্ধি পাওয়া বা লোক-দেখানোর জন্য নয়।

দানশীলতার গুণ জাহিলি যুগে ছিল এবং ইসলাম এসে তা গ্রহণ করেছে; বরং উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে ইসলামে তা ছিল মৌলিকভাবে ভিন্ন জিনিস; যদিও বাহ্যিকরূপে তা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। জাহিলিয়াতে তা ছিল শুধুই লোক-দেখানোর জন্য, যা ইসলামে কঠিনভাবে ঘৃণিত—

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

'যে লোক-দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে না, তার উদাহরণ দেওয়া যায় একটি মসৃণ পাথরের সাথে, যার ওপর কিছু মাটি ছিল, তারপর ভারী বৃষ্টি পাথরটিকে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। তারা যা উপার্জন করেছে, তা দিয়ে কিছুই করতে পারছে না। আল্লাহ অবিশ্বাসী লোকদের পথ দেখান না।'[২১৬]

কিন্তু ইসলামে তা খালিস পবিত্র দানশীলতা, যা দ্বারা শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশা করা হয়। মানুষের আলোচনায় আসার জন্য নয়—

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

'তারা খাদ্যের প্রতি ভালোবাসা সত্ত্বেও (বা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায়) মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। (বলে,) "আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের খাওয়াই, (এ জন্য) তোমাদের কাছ

২১৫. সুরা আল-ফাতহ, আয়াত নং ২৬।

২১৬. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২৬৪।

tauhiderdak.com

থেকে কোনো প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না।'[২১৭]

এভাবেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' প্রথম প্রজন্মের জীবনে সবকিছু পালটে দেয়। তাঁদের জীবনে নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করে, যা তাঁদের হৃদয়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কেননা, এই কালিমাই তাঁদের হৃদয় ও বাস্তব জীবনকে পালটে দিয়েছে।

কিন্তু যুগ যুগ ধরে ধারাবাহিকভাবে মানুষের মাঝে এই কালিমার প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। মানুষের মন ও বাস্তব জীবনে এর কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। একসময় তা শুধু মুখে উচ্চারণের বাক্যে পরিণত হয়, যে অনুযায়ী আমল করা হয় না। ফলে এই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও জীবন তার নিজ গতিতে চলতে থাকে। কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যেমন কেউ পানির ঢল আটকানো বা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বাঁধ তৈরি করল; কিন্তু সেই বাঁধে বহু ফাটল আছে, তাই তা দাঁড়িয়ে থাকলেও কোনো ফায়দা দেয় না। পানি তার আপন স্রোতে চলতে থাকে, যেন বাঁধের কোনো অস্তিত্ব নেই। অথবা জাল নোটের মতো, যেখানে আসল নোটের মতো সব থাকে; কিন্তু মালিককে কোনো ফায়দা দেয় না। ভাগ্য ভালো থাকলে কিল-ঘুষি না খেলেও এটা দিয়ে বাজার থেকে কিছুই কিনতে পারবে না। কেননা, এটা মূল্যহীন কাগজ।

প্রথম প্রজন্মের কাছে দ্বীন ছিল তাঁদের জীবনের সবকিছুকে অন্তর্ভুক্তকারী, যেভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ

'বলুন, "আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই।"'[২১৮]

তাঁদের নিকট দ্বীন শুধু নামাজ-রোজা-জাকাত-হজের আনুষ্ঠানিক ইবাদতে সীমাবদ্ধ ছিল না, যেখানে মানুষ এক পর্বের পর পরবর্তী পর্বের মাঝে কোনো ইবাদত করবে না; বরং তাঁদের পুরো জীবন ছিল ইবাদত এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমলের দ্বারা আল্লাহর জিকির ও স্মরণ। নিরবচ্ছিন্ন এক কাজ।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

২১৭. সুরা আদ-দাহর, আয়াত নং ৮-৯।

২১৮. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ১৬২-১৬৩।

tauhiderdak.com

'যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।'[১১৯]

তাই তাঁদের হৃদয় সর্বদা আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকত। তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ইবাদত। তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যসহ কোনো কাজে এক মুহূর্তের জন্যও এটা মনে হতো না যে, তাঁরা ইবাদতের বাইরে রয়েছে। তাই তাঁদের উচিত নয় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হওয়া। তাঁদের উচিত নয় ধোঁকা দেওয়া বা মিথ্যা বলা বা মানুষকে ঠকিয়ে অতিরিক্ত লাভ করা।

অবসর সময়েও তাঁদের মনে এই ধারণা আসেনি যে, তাঁরা এখন ইবাদতের বাইরে। তাই তখনও তাঁদের কর্তব্য হলো, অশ্লীলতা, রং-তামাশা, আল্লাহর অবাধ্যতা না করা এবং আবার ইবাদতের সময়ে আল্লাহর জিকিরে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর বিধানাবলি ভুলে না যাওয়া।

মোটকথা, তাঁদের জীবনে আক্ষরিক অর্থে ইবাদত ও মুআমালা (আচার-আচরণ) এমন কোনো ভাগ ছিল না; বরং সবই ছিল বিভিন্ন ধরনের ইবাদত। এর মধ্যে কিছু হলো নির্দিষ্ট সময়মতো ফরজ আনুষ্ঠানিকতা। আর কিছু হলো উন্মুক্ত, যা মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, চারিত্রিক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতিসহ সব কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অর্থাৎ সবই ইবাদতের গণ্ডির ভেতর রয়েছে, যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয় এবং আল্লাহর বিধান মান্য করতে হয়।

তেমনই তাঁদের কাছে জীবনের কিছু সময় নিজের জন্য ও কিছু সময় রবের জন্য ছিল না; বরং দুই সময়ই ছিল আল্লাহর জন্য। কারণ, দুটোই জীবনের সময়। আর পুরো জীবনটাই আল্লাহর জন্য।

সাহাবা-প্রজন্ম ইবাদতের যে মর্ম বুঝেছেন, তা ছাড়া কি ভিন্ন কোনো অর্থ আছে?

মুআমালা বা আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মান্য করা কি এমন কিছু, যা তাঁরা নিজ থেকে এ দ্বীনে সংযুক্ত করেছেন? ইসলামের আদব ও আখলাক সর্বদা—এমনকি অবসর সময়েও মান্য করা কি নিজেদের পক্ষ থেকে দ্বীনে বৃদ্ধি করেছেন?

নাকি এটাই ছিল দ্বীন, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন?

.....

১১৯. সূরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৯১।

tauhiderdak.com

বেচাকেনা ও ব্যবসায় সততা ও আমানতদারিতা, ওয়াদা রক্ষা করা, যেকোনো কাজে একনিষ্ঠতা ও দক্ষতা, আচরণে শৃঙ্খলা এবং আদব-আখলাক ও শালীনতা রক্ষা করা এ সবকিছু কি তাঁরা নিজ থেকে আবিষ্কার করেছেন, অতঃপর অতিরিক্ত নফল কাজ হিসেবে পালন করেছেন?

হ্যাঁ, তাঁদের স্বেচ্ছায় আমলের অনেক ক্ষেত্র ছিল। যেমন তাঁরা নফলকে এমনভাবে আদায় করেছেন, যেন তা ফরজ। এর মাধ্যমেই মূলত তাঁরা এত উঁচু স্তরে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। তবে পুরো জীবনকে ইবাদত গণ্য করা, যাতে মানুষ আল্লাহ তাআলার বিধান মান্য করবে এবং সবকিছু আল্লাহর জন্য করবে, এটা কি নিজেদের পক্ষ থেকে ছিল? না এটা আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের বাস্তবায়ন ছিল—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ

'বলুন, "আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই।"'[২২০]

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

'যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।'[২২১]

যদি সততা আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্ব হয়, যদি আমানত রক্ষা আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্ব হয়. যদি ওয়াদাপূরণ আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্ব হয়... তাহলে এগুলো ইবাদতের ভেতরে নাকি বাইরে, ইবাদতের অতিরিক্ত?

কীভাবে এগুলো ইবাদতের বাইরে বা অতিরিক্ত হতে পারে; অথচ আল্লাহ তা সবচেয়ে শক্তিশালী শব্দ দ্বারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, মানুষকে শুধু ইবাদতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ইবাদতের বাইরে বা অতিরিক্ত কিছুর আদেশ তিনি দেননি।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'জিন ও মানুষকে আমি শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[২২২]

.....

২২০. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ১৬২-১৬৩।

২২১. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৯১।

২২২. সুরা আজ-জারিয়াত, আয়াত নং ৫৬।

tauhiderdak.com

যদি মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হয় ইবাদত করা, তাহলে কি কোনো একটি দায়িত্বও ইবাদতের গণ্ডির বাইরে থাকা সম্ভব? অন্যথায় আল্লাহর এই বাণীর মর্ম কী হবে, যেখানে তিনি নিশ্চিত করে বলেছেন যে, মানুষকে অন্যকিছু নয়; বরং শুধুই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর বুঝ ছিল সত্য ও সঠিক বুঝ। এই বুঝের আঙ্গিকে তাঁদের আচরণ ছিল সত্যিকার আমল।

শেষ প্রজন্মে ইসলামের সঠিক মর্ম ও বুঝ নষ্ট হয়ে গেছে। যা একেবারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও ইবাদতের মর্ম থেকে শুরু হয়েছে। যেখানে তাকদির ও ফায়সালার বুঝ বা দুনিয়া-আখিরাতের সঠিক মর্ম বা দুনিয়াকে আল্লাহর আদেশের আঙ্গিকে আবাদ করার বুঝ রয়েছে। এখান থেকে সারমর্ম হিসেবে আমরা একটা বাস্তবতা বের করতে পারি, যাকে আমরা নাম দিতে পারি, উম্মাহর জীবনে বিশ্বাসের পতন, যার সাথে রয়েছে সত্যিকার ইসলাম থেকে আচরণগত অধঃপতন।

দুটোই সর্বোচ্চ ক্ষতিকর। তবে নিঃসন্দেহে বেশি ক্ষতি বিশ্বাসের পতনে হয়েছে। কারণ, এটা একদিকে আচরণগত পতনের পথ সুগম করেছে, অন্যদিকে এর সমাধানে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাই যখন আকিদা শুদ্ধ হবে, তখন আমলের ক্ষেত্রে ঘাটতি শুধু মানুষের স্বভাবগত দায়িত্বে অবহেলার প্রবণতা থেকে জন্ম নেবে। যার সমাধানের জন্য শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে। কেননা, এটা দায়িত্ব ভুলে যাওয়ার অবহেলার আল্লাহ-প্রদত্ত সমাধান। কিন্তু যদি মূল রোগ হয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভ্রষ্টতা, তাহলে শুধু দ্বীনের কথা স্মরণ করানো যথেষ্ট হবে না। কেননা, তখন অন্তর তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করবে না। তাই তখন স্বয়ং অন্তরকে রোগমুক্ত করতে হবে।

এই বিশ্বাসের অধঃপতন ও ভ্রষ্টতা, যা উম্মাহর জীবনে শিকলের মতো প্যাঁচিয়ে গেছে, তা শেষ কয়েক শতাব্দীতে সর্বোচ্চ স্তরে চলে গেছে। যখন থেকে হিংস্র ক্রুসেডারদের হাতে আল্লাহর শরিয়াহর শাসন-কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। তবে আমরা ইতিহাসের পাতাগুলো দ্রুত উলটিয়ে যেতে চাই না; বরং আমরা শেষ যুগের ইতিহাস একেক ধাপ করে অনুসন্ধান করতে চাই; যাতে সেই মাপকাঠি নির্ধারণ করতে পারি, যা দ্বারা এই উম্মাহর জীবনের দ্বীন থেকে পিছিয়ে যাওয়াটা পরিমাপ করতে পারি।

মাপকাঠি তো নিঃসন্দেহে কুরআন ও সুন্নাহ। যা মুসলিমদের জীবনের সকল বিষয়ের নির্দেশনার উৎস।

tauhiderdak.com

তেমনই আরেকটি মাপকাঠি হলো, প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের জীবন। যাঁরা নিজেদের জীবনে এই দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করেছেন এবং ইমানের দাবিগুলো চিন্তা-বিশ্বাস ও আচরণ সর্বক্ষেত্রে মান্য করেছেন।

তাই আমরা যত কুরআন ও সুন্নাহ এবং সালাফে সালিহিনের জীবনের নিকটবর্তী হব, আকিদা-বিশ্বাসে (তেমনই আমলে) তত অগ্রগামী হব। আর আমরা যত কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের জীবন থেকে দূরে সরব, তখন আকিদা-বিশ্বাস ও আমলে তত অধঃপতিত হব।

এটাই হলো প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব মূলনীতি, যা আমাদের কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়; চাই আমরা অধঃপতনের ধারা ও প্রভাব নিয়ে অধ্যয়ন করি, আর চাই মুক্তির পথ অনুসন্ধান করি। এ ছাড়াও সর্বত্র আমাদের এই মূলনীতি মান্য করতে হবে; যাতে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হই।

tauhiderdak.com

২. জ্ঞান, সভ্যতা, অর্থনীতি, সামরিক, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক পতন

আকিদা-বিশ্বাসের পতন থেকেই মুসলিম-বিশ্বের অন্যসব ধরনের অধঃপতন ঘটেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, অর্থনীতি, সামরিক, চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক পতন।

ইউরোপের ইতিহাসে যখন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক চলছিল, যে সময় পশ্চিমারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি করে ক্ষমতার আসনে উঠে বসেছে, ইউরোপ ততদিনে বর্বর মধ্যযুগের প্রভাব কাটিয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষেত্রে শক্তিশালী কার্যক্রম (মুসলিম-বিশ্ব থেকে আহরিত জ্ঞান ও সভ্যতার মাধ্যমে) শুরু করে; যদিও তারা আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে ছিল একেবারে মিসকিন।

অন্যদিকে মুসলিম-বিশ্ব সেই সময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। তাই ইউরোপ যখন সর্বশক্তিতে উন্নতি করছিল, মুসলিম-বিশ্ব তখন অধঃপতিত হচ্ছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশাল শূন্যতা তৈরি হয়। শিক্ষাকেন্দ্রগুলো থেকে সব 'দুনিয়াবি' বিদ্যা সরিয়ে দেওয়া হয়।

পূর্বে বলেছি, ইসলামি জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য ছিল, এটা সমস্ত জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় এবং সকল বিদ্যায় নতুনত্ব আনে। তাদের শিক্ষাকেন্দ্রে একজন আলিম শরয়ি ইলমের পাশাপাশি চিকিৎসা বা সৌরবিদ্যা বা পদার্থ বা রসায়ন শিক্ষা করত, কোনো বৈপরীত্য বা একটি অপরটিকে হ্রাস-বৃদ্ধি করা ব্যতীতই। আন্দালুসিয়া-সহ মুসলিমদের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র থেকে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিদ্যা অর্জন করেই ইউরোপ তাদের মধ্যযুগ থেকে বের হওয়া শুরু করে। সেসব শিক্ষাকেন্দ্রে শরয়ি ইলমের পাশাপাশি দুনিয়াবি জ্ঞানও সিলেবাসভুক্ত মৌলিক বিষয় ছিল। এখান থেকেই ইউরোপ বিজ্ঞানের পরীক্ষা-পদ্ধতি শিখে এবং চিকিৎসা, সৌরবিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও আলোকবিজ্ঞানে মুসলিমদের লিখিত বইগুলো অনুবাদ করে, যার ভিত্তিতে তাদের আধুনিক উন্নতির ভিত গড়ে তোলে।

tauhiderdak.com

অথচ গাফিল মুসলিমরা এসব বিদ্যা ধীরে ধীরে তাদের শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সরিয়ে শুধু শরয়ি ইলমে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।[২২৩]

আস্তে আস্তে মুসলিমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুভূতি হারিয়ে ফেলে; ফলে তারা সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়, যেখানে তারাই একদিন মূল উৎস হিসেবে গণ্য ছিল। যেদিন এই উম্মাহই দুনিয়ার একমাত্র জ্ঞানী জাতি ছিল, আর ইউরোপীয়রা তাদের থেকে জ্ঞান শেখার জন্য তাদের পেছনে ছুটোছুটি করত।

.....

২২৩. কিছু বিষয় এখানে স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি। মুসলিমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানবীয় পার্থিব জ্ঞানসমূহকে তাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সরায়নি; বরং এখানে উপনিবেশের দায় আছে। উপনিবেশ আমলে দ্বীনি শিক্ষাব্যবস্থাকে কোণঠাসা করে ইউরোপীয় সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার ফলে এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত মুসলিমদের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা ছিল দ্বীনবান্ধব ও সামগ্রিক। সেখানে শরয়ি ইলমের বিভাগসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য মানবীয় জ্ঞানসমূহের বিভাগও ছিল। নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্বীনি ইলম হাসিল করা ছিল সবার জন্য আবশ্যক। আবশ্যকীয় দ্বীনি ইলম হাসিলের পর ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয় নির্বাচন করে তাঁর শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যেত। কেউ শরয়ি ইলমের কোনো শাখাকে বেছে নিত। আবার কেউ পার্থিব কোনো শাস্ত্রকে বেছে নিত। তবে এই মানবীয় পার্থিব বিদ্যার সিলেবাসও ছিল দ্বীনি বান্ধব ও দ্বীনি মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা ছাড়া আপনি ইতিহাসের যত পেছনে যাবেন, তাত্ত্বিক জ্ঞানশাস্ত্রের শাখা তত কমতে থাকবে। তখন জ্ঞানশাখাই ছিল খুব স্বল্প। আবার কারিগরি ও ব্যবহারিক আবিষ্কারের আধিক্য ছিল বেশি। সুতরাং এই পয়েন্টটাও মাথায় রাখা জরুরি।

বর্তমানে অনেকে দ্বীনি মাদারিস ও আলিমদের নিন্দা করেন এই কথা বলে যে, আগেকার যুগের সকল আলিম দ্বীনি ও দুনিয়াবি উভয় জ্ঞানেই পারদর্শী হতেন, এটা ইতিহাসের একটা খণ্ডিত বয়ান ও অশুদ্ধ বয়ান। কিছু আলিম এমন ছিলেন, বাকি এটা সামগ্রিক রূপ ছিল না; বরং স্বাভাবিকভাবে যে যেই ধারার শিক্ষাকে নির্বাচন করত, সে ধারাতে পারদর্শিতা অর্জন করত। আর এটাই মূলত শাস্ত্রীয়ভাবে সঠিক নীতি। হ্যাঁ বিরল কিছু লোকের জন্য উভয় ধারার জ্ঞান অর্জন সম্ভব হতে পারে। আমার এই দাবির যথার্থতা পাবেন শরয়ি ইলমের জ্ঞানতাত্ত্বিক যেই সিলসিলা, সেখানে দৃষ্টিপাত করলে। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক সিলসিলায় যাদেরকে আপনি অথোরিটি হিসেবে দেখবেন, যাদের বক্তব্য ও লিখনীকে এই সিলসিলার রচনাভান্ডার হিসেবে পাবেন, তাদের অধিকাংশকেই আপনি মানবীয় পার্থিব কোনো শাস্ত্রের অথোরিটি হিসেবে পাবেন না। আবার মুসলিম ইতিহাসে মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাদেরকে অথোরিটি ও উদ্ভাবক হিসেবে পাবেন, শরয়ি জ্ঞানের সিলসিলায় তাদেরকে অথোরিটি হিসেবে পাবেন না। এটাই স্বাভাবিক চিত্র। এ জন্য এই ধরনের বক্তব্য এনে আলিমদের দোষারোপ করা একটি অপরাধমূলক কাজ। সমস্যা এখানে নয় যে, আলিমরা সব শাস্ত্রে পারদর্শী হচ্ছে না। সমস্যা হলো শিক্ষাব্যবস্থায়, সমস্যা হলো আমাদের জেনারেল কারিকুলাম দ্বীনবান্ধব নয়। যেখান থেকে মুসলিমঘরের সন্তানরা মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার, মুসলিম ডাক্তার হিসেবে বের হবে। কোনো সেক্যুলার, লিবারেল দ্বীনহীন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নয়। সমস্যা হলো, দুই ধারার সমন্বিত এমন শিক্ষাব্যবস্থার অভাব, যেখানে শরয়ি ইলমের শাখাগুলোর সাথে সাথে মানবীয় পার্থিব জ্ঞানের বিভাগগুলোও থাকবে এবং সেগুলোর সিলেবাসও শরিয়াহবান্ধব পরিবেশ ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। যেখানে ছাত্ররা জ্ঞানের যেই শাখাকেই নির্বাচন করুক, নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্বীনি ইলম হাসিল সবার জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে।

tauhiderdak.com

অর্থনৈতিক পতন

মুসলিম-বিশ্বে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে, তার মূল কারণ উম্মাহর জীবন থেকে খুঁজে বের করার জন্য তেমন চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই।

এটা সত্য যে, বহিরাগত অনেক কারণ ছিল, যেগুলো এই বিপর্যয়কে বেগবান করেছে; কিন্তু শুধু এতটুকুতে মূল সমস্যা স্পষ্ট হবে না।

ইউরোপীয় খ্রিষ্টশক্তি আন্দালুসে ইসলামি শাসন ধ্বংসের পর থেকে পুরো মুসলিম-বিশ্বকে অবরুদ্ধ করা ও সব মাধ্যমে দুর্বল করার চেষ্টা করতে থাকে। তাদের চক্রান্তের মধ্যে ছিল, পুরো বিশ্বের বাণিজ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া মামলুকদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে, যারা তখন ভূমধ্য ও লোহিত সাগর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পুরো বিশ্বের বাণিজ্যের লাগাম ধরে রেখেছিল; যার ফলে তাদের হাতে পুরো মুসলিম-বিশ্বের বহু সম্পদ অর্জিত হতো।

পর্তুগিজরা যখন ইসলামি মানচিত্র ও মুসলিম নাবিকদের সাহায্যে উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করে, তখন থেকে তারা ভূমি ও সম্পদ দখলের জন্য দূর-প্রাচ্যের দিকে যাত্রা শুরু করে; যাতে মুসলিম-বিশ্বের বাণিজ্য দখল করতে পারে।

তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং মুসলিম-বিশ্বের অর্থনীতি চরমভাবে ধসে পড়ে।

কিন্তু এটাই কি অর্থনীতি ধ্বংসের পেছনে মূল কারণ? এর একমাত্র ব্যাখ্যা?

আচ্ছা, ইতিপূর্বে যেদিন প্রথম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তখন বিশ্বের সকল শক্তি; চাই তা সামরিক বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক হোক, এগুলোর কেন্দ্র কোথায় ছিল? এগুলোর সব কি পারসিক ও রোমানদের হাতে ছিল না?

সেই ইতিহাসে তখন কী ঘটেছিল?

মুমিন জাতি পুরো জমিনে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব অপশক্তি ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে ফেলে।

সেই স্থানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং সব শক্তির কেন্দ্র দখল করে বিশ্বের পরাশক্তি হয়ে ওঠে। তাদের শক্তি সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ফলে তাদের হাতে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি চলে আসে এবং এসবই ছিল এই উম্মাহর

tauhiderdak.com

মুমিনদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার ওয়াদার বাস্তবায়ন—

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানাবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলিফা বানিয়েছিলেন; তিনি তাদের জন্য যে (ইসলাম) ধর্মকে পছন্দ করেছেন, তা তাদের জন্য অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভয়ের পর এর পরিবর্তে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।'[২২৪]

পরবর্তী সময়ে কেন তাদের অবস্থা পালটে গেছে? কীভাবে তাদের হাত থেকে শক্তির উৎস ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে?

আমরা উত্তরে বলতে পারি, তাদের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। আর শত্রুদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে তারা তাদের ওপর জয়ী হয়ে যায়।

হ্যাঁ, এটা বাহ্যিক কারণ, যাতে সন্দেহ নেই। তবে ইতিহাস থেকে শুধু বাহ্যিক কারণ পাঠ করার দ্বারা বাস্তব সত্য বোঝা যায় না; বরং তা সত্য থেকে বিচ্যুত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ তো কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[২২৫]

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

২২৪. সুরা আন-নুর, আয়াত নং ৫৫।
২২৫. সুরা আর-রাদ, আয়াত নং ১১।

tauhiderdak.com

'এর কারণ এই যে, আল্লাহ কোনো জাতিকে কোনো নিয়ামত দান করলে তা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[১১৬]

মুমিনদেরকে সক্রিয় করে একমাত্র ইমান। আর তাদের মাঝে যা পরিবর্তন হয়, তাও শুধুই ইমান। তাই উম্মাহ যখন ইমানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবে, তখন আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবায়ন হিসেবে তাদের খিলাফত, শাসনপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা অর্জিত হবে। আর যখন ইমানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবে, তখন এসব নিয়ামতের পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ ছিনিয়ে নেওয়া হবে। উম্মাহ থেকে খিলাফত, শাসনপ্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা চলে যাবে।

এভাবেই মুসলিমদের হাত থেকে অর্থনীতি ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং ক্রুসেডার ইউরোপ তা দখল করে। এর মূল কারণ সমগ্র উম্মাহর ওপর আঘাতহানা আকিদা-বিশ্বাসের অধঃপতন এবং সর্বদিকে ক্ষয় ও হ্রাস পাওয়া। যেমন সামরিক শক্তির দুর্বলতা, যার ফলে শত্রুরা মুসলিম-বিশ্ব থেকে বেশি শক্তিশালী হয়ে গেছে, স্বয়ং এটাও ছিল আকিদা নষ্টের প্রভাব, যা সামনের অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। তবে অর্থনীতিতে আকিদার ভ্রষ্টতার প্রভাব বোঝার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

ধরে নিলাম, এমন প্রবল কোনো শক্তিবলে মুসলিমদের হাত থেকে বিশ্ববাণিজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, যা তারা প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল না। কিন্তু তখন বা কখনো মুসলিম-বিশ্বের সম্পদ কি শুধু ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল ছিল?!

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এক মহাসাগর থেকে অন্য মহাসাগর পর্যন্ত মুসলিম-ভূমি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও সম্পদে পূর্ণ অঞ্চল। যা এখনো সত্য। কিন্তু মুসলিমরা কখনো তাদের এসব উপাদান ও শক্তি নিজেদের কাজে লাগাতে পারেনি।

যদি অপ্রতিরোধ্য কোনো কারণে সম্পদের এক অংশ হারিয়ে থাকে, তবে পুরো উম্মাহ কেন তাদের অন্যান্য উপযুক্ত সম্পদ ব্যবহার করেনি? যেমন কৃষি, শিল্প, খনিজ তেল-গ্যাস-অন্যান্য পদার্থ।

কারণ ছিল, আলসেমি-অবহেলা, তাওয়াকুল (কর্ম ছাড়া শুধু নির্ভরতা), জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়া, সংকল্পে দুর্বলতা, দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করা ত্যাগ করা, দারিদ্র্যে এমনভাবে সন্তুষ্ট হওয়া যেন তা আল্লাহর ফায়সালা, যা পরিবর্তনের চেষ্টাও করা যাবে না, এই ভয়ে না জানি তা আবার আল্লাহ তাআলার তাকদিরের ওপর বিদ্রোহ হয়ে যায়।

১১৬. সূরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৫৩।

tauhiderdak.com

এসব কারণ সৃষ্টির পেছনে আকিদার ভ্রষ্টতা ব্যতীত কী আছে?

মনে করুন, এই সমস্যাটি অর্থাৎ মুসলিমদের হাত থেকে বাণিজ্য ছিনিয়ে নেওয়া এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্মের সাথে ঘটেছে, তখন কি তাদের প্রতিক্রিয়া তেমনই হতো, যা শেষ প্রজন্মের ক্ষেত্রে ঘটেছে?

এখানে প্রথম ও শেষ প্রজন্মের মাঝে পার্থক্য কি মুসলিমদের বেষ্টনকারী বহিরাগত পরিবেশ? না মূল পার্থক্য নিজেদের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। যা হলো সঠিক ইমান ও বিকৃত ইমানের তফাত। অর্থাৎ উম্মাহর শেষ প্রজন্মে আঘাতহানা আকিদার বিচ্যুতি কি দুই প্রজন্মের এই পার্থক্যের কারণ?

ইসলামি ইতিহাসের ঘটনাবলি আমাদের এভাবেই বোঝা উচিত।

মুসলিম জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির ক্ষেত্রে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া সত্ত্বেও শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন সম্ভব; বরং তারা যত আল্লাহ থেকে দূরে যাবে, তত বেশি শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করবে। যা আজ কাফির পরকালে অবিশ্বাসী পশ্চিমাদের অবস্থা। কারণ কাফিরদের সাথে এটাই আল্লাহ তাআলার আচরণ—

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ...

> 'তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের সামনে প্রতিটি (আনন্দের) জিনিসের দরজা খুলে দিলাম...।'[২২৭]

কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ তাদের ছাড় দেন; কিন্তু একসময় ধ্বংস করেন—

...حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ - فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

> 'এভাবে তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা নিয়ে আনন্দিত, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করি। তখনই তারা নিরাশ হয়ে যায়। অতঃপর যে লোকেরা অন্যায় করেছিল, তাদের শিকড় কেটে দেওয়া হয়। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নিখিল জগতের পালনকর্তা।'[২২৮]

.....

২২৭. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ৪৪।

২২৮. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ৪৪-৪৫।

tauhiderdak.com

কিন্তু মুসলিম জাতির ওপর বিশেষ এক নীতি প্রয়োগ হয়। তারা ইমান ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা শক্তি-ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। তাই যখন তারা ইমান থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের ক্ষমতা চলে যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা চান না যে, তারা ক্ষমতা পেয়ে ধোঁকাগ্রস্ত হোক; অথচ তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। কারণ, তখন তারা আরও পথভ্রষ্ট হয়ে কুফরির গণ্ডিতে চলে যাবে, তখন তাদের ওপর কাফিরদের নীতি প্রযোজ্য হবে—

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যারা দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য চায়, আমি তাদেরকে সেখানে তাদের কাজের পুরোপুরি ফল দিয়ে থাকি, সেখানে তাদেরকে (কোনো কিছু) কম দেওয়া হয় না। ওদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছু নেই। এখানে তারা যা কিছু করেছে, তা নিষ্ফল হয়েছে এবং তারা যেসব কাজ করত তা বাতিল।'[২২৯]

তাই এ উম্মাহর ওপর আল্লাহর রহমত হলো, তিনি তাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় কখনো ক্ষমতা প্রদান করেন না; যাতে তারা ফিরে আসতে পারে। তখন তাদের ক্ষমতা দেবেন, যখন তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আর আখিরাতে তাদের প্রতিদান জমা রাখবেন।

সামরিক পতন

সামরিক অধঃপতনের সাথে বিশ্বাসের পতনের সম্পর্ক একেবারে স্পষ্ট।

আকিদা-বিশ্বাসের পতনের পেছনে কার্যকর সব উপাদান এ উম্মাহর সামরিক শক্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যেমন ভ্রান্ত সুফিবাদ মানুষকে শত্রুর সাথে জিহাদ থেকে বিরত রেখেছে নফসের সাথে জিহাদের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের যুক্তি দিয়ে। ইরজায়ি চিন্তা এসে সত্যিকার ইসলাম থেকে সব বিচ্যুতিকে ঢেকে দিয়েছে এবং এগুলোকে বৈধতা প্রদান করেছে। দায়িত্বে অবহেলার প্রবণতা শত্রুকে সন্ত্রস্ত করার জন্য শক্তি প্রস্তুতের আদেশ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তেমনই স্বৈরাচারী শাসকদের জুলুম মানুষকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ থেকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে।

২২৯. সুরা হুদ, আয়াত নং ১৫-১৬।

tauhiderdak.com

যদি এসবের সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়া যুক্ত করি, যা মূলত বিশ্বাসের পতন থেকে জন্ম নিয়েছে, তাহলে সামরিক অধঃপতনের সব কারণ পূর্ণ হবে। অতঃপর এটা শেষ শতাব্দীতে মানুষের ওপর আক্রান্ত সকল অবস্থার যুক্তিযুক্ত ফলাফলে পরিণত হবে।

ধারাবাহিক কয়েক শতাব্দী ধরে উসমানি রাষ্ট্র ক্রুসেড যুদ্ধের মোকাবিলায় মুসলিম-বিশ্বকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেছে। তাদের এই পথে তাদের জিহাদ, নিয়তের ইখলাস ও সর্বসাধ্য ব্যয় করা, এসবই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্যায়িত হবে।

কিন্তু অধঃপতনের যে মাধ্যমগুলো পুরো মুসলিম-বিশ্বকে বেষ্টন করেছিল, যা থেকে শাসক রাষ্ট্রও মুক্ত ছিল না, সেগুলো অন্য ক্ষেত্রের মতো সামরিক ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে প্রভাব ফেলতে থাকে।

ইসলামি বাহিনী পশ্চিমে ভিয়েনা ও পূর্বে পিটার্সবার্গ (লেলিনগ্রাদ) পৌঁছে কিছুদিন দুটোকে অবরোধ করে রাখার পর পিছিয়ে যেতে শুরু করে। শুধু সেই দূরবর্তী টার্গেট থেকেই নয়; বরং নিকটবর্তী অবস্থান থেকেও পিছিয়ে যায়। একসময় ক্রুসেড রাশিয়া বিশাল ভূমি গ্রাস করে ফেলে, যেখানের অধিবাসীরা একসময় মুসলিম ছিল। তেমনই ক্রুসেড ইউরোপ অন্যদিকে বিশাল ভূমি গিলে নেয়, যা ইসলামি শাসনের অন্তর্গত ছিল, যেখানে খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা বাস করত কোথাও কম কোথাও বেশি। এই ক্রম সংকোচনের মূল একটা কারণ ছিল সামরিক অধঃপতন।

ইউরোপ তখন ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছিল, একসময় উসমানি রাষ্ট্রের শক্তির সমপর্যায়ে চলে আসে। অতঃপর তাদের থেকে শক্তিশালী হয়ে যেতে থাকে, একসময় শক্তির ভারসাম্য পালটে যায়। অতঃপর ক্রুসেডাররা মুসলিম-বিশ্বের মূল ভূমি গ্রাস করে নিতে থাকে।

কিন্তু শুধু এটাই একমাত্র যৌক্তিকতা নয়, বা অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে না!

বরং এর পেছনে অজুহাত হতে পারে (যদিও অব্যাহতি দেয় না[২৩০]) উপেক্ষা, অবহেলা, বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্টি, আসবাবসহ তাওয়াক্কুলের পরিবর্তে তাওয়াকুল, বিজ্ঞান ও শিল্পখাতে পিছিয়ে পড়া, নতুনত্বের মানসিকতা হারিয়ে যাওয়া, এসবের উৎস হচ্ছে

২৩০. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ত্যাগের পেছনে আসলে কোনো যুক্তি ও অজুহাত চলে না।

tauhiderdak.com

ভয়াবহ মূল সেই অধঃপতন। তা হলো, ইমানের হাকিকত থেকে বিচ্যুতি, যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল মুমিনদের বর্ণনা করেছেন।

শাসক রাষ্ট্রের অবস্থা যদি এমন হয়, যারা মুসলিম-বিশ্বকে ক্রুসেড শক্তি থেকে রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তো বাকি মুসলিম-বিশ্বের অবস্থা আরও বহু খারাপ হবে।

তুর্কি জাতি স্বভাবগতভাবেই ছিল যোদ্ধা জাতি। তেমনই তারা ঐতিহ্য রক্ষায় ছিল অনেক কঠোর। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় অনমনীয়তা, যারা সন্তানদেরকে শিশুকাল থেকেই কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ গণ্ডিতে গড়ে তোলে। তাদের এসব স্বভাবের ফলে এত ধ্বংসাত্মক উপাদান সত্ত্বেও রাষ্ট্রের বয়স দীর্ঘ হয়েছে। শেষ দুই শতকে রাষ্ট্রের ধারাবাহিক পরাজয় সত্ত্বেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও দৃঢ়তা অটুট ছিল।

কিন্তু বাকি মুসলিম-বিশ্বে (একেক জাতিতে তারতম্য ছিল) এসব বৈশিষ্ট্য ছিল কম। সে সাথে ছিল পুরো মুসলিম-বিশ্বে আক্রান্তকারী ধ্বংসাত্মক আকিদা-বিশ্বাসের ভ্রষ্টতা। এ ছাড়া সেসব অঞ্চল অনেক দ্রুত সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝেই ক্রুসেড হামলার শিকার হয়ে যায়। তাই সেসব অঞ্চলে অধঃপতন হয়েছে দ্রুত, কারণ পতনের মাধ্যমগুলো ছিল শক্তিশালী।

tauhiderdak.com

৩. ক্রুসেড যুদ্ধ ও উপনিবেশ

নব্য ক্রুসেড আক্রমণগুলো বাস্তবে শুরু হয়েছে হিজরি দশম (খ্রিষ্টাব্দ ষোড়শ) শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে, আন্দালুস থেকে ইসলাম বিলুপ্ত করার পর। আন্দালুসের সর্বশেষ অঞ্চল গ্রানাডা দীর্ঘ কঠিন যুদ্ধে পতনের পর পোপ খ্রিষ্টানদের জয়কে অভিনন্দন জানায় এবং ক্রুসেডারদেরকে অন্যান্য মুসলিম-ভূমি থেকেও মুসলিমদের বিতাড়িত করা চালিয়ে যাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

যদিও আন্দালুসের অবশিষ্ট মুসলিমরা গোপনে তাদের ইসলাম রক্ষার চেষ্টা করেছে। যে চেষ্টা খ্রিষ্টানদের তল্লাশি আদালতের হিংস্র নির্যাতনের সামনেও প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ চলমান থাকে। ইতিহাসে যে নির্মমতার কোনো নজির নেই। কিন্তু এত চাপের মুখে রক্ষাকারী কোনো শক্তি ব্যতীত তারা ইসলামের ওপর টিকে থাকা ছিল অসম্ভব। তাই সেই অঞ্চল থেকে মুসলিমরা ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়।

তবে ক্রুসেডারদের তখন এই সক্ষমতা ছিল না যে, তারা পুনরায় বাইতুল মাকদিসের দিকে রাস্তা করে এগিয়ে যাবে। কেননা, শক্তিশালী উসমানি রাষ্ট্র শুধু যে তাদের জন্য ওত পেতে ছিল তা নয়; বরং তারা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে প্রাচ্য ইউরোপের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে, যাদের সামনে কিছুই টিকতে পারেনি। তারা শুধু ভূমি জয় করেনি, (যা বর্তমান কানাডিয়ান প্রাচ্যবিদ উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ বলেছে) বরং স্বয়ং খ্রিষ্টান ধর্মকে ভাসিয়ে নিয়েছে। প্রতি বছর অগণিত খ্রিষ্টান ইসলামে প্রবেশ করেছে—

'কার্ল মার্ক্স ও কমিউনিজমের উত্থানের পূর্বে নবি ﷺ (উদ্দেশ্য ইসলাম) ছিল পশ্চিমা সভ্যতার পুরো ইতিহাসে একমাত্র সত্যিকার হুমকি। এখানে আলোচনা করা জরুরি যে, সেটা আসলে কতটা বাস্তব চ্যালেঞ্জ ছিল। বহু সময় ধরে যা সত্যিই ভয়াবহ হুমকি হিসেবে ছিল।'

'বিশ্বাস ও সামরিক দুই ক্ষেত্রেই সরাসরি আক্রমণ হয়েছে, যা অনেক শক্তিশালী ছিল। যার ফলে খ্রিষ্টবাদ এক ধাক্কায় "রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চলগুলো" হারায়, যা নতুন শক্তি এসে দখল করে নেয়। পুরো সাম্রাজ্য তখন বিলুপ্তির আশঙ্কায় ছিল। প্রথম ধাক্কায় যদিও মিশর ও সিরিয়ার মতো কনস্টান্টিনোপল আরব বাহিনীর হাতে যায়নি, তবে দীর্ঘ সময় এর ওপর চাপ অব্যাহত ছিল। তবে বিস্তৃতির দ্বিতীয়

tauhiderdak.com

ধাক্কায় ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপলের পতন হয়। অতঃপর অস্থিতিশীল ইউরোপের হৃৎপিণ্ডে ১৫২৯ সালে ভিয়েনা অবরোধ করে। অতঃপর ১৬৮৩ সালে আবারও মুসলিম বাহিনী ভিয়েনার দিকে এগিয়ে আসে। আধুনিক যুগে এসে ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্টদের হাতে যুগোস্লাভিয়ার পতনও পশ্চিমাদের অন্তরে এতটা ভীতি সৃষ্টি করতে পারেনি, যতটা শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রার ফলে হয়েছিল। যাদের ছিল বিশাল আতঙ্ক সৃষ্টিকারী শক্তি, যা কখনো স্থির হতো না। তারা একের পর এক বারংবার জয় করে এগিয়ে যেত।

কমিউনিস্টদের মতো ইসলামি বিজয়ধারাও ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের জগতে হুমকিস্বরূপ ছিল। মুসলিমদের আক্রমণ বাস্তব জগতের পাশাপাশি বিশ্বাস-মতাদর্শের দিকেও ছিল। তাদের নতুন আকিদা এসে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসকে চূড়ান্তভাবে অস্বীকার করে। অথচ এ খ্রিষ্টধর্ম ছিল ইউরোপীয়দের কাছে সবচেয়ে পবিত্র, ধীরে ধীরে যার ওপর তাদের সভ্যতা গড়ে তুলছিল। কিন্তু ইসলামি আক্রমণ ছিল শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য। যা প্রায় খ্রিষ্টানজগতের অর্ধেক দখল করে নিতে সক্ষম হয়। ইসলামই ছিল একমাত্র ইতিবাচক শক্তি, যা লক্ষ-কোটি খ্রিষ্টানকে ধর্ম থেকে বের করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছে।'[২৩১]

কিন্তু ক্রুশপূজারিরা প্রাচ্যে উসমানি বাধা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়; বরং তারা তাদের ওপর আক্রমণের কল্পনাও করত না। উসমানি এলাকার পরিবর্তে তারা পশ্চিম দিক থেকে মুসলিম-বিশ্বকে ঘুরে রওনা দেয়, বিশেষত উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারের পর।

দূরপ্রাচ্য থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার পথ মুসলিমদের কাছে পরিচিত ও সংরক্ষিত ছিল, যা তারা তাদের মানচিত্রে এঁকে রেখেছিল। সেখানের নৌপথগুলো সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করেছিল, যা আল-বিরুনির 'আজায়িবুল হিন্দ' ও অন্যান্য কিতাব থেকে জানা যায়। কিন্তু ইউরোপ তখনও মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যারা বিশ্ব সম্পর্কে স্বল্প কিছু জানত এবং কখনো সাগর-মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সাহস করত না।

কিন্তু ইউরোপের অভ্যন্তরীণ কিছু কারণ তাদেরকে অজ্ঞাত সাগরপথে নৌকা ভাসাতে উদ্বুদ্ধ করে। যেখানে সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ ছিল ক্রুসেডীয় চেতনা। পোপ-পাদরিরা যে চেতনা জাগ্রত করেছে; যাতে আন্দালুস থেকে মুসলিমদের বিতাড়নের

.....

২৩১. আধুনিক ইতিহাসে ইসলাম - উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ।

পরেও তাদের তাড়ানো অব্যাহত রাখে। আর মুসলিমদের অঞ্চল দখল করে নিয়ে আন্দালুসের মতো তাড়াতে না পারলেও যাতে তাদের শাসনের অধীনে নিয়ে আসতে পারে। এ ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমদের হাত থেকে বিশ্ববাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। যার ফলে একদিকে মুসলিমরা দুর্বল হয়ে যাবে, অন্যদিকে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

ভাস্কো-দা-গামা যখন ইবনে মাজিদের[২৩২] সাহায্যে তার যাত্রা শেষ করে, তখন সে প্রসিদ্ধ এক বাক্যে তার অভিযাত্রার মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেয়। যা সম্পর্কে আমরা আমাদের সন্তানদের ইতিহাস পড়ানোর সময় বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রভাবে গাফিল থাকি। আর ছাত্রদের এই ধারণা দিই যে, এটা ছিল একটি শিক্ষাসফর। অথচ সে বলেছে, 'আমরা ইসলামের ঘাড়ে ফাঁস পরিয়ে দিয়েছি। এখন শুধু রশি টান দেওয়া বাকি, তাহলেই তারা ফাঁস লেগে মারা যাবে।'

যা ছিল স্পষ্টরূপে ক্রুসেডীয় অভিযাত্রা।

মুসলিম-বিশ্বে খ্রিষ্টানদের বাকি সব অভিযাত্রাও একই উদ্দেশ্যে ছিল। তারা এসে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথগুলো অনুসন্ধান করত, অতঃপর তাদের শাসকের কাছে ফিরে গিয়ে মুসলিমদের ভূমিতে অনুপ্রবেশের রাস্তা বাতলে দিত। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ম্যাগেলানের ভ্রমণ। যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম-ভূমি ফিলিপাইন দখল করে তাদের খ্রিষ্টান-শাসনের অধীন করা। অথচ আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দিই যে, এটা ছিল ইতিহাসের মহান এক আবিষ্কারমূলক ভ্রমণ।[২৩৩]

এটা অবশ্য ইউরোপীয়দের জন্য আবিষ্কারমূলক ছিল; কারণ, তাদের সামনে এমন রাষ্ট্রের পথ উন্মুক্ত করে দেয়, যার কথা তারা শুধু মানুষের মুখে শুনত। কিন্তু আমাদের

.....

২৩২. বর্তমান সময়ের গবেষক আলিম ও ইতিহাসবিদ ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ মুসলিম নাবিক ইবনে মাজেদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার দাবিকে প্রাচ্যবিদদের মিথ্যা ও কাল্পনিক দাবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত ভাস্কো-দা-গামার সাক্ষাৎ হয়েছিল কিছু খ্রিষ্টান নাবিকের সাথে। সে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে ফেলে। তারাই পর্তুগিজ দস্যুদের-সহ ভাস্কো-দা-গামাকে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসে। (দ্রষ্টব্য : বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ইতিবৃত্ত, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

২৩৩. ম্যাগেলান পোপের কাছে বারংবার চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছিল; যাতে তাকে ফিলিপাইনের কাফিরদের (অর্থাৎ মুসলিম) ক্রুশের অনুগত করানোর জন্য যাত্রার অনুমতি দেয়। সর্বশেষ তাকে অনুমতি দেওয়া হয়, তখন সে কথিত 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারমূলক' ভ্রমণ করে!! যখন সে মুসলিম-ভূমিতে ক্রুশ উত্তোলনের চেষ্টা করে, তখন মুসলিমরা তাকে হত্যা করে। অথচ আমরা সন্তানদের ইতিহাস শিক্ষায় বলি, তাকে বর্বররা হত্যা করেছে। কারণ, তারা তার মহান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারমূলক ভ্রমণের মূল্য বোঝেনি।

tauhiderdak.com

মুসলিমদের কাছে কি নিজেদের দেশ অজ্ঞাত কিছু ছিল যে, ম্যাগেলান এসে আমাদের সামনে তা উন্মোচিত করবে?! অথচ এটাই তো আমরা বাচ্চাদের শেখাই।[২৩৪]

তাদের অভিযাত্রা ও আবিষ্কার চলমান থাকে, একই সাথে সম্পদ লুণ্ঠন চলে।

ক্রুসেডাররা মুসলিম কোনো সুলতানের কাছে—বিশেষত আফ্রিকায়—আসত, অতঃপর তার দয়ার—নাকি গাফিলতি!—সুযোগ নিত। তারা সুলতানের কাছে বন্দরে পড়ে থাকা তাদের জাহাজ মেরামতে সাহায্য চাইত। সুলতান তাদের সাহায্য করতেন। পরে তারা তার কাছে সমুদ্রতীরে এক টুকরো ভূমি চায়; যাতে তাদের জাহাজ এখানে এনে মেরামত করতে পারে। তখন সুলতান দয়াপরবশ হয়ে তাদের কিছু ভূমি দিয়ে দিতেন। এভাবে যখন তারা ভূমি পেয়ে যেত, তখন সমুদ্রতীরে তাদের কেন্দ্র গড়ে উঠত। যেখানে তারা অস্ত্র ও সেনা এনে মজুত করে পুরো রাষ্ট্র দখল করে নিত।

এটা তাদের ক্রুসেড যুদ্ধের একমাত্র পদ্ধতি ছিল না। তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সকল মাধ্যম ব্যবহার করত। যেমন সরাসরি সামরিক যুদ্ধ[২৩৫] বা মিশনারি কার্যক্রমের দ্বারা পথ তৈরি করা[২৩৬] অথবা ব্যবসার ছুতোয় এসে পরবর্তী সময়ে পুরো অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা।[২৩৭]

এভাবে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে এসে তারা প্রায় সকল মুসলিম-ভূমি দখল সম্পন্ন করে। শুধু তুর্কির মূল ভূমি ও জাজিরাতুল আরবের কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল। তাদের সাম্রাজ্যবাদী অঞ্চলগুলোয় মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান-শাসনের অনুগত করে, প্রকাশ্যে বা বাহ্যিকভাবে মুসলিম শাসক থাকলেও তাদের পেছন থেকে খ্রিষ্টানরাই শাসন করছে।

ক্রুসেড যুদ্ধের এই প্রবণতার কোনো কারণ বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

কারণ, খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের প্রতি যে ঘৃণা লালন করে, তা সর্বজ্ঞানী দয়ালু রব তাঁর নাজিলকৃত কিতাবেই বলে দিয়েছেন—

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

.....

২৩৪. মুসলিমদের ইতিহাসের বইগুলো দেখুন, যেমন রিহলাহ ইবনে বাতুতা।

২৩৫. মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় এমন ঘটেছে।

২৩৬. মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায় এমন ঘটেছে।

২৩৭. হিন্দুস্তান ও ইন্দোনেশিয়ায় এমনটা ঘটেছে।

tauhiderdak.com

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনো আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।'[২৩৮]

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

'অনেক আহলে কিতাব তাদের কাছে সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরও নিজেদের ঈর্ষাবশত তোমাদেরকে ইমান গ্রহণের পর আবার কাফির বানাতে চেয়েছে।'[২৩৯]

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

'তারা (কাফিররা) তোমাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে পারলে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেয়।'[২৪০]

এটাই তাদের অন্তরে সুপ্ত থাকা ইসলামের প্রতি চিরস্থায়ী বিদ্বেষ, তাই অন্য কোনো প্রেরণা প্রয়োজন নেই। শুধু দুনিয়ায় ইসলামের অস্তিত্বই তাদের মাঝে শত্রুতার আগুন জ্বালানোর জন্য এবং মুসলিমদেরকে যথাসম্ভব তাদের দ্বীন থেকে ফিরানোর জন্য প্রচেষ্টার পেছনে প্রেরণা হিসেবে যথেষ্ট।

এটা এমন সত্য, যা প্রমাণ করা প্রয়োজন। কারণ, পশ্চিমারা তাদের খ্রিষ্টীয় বিদ্বেষ ঢাকার জন্য ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালায়। সর্বক্ষেত্রে এটা এত বেশি প্রচার করেছে যে, স্বয়ং কিছু মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রভাবে তা বিশ্বাস করে নিয়েছে এবং তারা তাদের মনিবদের শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে। এ প্রচারণার সারমর্ম হলো, ধর্মীয় চেতনার দিন শেষ। এখন আর ধর্মীয় চেতনা ইউরোপকে উত্তেজিত করে না, যেমনটা মধ্যযুগে হতো। কারণ, ধর্ম এখন ইউরোপীয়দের জীবনের কোনো প্রভাবক নয়; বরং এখন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই শুধু তাদের জীবনের লক্ষ্য, যেখানে শুধুই খনিজ ও কাঁচামাল খুঁজে বেড়ানো হবে, যার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ সবই মিথ্যা, যার সাথে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই।

২৩৮. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১২০।
২৩৯. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১০৯।
২৪০. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২১৭।

tauhiderdak.com

এটা সত্য যে, ইউরোপ ধর্ম ত্যাগ করেছে এবং একে ভুলে গেছে। ধর্ম এখন তাদের বাস্তব জীবনের কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে না। না রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, অন্তরের আবেগ বা মস্তিষ্কের চিন্তা, কিছুই না। তবে এগুলো এক জিনিস আর খ্রিষ্টীয় বিদ্বেষ ভিন্ন বিষয়।

কারণ, ক্রুসেডীয় ঘৃণা লালনের জন্য খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করা আবশ্যক নয়, যা বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়; বরং এমন ঘৃণার মূল কারণ হলো মুসলিমদের অস্তিত্ব। এমন মানবসমাজের অস্তিত্ব, যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের দলভুক্ত ও অনুসারী নয়। এই বিষয়ের দিকেই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে—

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

> 'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনো আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।'[২৪১]

চাই তারা ধার্মিক হোক বা ধর্ম থেকে বিচ্যুত, সর্বাবস্থায় মুসলিমদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ তারা মুসলিম থাকবে এবং কালিমার পতাকা ধারণ করে রাখবে।

মুহাম্মাদ আসাদ 'Islam at the Crossroads' বইয়ে লিখেছেন—

'ইউরোপীয় জোট এবং মুসলিম-দুনিয়ার মাঝে প্রথম ভয়াবহ সংঘর্ষ বাধে ক্রুসেডের সময়, ঠিক সে সময় ইউরোপের শহুরে সভ্যতার সূর্য উদিত হচ্ছিল। রোমান সভ্যতার পতন-পরবর্তী অন্ধকার যুগ পাড়ি দিয়ে গির্জার সাথে সম্পর্ক রেখেই এ সভ্যতা নিজ পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের সাহিত্যকলার ওপর ঝিরঝির হিমেল হাওয়া বইতে ছিল। গথ, হান ও এভারদের প্রবল আক্রমণে স্থবির হয়ে পড়া চারুকলা আবারও ধীরে ধীরে অঙ্কুরোদগম হচ্ছিল। মধ্যযুগের বর্বরতা কাটিয়ে সে সময় ইউরোপে শুরু হয় এক নতুন সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা। যার হাত ধরে বাড়ছিল অনুধাবনের ক্ষমতা।

ঠিক সেই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে ইসলামের প্রতি শত্রুতার মনোভাব থেকে তারা ক্রুসেড হামলা শুরু করে। তবে ক্রুসেড হামলা শুরুর আগ থেকে মুসলিমদের সাথে ইউরোপের সংঘর্ষ চলে আসছিল। যেমন আরবরা সিসিলি ও আন্দালুস জয় করে নিয়েছিল, দক্ষিণ ফ্রান্সে অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু এ সবই ছিল খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত

২৪১. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১২০।

tauhiderdak.com

ইউরোপের সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরুর পূর্বের ঘটনা। তাই ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে তখন দেখা হয়েছে স্থানীয় সমস্যা হিসেবে। ব্যাপারটি ওরা তেমন পাত্তা দেয়নি। একমাত্র ক্রুসেড যুদ্ধই ইসলামের সাথে ইউরোপের এমন বৈরী সম্পর্ক তৈরি করে, যা বহু শতাব্দী ধরে চলমান ছিল।

ক্রুসেড যেন আবশ্যক বিষয় ছিল। কারণ, সময়টা ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার বাল্যকাল। ওই সময় তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো মাত্র প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। ধীরে ধীরে এর বিকাশ ঘটছিল। শৈশবের দুরন্তপনার ছাপ যেমন চেতনা বা অবচেতনে মানুষের পরবর্তী জীবনে দেখতে পাওয়া যায়, জাতি-সমাজের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমন ঘটে। সেসব স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এমন গভীরভাবে গেঁথে যায় যে, পরবর্তী সময়ে তা ছেড়ে দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি বা আবেগি সময় পাড়ি দিয়ে অভিজ্ঞ হলেও সেগুলো ছাড়া কষ্টকর, আর পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

ক্রুসেড যুদ্ধগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই ঘটেছে। এগুলো ইউরোপীয়দের মনে বেশ গভীর ও স্থায়ী রেখাপাত করে। ওই সময় তাদের প্রতিটি স্তরে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, গোটা ইউরোপ আর কখনোই তা প্রত্যক্ষ করেনি। পরবর্তী সময়ের কোনো কিছুর সাথেই এর তুলনা চলে না।

উন্মাদনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে পুরো মহাদেশজুড়ে। উল্লাসে ফেটে পড়তে থাকে সবাই। কিছু সময়ের জন্য হলেও জাতি-রাষ্ট্র-গোত্রগুলোর মধ্যে একতা তৈরি হয়। ইউরোপ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জোটবদ্ধ হয়। এই ঐক্য ছিল মুসলিম-দুনিয়ার বিরুদ্ধে। পূর্বে তারা অ্যাংলো-স্যাক্সন, জার্মান, ফ্রান্সি, নরম্যান, ইতালি, ডেনমার্ক, স্লাভ ইত্যাদি জাতিতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ক্রুসেড যুদ্ধের সময় "পশ্চিমা সভ্যতা" নামক নতুন এক ধারণা জন্ম নেয় এবং ইউরোপের সব জাতি একসাথে এই লক্ষ্যে চেষ্টা শুরু করে। মূলত এর পেছনে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে "ইসলাম-বিদ্বেষ"। আর ইউরোপীয় রাজনৈতিক নেতারা পশ্চিমা মূর্খ জনগণের সামনে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে বিকৃতভাবে পেশ করে তাদের চিন্তা-চেতনাকে বিষাক্ত করে ফেলেছিল। যার ফলে তখন থেকেই এই হাস্যকর চিন্তা ইউরোপীয়দের মনে গেঁথে যায়।

ক্রুসেডের বর্বরতা স্রেফ অস্ত্রের ঝনঝনানিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। মোটাদাগে এটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন। মুসলিম-বিশ্বের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে খেপিয়ে তোলা হয়েছিল গোটা ইউরোপের চিন্তা-চেতনাকে। ইসলাম হলো অসভ্য ও বর্বর ধর্ম, আত্মশুদ্ধির

tauhiderdak.com

তুলনায় লৌকিকতা এখনে প্রাধান্য পায়—এ ধরনের উদ্ভট চিন্তাধারা ইউরোপের মন-মগজে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। আর বহুকাল তা বদ্ধমূল থেকে যায়।

ক্রুসেডের উন্মাদনার প্রভাব ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলেও পড়েছিল। যা আন্দালুসের খ্রিষ্টানদেরকে "অসভ্য মানুষের জোয়াল" কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলা অর্থাৎ মুসলিম-শাসন বিলুপ্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

তবে তৃতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ইসলামের সম্পর্কে ঘৃণা-বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি করে। সেটা হলো, তুর্কিদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতন। এটা পতনের মধ্য দিয়ে ইসলামি অগ্রযাত্রার সামনে ইউরোপের দরজা খুলে যায়। যার ফলে পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত শতাব্দীগুলোতে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপের শত্রুতা কেবল সাংস্কৃতিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পৌঁছে যায়। যা শত্রুতার আগুনে আরও ঘি ঢালে।

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তাদের ঘৃণা। একসময় এটা প্রথা হিসেবে রূপ নেয়। পশ্চিমা জনগণের সামনে "মুসলিম" শব্দটা উচ্চারণ করলেই তাদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। সর্বক্ষেত্রে এটি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। এই ঘৃণা খোদাই করে দেওয়া হয়েছে ইউরোপের প্রতিটি নরনারীর অন্তরে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত এত সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও এই ধারণা আজও টিকে আছে। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সময় ইউরোপ বহু দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। কিন্তু তখনও ইসলাম-বিদ্বেষ ছিল সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। তারপর এমন এক সময় এল, যখন ইউরোপের ধর্মীয় অনুভূতি হ্রাস পেতে থাকে; কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষ পূর্বের মতোই রয়ে যায়।'[২৪২]

এখানে সে প্রশ্নের উত্তর রয়েছে, যা মাঝে মাঝে আমাদের কল্পনায় জাগ্রত হয়, কীভাবে ইউরোপ তাদের ধর্ম ত্যাগের পরেও ইসলামের প্রতি খ্রিষ্টীয় ঘৃণা লালন করছে?

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ঘৃণার প্রধান কারণ হচ্ছে ইসলামের অস্তিত্ব, অর্থাৎ মুসলিম বনাম ইহুদি বা খ্রিষ্টান কোনো দ্বন্দ্ব হওয়ার পূর্বে ইসলাম-আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্ত থেকেই

.....

২৪২. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত, মোহাম্মাদ আসাদ (অনুবাদ- জাকারিয়া মাসুদ) পৃষ্ঠা নং ৫৬-৬১।

tauhiderdak.com

এই ঘৃণা চলে আসছে। এর সাথে যদি যুক্ত হয়, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্বের বিশাল ইতিহাস, যখন তাদেরকে তাদের শক্তির কেন্দ্রগুলো থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য উৎখাত করেছিল, তাহলে বাস্তবেই ঘৃণার আরেকটি শক্তিশালী কারণ যুক্ত হবে। যা স্বয়ং তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কখনো দূর হবে না। যেমন উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ তার 'আধুনিক ইতিহাসে ইসলাম' গ্রন্থে একই কথা লিখেছে। সে ছাড়াও অন্যান্য প্রাচ্যবিদ, মিশনারি, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা একই কথা বলেছে।[২৪৩]

এ ছাড়াও কাঁচামাল ও খনিজে সমৃদ্ধ প্রাচ্যের প্রতি ইউরোপীয়দের বিশাল অর্থনৈতিক লোভ রয়েছে। কারণ, এই অঞ্চলের বাসিন্দারা এসব সম্পদ খুব কমই ব্যবহার করতে পারে, অন্যদিকে ইউরোপ এমন কিছুর প্রতি প্রচণ্ড লালায়িত।

তবে এখানে আমাদের আরও কিছু বাস্তবতা ভুলে যাওয়া উচিত নয়—

প্রথমত, খ্রিষ্টীয় চেতনাই ছিল ইউরোপকে মুসলিম-বিশ্ব দখলের দিকে উদ্বুদ্ধকারী মূল প্রেরণা, যা ভাস্কো-দা-গামা ও ম্যাজেলানের অভিযাত্রা থেকে প্রমাণিত। আফ্রিকাতে ভূমি আবিষ্কারমূলক অন্যান্য ভ্রমণ, বিশেষ করে মিশনারিরা এমন বহু স্থানে গমন করেছে, যেখানে অর্থনৈতিক সুবিধা লুণ্ঠন করা তাদের মূল লক্ষ্য ছিল না। যদিও পরে তা ব্যাপক পরিসরে ঘটেছে, যখন দখলদাররা সম্পদের উৎস আবিষ্কার করে তা ব্যবহার করা শুরু করেছিল।

দ্বিতীয়ত, প্রাচ্যের অর্থ-সম্পদ চুরি-লুণ্ঠনের জন্য ইউরোপের হামলার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদেরকে তাদের শক্তির উৎসগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা। যা ছিল স্পষ্ট একটি খ্রিষ্টীয় লক্ষ্য, যে জন্য তারা সকল মাধ্যম গ্রহণ করেছিল। যেখানে অর্থনীতি ছিল সেই সকল মাধ্যমের মাঝে মাত্র একটি। কিন্তু এটাই সাম্রাজ্যবাদীদের মূল লক্ষ্য ছিল না, যা অনেক পরাজিত মানসিকতার বুদ্ধিজীবী ও অন্যরা মনে করে। যারা তাদের নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, পশ্চিমারা শুধুই তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে চায়, তাদের আর কোনো লক্ষ্য নেই।

তৃতীয়ত, পরবর্তী সময়ে যখন ইউরোপীয়দের জনজীবনে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি শুরু হয়, তখন—বাহ্যিকভাবে—এটাই তাদের সকল পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। তবে এখানে একটা মূল পার্থক্য রয়ে যায়। তা হলো, তাদের বিস্তৃতি ও সাম্রাজ্য

২৪৩. উমর ফারুখ ও তাঁর বন্ধুর লেখা 'মিশনারি ও উপনিবেশ' বইয়ে বিস্তারিত রয়েছে।

tauhiderdak.com

গঠনের সময় মুসলিম-রাষ্ট্রে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা বনাম অমুসলিম-রাষ্ট্রে বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাঝে অনেক ভিন্নতা ছিল।

যদি তারা দখলকৃত সব দেশেই জুলুম করত, স্বার্থপর ও দাম্ভিক আচরণ, দেশের বাসিন্দাদের বঞ্চিত করে নিজ স্বার্থ বাস্তবায়ন করত, সর্বদা তাদের দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ বানিয়ে রাখত; যাতে তাদের যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় গোলাম বানিয়ে রাখা যায়, সর্বদা তাদের মুক্তি আন্দোলনের বিরোধী এবং রাজনৈতিক ও জাতীয় অস্তিত্বকে ধ্বংসকারী ছিল।

এগুলো সত্ত্বেও তারা অমুসলিম-রাষ্ট্রের মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও রীতিনীতির ওপর কোনো ধরনের হিংস্র আক্রমণ করত না; বরং পরাজিত জাতির ওপর বিজয়ী জাতির প্রভাবে তাদের জীবনে ধীরে ধীরে যতটুকু প্রবেশ করে, এতেই ক্ষান্ত ছিল। অথচ অন্যদিকে মুসলিম-রাষ্ট্রে সর্বদাই বহু চক্রান্ত ও কার্যক্রম চালানো হতো, যা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, জীবন থেকে ইসলামের নিদর্শন মুছে ফেলা, মুসলিমদের অন্তর থেকে জোর করে ইসলামকে টেনে বের করা অথবা ধূর্ত নিকৃষ্ট পন্থায় তাদেরকে দ্বীন থেকে বিমুখ করে দেওয়া (অহিংস পদ্ধতিতে)। কিন্তু তারা কোনো অবস্থাতে ইসলামের ব্যাপারে সন্তুষ্ট বা ছাড় দেয়নি। যেসব ইসলামি রাষ্ট্রে তাদের থাবা পড়েছে, সেখানে তাদের প্রথম চক্রান্ত ও চেষ্টা হতো, রাষ্ট্রের শাসন থেকে ইসলামি শরিয়াহকে বিলুপ্ত করে সেখানে মানবরচিত বিধানের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। এটা এমন বিষয়, যার সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থের নিকট বা দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ পশ্চিমারা এই প্রোপাগান্ডা চালায় আর তাদের গোলামরা মনে করে, এটাই বুঝি মুসলিম-বিশ্বকে দখলের পেছনে তাদের প্রথম ও শেষ একমাত্র লক্ষ্য।

মোটকথা, এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামি রাষ্ট্রের ওপর পশ্চিমা আগ্রাসনের পেছনে সর্বদাই খ্রিষ্টীয় চেতনা উপস্থিত ছিল; চাই তা যেমন শুরুতে এককভাবে ছিল, অথবা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে ছিল। কিন্তু সর্বাবস্থায় তা ছিল তীব্র এক প্রবণতা, যা কখনো শান্ত বা স্থির হয়নি; বরং শেষ যুগগুলোয় ইসলামি পুনর্জাগরণের সাথে সাথে এর তীব্রতা ও হিংস্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

tauhiderdak.com

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন দ্বারা বেসামরিক সব মাধ্যম উদ্দেশ্য, যেগুলো ক্রুসেডাররা জীবন থেকে ইসলামের নিদর্শন মুছে ফেলা এবং মুসলিমদেরকে ইসলামের অনুশাসন থেকে দূরে সরানোর জন্য ব্যবহার করেছে। যেগুলো সরাসরি আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, রীতিনীতি ও আচরণবিধির ওপর আঘাত করেছে।

আধুনিক ক্রুসেড যুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের উপকরণ ব্যবহারের কারণ ছিল সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, যা ক্রুসেডাররা পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরি (এগারো ও বারো খ্রিষ্টাব্দ) শতকে মুসলিমদের সাথে তাদের প্রথম পর্যায়ের ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ থেকে অর্জন করেছিল। যেখানে তারা চূড়ান্ত পরাজিত হয় এবং যেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজ দেশ থেকে বের হয়েছিল, অগণিত অর্থ ও রক্ত-প্রাণ ঝরিয়েছিল, তা কিছুই অর্জন করতে পারেনি।

সপ্তম ক্রুসেডের সময় ফ্রান্সের রাজা নবম লুইস একটি ক্রুসেড হামলায় পরাজিত হয়ে বন্দী হয়। কিছু সময় সে মানসুরায় বন্দী থাকে। অতঃপর তার জাতি মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নেয়।

তার বন্দিত্বের সময় সে নিজের ও নিজ জাতির পরিণতি নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। অতঃপর ফিরে এসে তার জাতিকে বলে, 'যদি তোমরা মুসলিমদের পরাজিত করতে চাও, তাহলে শুধু অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ করো না; কেননা, তোমরা এ যুদ্ধে পরাজিত হয়েছ; বরং তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কারণ, সেটাই তাদের শক্তির উৎস।'

তার জাতি এই উপদেশ গ্রহণ করে। তাই পরবর্তী সময়ে যখন তারা আবার মুসলিম-বিশ্বের সাথে যুদ্ধ করতে আসে, তখন শুধু অস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তারা তাদের সাথে সেই নিকৃষ্ট সব উপকরণ নিয়ে আসে, যাকে আমরা বলছি 'বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন'।

বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য, মুসলিমদের অন্তর থেকে ইসলামি বিশ্বাস দূর করা এবং তাদেরকে ইসলামি বিধান মেনে চলা থেকে বিরত রাখা। এর বহু মাধ্যম রয়েছে। তবে সবগুলো দুটো মূল ক্ষেত্রে একত্রিত হয়, শিক্ষা-সিলেবাস ও মিডিয়া।

tauhiderdak.com

শিক্ষাব্যবস্থা

১৮২২ সালে ইংরেজরা যখন মিশরে প্রবেশ করে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডিস্টোন সেদিন ব্রিটেনের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কুরআনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, 'যতদিন এই বই মিশরিদের হাতে থাকবে, ততদিন সে দেশে আমাদের কোনো কথা চলবে না।'

১৯০৬ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত খ্রিষ্টান মিশনারি কনফারেন্সে এক বক্তা বলে, 'আমরা ব্যর্থ হয়েছি! আমরা বহু বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও আশ্রয়কেন্দ্র করেছি। বহু অর্থ ও সেবা দিয়েছি। অথচ খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশ করেছে শুধু সেই শিশু, যাকে আমরা তার পরিবারের ধর্ম বোঝার পূর্বেই ছিনিয়ে এনেছিলাম অথবা সেই ব্যক্তি, যে টাকার জন্য আমাদের কাছে এসেছে, যার বিশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের কাছে নিশ্চয়তা নেই।' তখন পোপ জুইমার[২৪৪] দাঁড়িয়ে তাদের জবাবে বলেছিল, 'আমি অন্যান্য বক্তা ভাইদের কথা শুনলাম। আমি তাদের কথার সাথে একমত নই। আমাদের মূল লক্ষ্য মুসলিমদের খ্রিষ্টান বানানো নয়। কেননা, এটা তো এমন মর্যাদা (!), যার জন্য তারা উপযুক্ত নয়; বরং আমাদের মূল লক্ষ্য হলো, মুসলিমদেরকে ইসলাম আঁকড়ে ধরা থেকে ফিরিয়ে রাখা। এ ক্ষেত্রে আমরা চমৎকার সফলতা অর্জন করেছি। এর পেছনে মূল কারিগর হলো, আমাদের মিশনারি বিদ্যালয়গুলো এবং ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য আমাদের প্রণীত শিক্ষা-সিলেবাস।'[২৪৫]

এগুলো স্পষ্ট বক্তব্য, যা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

সুতরাং তাদের লক্ষ্য হলো, মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন ও কুরআন থেকে সরিয়ে দেওয়া; যাতে পরবর্তী সময়ে তারা যা ইচ্ছা হতে পারে। তাই যখন তাদের প্রাথমিক ষড়যন্ত্র ও প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদেরকে খ্রিষ্টান বানাতে ব্যর্থ হয়েছে[২৪৬], তখন কমপক্ষে তাদের হৃদয় থেকে সেই ভীতিকর জিনিসটা বের করে দিতে হবে। যা তাদেরকে অস্থির ও পেরেশান করে রাখত; এমনকি রুগণ ব্যক্তির (উসমানি খিলাফত) অন্তরে

.....

২৪৪. সে ছিল প্রোট্যাস্টান্ট মিশনারি। মুসলিম-রাষ্ট্রগুলোতে সে ব্যাপক মিশনারি কার্যক্রম করেছে। মৃত্যুর পূর্বে তাকে ইহুদি গোরস্থানে কবর দেওয়ার অসিয়ত করে যায়।

২৪৫. ইসলামি-বিশ্বের ওপর আক্রমণ (অনুবাদ- মুহিব্বুদ্দীন খাতিব)

২৪৬. জুইমারের এ কথার কোনো মূল্য নেই যে, ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্য মুসলিমদের খ্রিষ্টান বানানো ছিল না। তার এই ফালতু ব্যাখ্যারও কোনো মূল্য নেই যে, খ্রিষ্টান হওয়া এমন সম্মান, যার প্রাপ্য মুসলিমরা নয়! কেননা, এগুলো শুধু তাদের মিশনারি কার্যক্রমে ব্যর্থতা ঢাকার প্রয়াসমাত্র। যেমন শিয়াল যখন আঙুর গাছে উঠতে ব্যর্থ হয় তখন বলে, আঙুর ফল টক।

tauhiderdak.com

সুপ্ত থাকা অবস্থাতেও। যা এক লেখক স্পষ্ট তার 'ইসলামি-বিশ্বের ওপর আক্রমণ' গ্রন্থে লিখেছে, ইউরোপ 'রুগণ ব্যক্তি'-কে ভয় পেত, কারণ, তার পেছনে তিনশ মিলিয়ন মুসলিম জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে শুধু তাদের আঙুলের ইশারার অপেক্ষা করছে।

হ্যাঁ, এটা হলো এ দ্বীনের জিহাদি চেতনা, যা তাদেরকে সবচেয়ে বেশি পেরেশান করে; যদিও তারা এই দ্বীনের সবকিছুই এত বেশি ঘৃণা করে, যেগুলো তারা দেখতেও পারে না।[২৪৭]

পশ্চিমা চিন্তাযুদ্ধের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে উত্তম একটি দৃষ্টান্ত হলো মিশর। কারণ, মিশর ও এখানে ইসলামকে ধ্বংসের দিকে ক্রুসেডারদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যার কারণ, এটা হচ্ছে মুসলিম-বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এবং এখানে আছে আজহার, যা তাকে পুরো মুসলিম-বিশ্বের জন্য আত্মিক ও জ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

১৯০৬ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত মিশনারি কনফারেন্সে এক মিশনারি তার বক্তব্যে 'আজহার খ্রিষ্টান গির্জার জন্য হুমকি কি না?' এই প্রশ্নের জবাবে বলেছে, 'বহু বছর যাবৎ মুসলিমদের মনে এটা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি শিক্ষাদান অন্য যেকোনো স্থান থেকে অধিক সুসংহত ও যথার্থ। আজহার থেকে যারা পাশ করে বের হয়েছে, তাদের দ্বীনি ইলমের পরিধি অনেক বিস্তৃত। দুনিয়ার সব শাইখের জন্য আজহারে শিক্ষা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। বিশেষত আজহারের অগণিত ওয়াকফ সম্পত্তি ফ্রি পাঠদানে সাহায্য করে। কারণ, এসবের আয় দিয়ে ২৫০ জন শিক্ষকের বেতন প্রদান করা হয়। অতঃপর সে খ্রিষ্টান ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করে, যার ব্যয় বহন করবে গির্জা; যাতে তারা সহজেই আজহারকে টেক্কা দিতে পারে। এই বিদ্যালয় থেকে দক্ষতার সাথে আরবি শিক্ষা দেওয়া হবে।' সে তার বক্তব্যের শেষে বলে, 'হয়তো প্রভুর দয়ায় মিশরকে আমাদের কাজের কেন্দ্রস্থল বানিয়েছি; যাতে এখান থেকে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য দ্রুত খ্রিষ্টান ভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।'[২৪৮]

তাই মিশরে ইসলামকে ধ্বংসের প্রতি তাদের গুরুত্ব, বা বলা যায়, মিশরকে ইসলাম থেকে বের করার প্রচেষ্টা ছিল অনেক বেশি। যে লক্ষ্যে তারা মিশরে এত অধিক চেষ্টা ব্যয় করেছে, সত্যি তা মুসলিম-বিশ্বের অন্য কোনো অঞ্চল থেকে বেশি বিস্তৃত ও

.....

২৪৭. পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী মুসলিমরা জানে, তারা যখন হিজাবপরিহিত কোনো নারী দেখে, তখন তা তাদেরকে এতটা উত্তেজিত করে তোলে যে, তারা তা গোপন রাখতে পারে না।

২৪৮. আল-ইসলামিল আলাম আলাল গারাতি(৫৭-৫৮)।

tauhiderdak.com

গভীর প্রভাবশীল ছিল। (তুর্কিতে খিলাফতের পতনের চেষ্টা ব্যতীত, সেখানে তারা কামাল আতাতুর্কের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেছিল।)[২৪৯]

মিশরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণের কারণ হলো, এটা পূর্ণাঙ্গ একটি অভিজ্ঞতা। একেবারে ইসলাম থেকে বিচ্যুতির শুরু থেকে আবারও প্রত্যাবর্তনের সূচনা পর্যন্ত। ফলে আরব বা অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রের পাঠক এখানে খুঁজে পাবে যে, তার দেশ কিছু হলেও এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। আর আমরা যখন পূর্ণাঙ্গ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করব, তখন তাদের চক্রান্তের লক্ষ্য ও ফলাফল বোঝা সহজ হবে।

ফরাসি হামলার ভূমিকা

১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে মিশরে ক্রুসেড হামলা হয়। আমরা আমাদের শিশুদের শিক্ষা দিই, ফরাসি হামলা ছিল মহা বিজয়। শুধু ফরাসিদের জন্যই নয়; এমনকি মিশরীয়দের জন্যও। এটা ছিল সভ্য বিশ্বের সাথে মিশরীয়দের সম্পর্ক এবং তাদের অন্ধকার যুগ থেকে আলোর দিকে বের হওয়ার সূচনা। এখনো সেথায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে আসে, মিশরে ফরাসি হামলার ফায়দা লেখো? মিশরে ফরাসিদের হামলার ফলাফল লেখো? সেখানে একবারের জন্যও এটা বলা হয় না যে, এটা ছিল মুসলিম-বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্রের ওপর ক্রুসেড যুদ্ধ।

এ হামলার উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়, নেপোলিয়ন চেয়েছিল মিশরকে ঘাঁটি বানিয়ে ব্রিটেন ও হিন্দুস্তানের মাঝে সাম্রাজ্যবাদী পথ বন্ধ করে দেবে। যা ছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মাঝে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রতিযোগিতার ফল। বলা হয়, নেপোলিয়ন তার সাথে আরবি হরফসমৃদ্ধ ছাপাখানা নিয়ে এসেছে; যাতে মিশরি জাতির উদ্দেশে সংস্কারমূলক নির্দেশনা ও বার্তা ছাপিয়ে প্রচার করতে পারে। কারণ, সে মূলত ফিরআওনদের প্রভাব থেকে মিশরকে মুক্ত করার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে এসেছে।

নির্বুদ্ধিতা ও অসতর্কতায়—নাকি শয়তানি ও মন্দ উদ্দেশ্যে—আমরা এই হামলার মূল লক্ষ্যগুলো ভুলে থাকি।

.....

২৪৯. ক্রুসেডাররা ইসলামকে ধ্বংসের প্রচেষ্টায় দুটো মূল পয়েন্টে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়, আসিতানা (ইস্তাম্বুল) ও কায়রো। আসিতানা ছিল মুসলিম-বিশ্বের শক্তি, রাজনীতি ও সামরিক কেন্দ্র। কায়রো ছিল আত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রেরণার উৎস। তাই আসিতানায় তাদের মূল চেষ্টা ছিল রাজনৈতিক ও সামরিক। আর কায়রোতে তাদের মূল চেষ্টা ছিল সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। তাই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের অধ্যায়ে মিশরের দৃষ্টান্ত পেশ করব, আর ইতিহাস বর্ণনার মাঝে তুর্কির দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করব।

tauhiderdak.com

সে যুগে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মাঝে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিরোধের বিষয় ঐতিহাসিক সত্য, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তেমনই নিশ্চিতভাবেই নেপোলিয়নের ইচ্ছার মধ্যে এটাও ছিল যে, মিশরকে ঘাঁটি বানিয়ে ব্রিটেনের সাথে যুদ্ধ করবে এবং হিন্দুস্তানের দিকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী পথ বন্ধ করবে। তবে এটাই শুধু এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল, এমন বলা ইতিহাসের বাস্তবতা অনুযায়ী মিথ্যা হবে।

কারণ, যদি সাম্রাজ্যবাদের পথ রুদ্ধ করাই মূল উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কেন মিশর থেকে ইসলামি শরিয়াহ-শাসন দূর করে মানুষের বানানো আইন চালু করেছে?

তবে আমরা যখন জানব যে, এটা ছিল ক্রুসেড যুদ্ধ, যার সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে বহু চক্রান্ত জড়িত ছিল, তখন সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আলেকজান্দ্রিয়া দখলের পর সমস্ত মিশরিদের উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন এক বার্তা প্রচার করে। সেখানে সে লিখে,

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", আল্লাহর কোনো সন্তান নেই এবং তাঁর মালিকানায় কোনো অংশীদার নেই।

ফরাসিদের পক্ষ থেকে, যারা স্বাধীনতা ও সমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত[২৫০]—

ফরাসি বাহিনীর সামরিক প্রধান বোনাপার্ট। সমস্ত মিশরবাসী জানে যে, বহু বছর ধরে মিশর শাসনকারী ব্যক্তিরা ফরাসি জাতিকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে আসছে।[২৫১]

তোমাদের হয়তো বলা হবে, আমি এখানে এসেছি তোমাদের ধর্মকে বিলুপ্ত করার জন্য। এটা চূড়ান্ত মিথ্যা, যা তোমরা বিশ্বাস করবে না।[২৫২] হিংসুকদের বলে দাও, আমি এখানে এসেছি শুধু জালিমদের থেকে তোমাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আর আমি মামলুকদের থেকে বেশি আল্লাহর ইবাদত করি, নবি ও কুরআনকে সম্মান করি।

.....

২৫০. এখানে ফরাসি বিপ্লবের স্লোগানের দিকে ইঙ্গিত স্পষ্ট—'স্বাধীনতা ভ্রাতৃত্ব সমতা'। জেনে রাখা ভালো যে, এটাই হচ্ছে ম্যাসনিকদের স্লোগান।

২৫১. এখানে নেপোলিয়ন স্পষ্টভাবেই তার হামলার একটি উদ্দেশ্য বলছে যে, সে মামলুকদের থেকে প্রতিশোধ নিতে এসেছে, যারা তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে (শাম ও মিশর) বসবাসকারী ফরাসিদের সাথে তাচ্ছিল্যের আচরণ করত। আজকে যারা ফরাসি হামলার প্রভাব নিয়ে লিখে, তারা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত এই ক্রুসেডীয় উদ্দেশ্যটি পাশ কাটিয়ে যায়।

২৫২. যেন সে বলতে চাচ্ছে, আমাকে গ্রহণ করে নাও।

tauhiderdak.com

ওহে মাশায়িখ, কাজি, ইমামগণ, গ্রিকজনতা[২৫৩] ও রাষ্ট্রের নেতাগণ, তোমরা তোমাদের জাতিকে বলো, ফরাসিও একনিষ্ঠ মুসলিম। যার প্রমাণ হলো, তারা গ্রেট রোমাতে ঢুকে সেখান থেকে পোপের চেয়ার সরিয়ে দিয়েছে, যা সর্বদা খ্রিষ্টানদেরকে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের দিকে উদ্বুদ্ধ করত। সে সাথে ফরাসি হচ্ছে উসমানি সুলতানের একান্ত প্রিয়ভাজন, তার শত্রু তাদের শত্রু, আল্লাহ তার শাসন অটুট রাখুক ইত্যাদি।'[২৫৪]

মামলুকরা 'ইমবাবা' যুদ্ধে তার কাছে পরাজিত হওয়ার পর সে কায়রোতে এসে উলফি বেগের ঘরে অবস্থান নেয়। সে নিজেকে মুসলিম এবং ইসলাম ও কুরআনপ্রেমী দাবি করত। আলিমদের মজলিশ পরিচালনা করত এবং কখনো সুন্নতি পোশাক পরত। সে ইসলামি শরিয়াহর পরিবর্তে কুফরি আইন প্রয়োগের জন্য আলিমদেরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করত। যা সে তার সাথে আনা আরবি ছাপাখানায় ছাপাত।

ব্রিটেনের ভারতীয় সাম্রাজ্যের পথ আটকানোর জন্য কত চমৎকার সব পদক্ষেপ!

এসব দেখার পরেও এটা ভাবা নির্বুদ্ধিতা যে, নেপোলিয়ন শুধুই ব্রিটিশদের আটকানোর জন্য এসেছিল।

হ্যাঁ, তার সাথে ব্রিটেনের বিরোধ ছিল এবং একে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করত। কিন্তু সে তার সাথে পূর্ণাঙ্গ এক ক্রুসেডীয় পরিকল্পনা নিয়ে এসেছে; যাতে মিশরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করা যায়। হয়তো এটা হবে বাকি মুসলিম-বিশ্বকে ধ্বংসের জন্য মূল কেন্দ্র। কারণ, বিভিন্ন প্রান্তের লোক এখানে ইলমের জন্য একত্রিত হয় এবং নুর গ্রহণ করে।

তার পরিকল্পনার প্রথম পয়েন্ট ছিল ইসলামি শাসন বিলুপ্ত করা, যা সে বাস্তবেই প্রয়োগ শুরু করেছিল। যা আজহারের এক আলিম প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ তাআলা তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেন; ফলে তিনি[২৫৫] তার আসল ইচ্ছা বুঝে যান। তখন সরাসরি তাকে বলে ফেলেন, 'যদি সত্যই তুমি মুসলিম হতে, তবে এখানে শরিয়াহ-শাসন ধ্বংস করে কুফরি আইন চালুর পরিবর্তে নিজ দেশ ফ্রান্সে ইসলামি শাসন চালু করতে।'

.....

২৫৩. আমি বুঝিনি, যে বার্তায় মুসলিমদের বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে, নেপোলিয়ন মুসলিম, সেখানে মিশরে অবস্থানকারী গ্রিকজনতার কথা এসেছে কেন!!

২৫৪. পুরো বক্তব্য দেখুন, আব্দুর রহমান জাবারাতির লিখিত 'আজায়িবুল আসার' বইয়ে (১৮২-১৮৩)।

২৫৫. তিনি ছিলেন শাইখ শারকাবি। যার ওপর নেপোলিয়ন অনেক চাপ দিয়েছিল।

tauhiderdak.com

আর সেই ছাপাখানা যা ছিল, এই হামলার মহা অবদান... নেপোলিয়ন এটা মূলত বহু কারণে এনেছিল। এখান থেকেই সে মিশরি জাতির উদ্দেশ্য দখলদার ক্রুসেডারদের আদেশ মান্য করার নির্দেশনা ছাপাত। যেমন এক বার্তায় সে লিখেছে, 'তাকদিরের ওপর ইমানের আবশ্যকীয় দাবি হচ্ছে ফ্রান্সের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ও তাদের বিরোধিতা না করা। কেননা, তাদের মিশর দখল করা ছিল আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির।' তেমনই এখানে থেকেই সে 'নেপোলিয়নের আইন' নামে লিফলেট ছাপাত, যেগুলো সে ধারাবাহিক ইসলামি শরিয়াহকে রহিত করার জন্য প্রকাশ করত।

যদিও পরবর্তী সময়ে এই ছাপাখানাকে নেপোলিয়নের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীতে আরবি ইসলামি শিক্ষা প্রচারে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এতে নেপোলিয়নের কোনো হাত নেই বা তার হামলার কোনো অবদান নয়। কারণ, এটা তো নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তার সময় যে কাজের ব্যবহার হয়েছে, তা ছিল একেবারে বিপরীত।

এই হামলার সাথে আসা জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের মিশনের লক্ষ্য ছিল ফিরআওনদের প্রভাব মুক্ত করা, যা ছিল আরও নিকৃষ্ট।

স্পষ্টবাদী এক প্রাচ্যবিদ তার 'নিম্ন-প্রাচ্য : সমাজ ও সংস্কৃতি' বইয়ে লিখেছে, 'আমরা যত মুসলিম-রাষ্ট্রে ঢুকেছি, সেখানে (প্রত্নতত্ত্ববিদের) মাধ্যমে ভূমি খুঁড়ে ইসলামপূর্ব সভ্যতা বের করে এনেছি। স্বাভাবিকত আমরা এটা চাই না যে, মুসলিমরা মুরতাদ হয়ে ইসলামপূর্ব বিশ্বাসে ফিরে যাক। তবে আমাদের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তারা ইসলাম ও সেই সব সভ্যতার মাঝে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে।'[২৫৬]

এটাই ছিল হামলার সাথে আসা জ্ঞানের আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা। এটা জ্ঞানের লক্ষ্যে ছিল না; বরং তা ছিল জ্ঞানের আবরণে ক্রুসেডীয় লক্ষ্য। এটাও ছিল ষোড়শ শতক থেকে শুরু হওয়া অন্যান্য ক্রুসেডীয় জ্ঞান আবিষ্কারের অভিযাত্রার মতোই।

ফিরআওনদের নিদর্শন হাজারো বছর ধরে বিদ্যমান ছিল। যা থেকে বহু কিছু চুরি ও ডাকাতি হয়েছে। এখন শুধু বিশাল সব উপাসনালয় ও কাঠামোগুলো রয়ে গেছে, যা মিশর ভ্রমণে আসা ব্যক্তিরা দেখতে যায় এবং এগুলোকে প্রাচীন অতীতের আশ্চর্য মনে করে। এগুলো দেখে বিনোদিত হয় এবং অতীত থেকে শিক্ষা নেয়। নিজ দেশে ফিরে গিয়ে যারা দেখেনি, তাদের কাছে বর্ণনা করে। কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া

.....

২৫৬. Near East; Culture and Society, Edited b T .Culer Young

tauhiderdak.com

এভাবেই বিষয়টা শেষ হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে মিশরি মুসলিমরাও এগুলো প্রত্যক্ষ করত। এগুলো বানানোর সূক্ষ্মতা দেখে আশ্চর্য হতো। তবে তাদের বিশ্বাসে এটা থাকত যে, এগুলো শুধুই মূর্তি ও ভাস্কর্য, যা পূর্বের জাতিরা ফেলে গেছে। এখন আর সেই সব মূর্তিপূজারির সাথে বর্তমান মুসলিমদের কোনো সম্পর্ক নেই।

মুসলিম-বিশ্বের সেসব স্থানে মূর্তিপূজকদের নিদর্শন রয়ে গেছে, যারা ইসলাম আসার পূর্বে জমিনে বাস করত, সর্বত্র অবস্থা একই; চাই তা জাজিরাতুল আরবে হোক বা শামে বা ইরাকে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রে। প্রায় হাজার বছরের অধিক সময় যাবৎ একই অবস্থা বিরাজ করছিল, মানুষ তাদের ইসলামের ওপরই ছিল। আর জমিনের এসব মূর্তিগুলো তাদের মাঝে শুধু ইতিহাসের শিক্ষা ছাড়া আর কিছুর দিকে ধাবিত করত না।

অন্যদিকে ক্রুসেড হামলার সাথে নিয়ে আসা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র ছিল, মুসলিম-ভূমি খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন বের করে আনা; যাতে মুসলিমদের সম্পর্ক ইসলাম ও সেসব সভ্যতার মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। যা ছিল সর্বশেষ তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে ফেলার প্রস্তুতিস্বরূপ।

নেপোলিয়নের মিশর আগমনের একটি উদ্দেশ্য এটাও ছিল। তাই চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় হবে যদি এটা বলা হয় (যা বহু বুদ্ধিজীবীরা বলে) যে, তার উদ্দেশ্য ছিল শুধুই জ্ঞানভিত্তিক। অথচ তাদের সঙ্গীরাই ভিন্ন সাক্ষ্য দিয়েছে।

এখানে লক্ষ্য ছিল, মুসলিম মিশরিদের মাঝে ফিরআওনি না'রা (স্লোগান) উচ্চারিত হওয়া। ফলে তখন তারা নিজেদের জাতীয়তা ইসলামের সাথে নয়; বরং ইসলাম থেকে দূর করে মিশরের দিকে সম্পৃক্ত করত। যেমন 'নীলনদের কবি' হাফিজ ইবরাহিম বলেছে,

'আমি মিশরি, পিরামিডের সন্তান * কালের আবর্তনে যা ধ্বংস হয়নি।'

যদিও হাফিজ ইবরাহিমের বহু ইসলামি কবিতা রয়েছে। তবে এখানে নিকৃষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। তা হলো, ইসলাম ও প্রাচীন সভ্যতার সাথে সম্পর্কের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়া। যা সেই প্রাচ্যবিদ স্পষ্ট করে বলেছে।

নেপোলিয়নের হামলার পেছনে সাম্রাজ্যবাদের পথ আটকানোর পাশাপাশি নিঃসন্দেহে আরও কিছু মূল উদ্দেশ্য আছে। সেগুলো হলো, ইসলামি শাসন বিলুপ্ত করা এবং

tauhiderdak.com

কুফরি আইন চালু করা। ফিরআওনি স্লোগান প্রচার করা; যাতে মিশরকে মুসলিম-বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় বা তাদেরকে স্বয়ং ইসলাম থেকে দূরে সরানো যায়।

যদি আমরা এর সাথে যুক্ত করি, সেসব উলঙ্গ নারীদের বিষয়, যাদের ব্যাপারে জাবারাতি আলোচনা করেছে। এগুলো ছিল এমন সব বেশ্যা নারী, যাদেরকে নেপোলিয়ন সাথে করে নিয়ে এসেছিল। এরা কায়রোর রাস্তায় নগ্ন-উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত, ফিতনার প্রসার ঘটাত এবং অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিত। তারা কিছু মুসলিম মেয়েকেও তাদের অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, যা জাবারাতি তার বইয়ে বহু স্থানে বলেছে।[২৫৭]

যদি আরও যুক্ত করি, নেপোলিয়নের মিশর দখলের পরেই ভয়াবহ সেই বার্তা, যেখানে ইহুদিদেরকে তাদের পূর্বপুরুষের ভূমিতে ফিরে আসার আহ্বান করেছিল।[২৫৮]

যদি সবগুলো সামনে রাখি, তাহলে আমাদের সামনে নেপোলিয়নের মিশর আগমনের পেছনে বিশাল চক্রান্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে। যাতে ইহুদিদের পূর্ণ সহায়তা ছিল, আর তারাই তো ফরাসি বিপ্লবের আগুন প্রজ্বলিত করেছে, যা থেকে নেপোলিয়ন বের হয়ে এসেছে এবং তার কাজের নির্দেশনা গ্রহণ করেছে।[২৫৯]

এগুলো হচ্ছে ফরাসি হামলার সত্যিকার ফলাফল, যা ইউরোপীয়দের হাতে লিখিত ইতিহাসগ্রন্থে আলোচিত হয়নি। যে বইগুলো পড়েই আজকের মুসলিমদের বড়ো বড়ো ইতিহাসবিদ তৈরি হচ্ছে!

বিষয়টা যা-ই হোক, নেপোলিয়ন বোকামি করে আল-আজহারের দুর্গে হামলা চালায় এবং একে ঘোড়ার আস্তাবল বানায়। মিশরিদেরকে জোর করে ইসলা থেকে বের করতে চেষ্টা করে। এ ছাড়া ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামরিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে নেপোলিয়ন মিশর ত্যাগ করে ফ্রান্সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই হামলার ফলে সেখানে কাফিরদের প্রতি মুসলিমদের রাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একসময় সুলাইমান হালাবি নেপোলিয়নের পরবর্তী কমান্ডার ক্লেভারকে হত্যা করে ফেলে।[২৬০]

.....

২৫৭. আজায়িবুল আসার - (২৩১, ২৪৪-২৫১, ২৭২-২৭৩, ৩০২, ৪৩৬-৪৩৭)।

২৫৮. বিষয়টা এত স্পর্শকাতর হওয়া সত্ত্বেও খুব কমই আলোচিত হয়। (জায়োনিস্ট পরিভাষা ও ব্যাখ্যাসমূহ, পৃষ্ঠা নং ২৪৩)

২৫৯. বিস্তারিত জানার জন্য 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ' বইয়ের 'ইউরোপ ধ্বংসে ইহুদিদের ভূমিকা' অধ্যায় দেখুন।

২৬০. মিশরিরা ফরাসি হামলাকে নজিরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতায় প্রতিরোধ করে। তবে তারা ফরাসিদের বিরুদ্ধে মিশরি হিসেবে নয়, যা তাদের পাঠ্য সিলেবাসের ইতিহাস বইয়ে চিত্রায়িত হয়েছে; বরং মুসলিম হিসেবে তাদের ভূমি দখলকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়েছে। এটা যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামি জিহাদ

tauhiderdak.com

এসব কারণে ফরাসিরা মিশর ত্যাগে বাধ্য হলেও দুঃখজনকভাবে তাদের সব মিশন বন্ধ হয়নি। তাদের চিন্তাবিদরা তখনও তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে; যদিও তাদের হামলাকারীরা চলে গেছে। এটাই ছিল আশ্চর্যজনক বিষয়, যার কোনো ব্যাখ্যা আমাদের কাছে নেই। তখনও নেপোলিয়নের মতো মুসলিম দাবিদার কিছু মুনাফিক রয়ে যায়, যেমন সুলাইমান পাশা ফ্রান্সি, পরবর্তী সময়ে তার অনেক বড়ো ভূমিকা ছিল। এ ছাড়া কায়রোর মুনিরা শহরে নেপোলিয়ন যে ফিরআওনি নিদর্শন গবেষণা ইনস্টিটিউট করেছিল, তা আজও বহাল তবিয়তে রয়েছে।

ফরাসিরা হয়তো বিভিন্ন অবস্থার ফলে তাদের জায়োনিস্ট ক্রুসেডীয় চক্রান্ত বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তাকদির তাদের কাছে এমন ব্যক্তিকে টেনে এনেছে, যে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করেছে। সে ছিল গ্রেট মুহাম্মাদ আলি।

ছিল, এর প্রমাণ হলো এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন আলিমগণ। আজহারের প্রতি নেপোলিয়নের রাগের কারণ হলো, এটাই ছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের মূল কেন্দ্র। এ ছাড়া এখানে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো, ক্লেভারকে হত্যাকারী সুলাইমান হালাবি মিশরি ছিল না; বরং সে ছিল মুসলিম, যাকে তার ইসলাম মুসলিম-ভূমিতে ক্রুসেড হামলার কমান্ডারকে হত্যার দিকে ধাবিত করেছে। কারণ, তখনও দেশপ্রেমের দাবি উচ্চারিত হয়নি এবং এটা মিশরিদেরকে ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো প্রেরণা জোগায়নি। তাই বর্তমানে ইতিহাস যেভাবে বিকৃত করে উপস্থাপিত হচ্ছে, সেটাও মুসলিমদের অন্তরে স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের প্রভাব।

tauhiderdak.com

মুহাম্মাদ আলির ভূমিকা

মুহাম্মাদ আলি ছিল একজন কুখ্যাত ব্যক্তি। যে কঠোরতা ও শক্ত হৃদয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উসমানি সরকার তাকে সেসব গ্রামে পাঠাত, যারা তাদের ওপর ধার্যকৃত অর্থ প্রদানে দেরি করত। তখন সে সেখানে গিয়ে গ্রামের পাশে অবস্থান নিত এবং ছিনতাই-রাহাজানি করত এবং নিরাপদ মানুষকে ভয় দেখাত। তখন গ্রামবাসী বুঝত যে, কষ্ট হলেও বিশাল অর্থ প্রদান করাই উত্তম মুহাম্মাদ আলি ও তার সেনাদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার তুলনায়।

যে ছিল সম্মান আর ক্ষমতার মোহে উন্মাদ। এগুলো ছিল তার উপযুক্ত গুণ।[২৬১]

যদিও কারও হাতে এমন নিশ্চিত প্রমাণ নেই যে, ফ্রান্সই সুলতানকে অনুরোধ করেছিল, যাতে মুহাম্মাদ আলিকে মিশরের গভর্নর হিসেবে পাঠানো হয়। তবে অবস্থা সেদিকেই ইঙ্গিত করে।[২৬২]

মোটকথা, যেকোনোভাবে হোক সে ১৮০৫ সালে উসমানি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গভর্নর হিসেবে এখানে এসেছে। অর্থাৎ ফ্রান্সের হামলা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার তিন বছর পর। মিশর ততদিনে সুলতানের আনুগত্যে মামলুক শাসনাধীনে ফিরে এসেছিল।

ফ্রান্স তাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নেয়; যাতে তার মাধ্যমে তাদের সমস্ত চক্রান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে। তার জন্য সুলাইমান পাশা ফ্রান্সির নেতৃত্বে সে যুগে প্রাপ্ত সর্বাধুনিক অস্ত্র ও সরঞ্জামসমৃদ্ধ এক বাহিনী গঠন করে দেয়। তখনকার সময়ের সর্বাধুনিক যুদ্ধজাহাজ দিয়ে তার জন্য নৌ-বহর গড়ে তোলে। দময়াতে তার জন্য সামুদ্রিক ঘাঁটি বানিয়ে দেয়।

মিশরের জনমত আকৃষ্ট করার জন্য দাতব্যসংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

এসব কিছু করেছে কি মুহাম্মাদ আলির মহব্বতে? না মিশরের মহব্বতে?

বরং সব ছিল তাদের সেই ক্রুসেডীয় স্বার্থ বাস্তবায়নার্থে, যা তারা বাধ্য হয়ে ফিরে যাওয়ার কারণে অর্জন করতে পারেনি।

.....

২৬১. এটা কোনো কাকতালীয় নয় যে, যাদেরকে ইসলামের সাথে যুদ্ধের জন্য বাছাই করা হয়েছিল, সবাই সম্মানের প্রতি উন্মাদনা ও কঠোর হৃদয়ের অধিকারী ছিল। যেমন মুহাম্মাদ আলি, কামাল আতাতুর্ক, জামাল আব্দুন নাসের। কারণ, এই গুণদুটি এই মহা দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক ছিল।

২৬২. যদি কোনো ঐতিহাসিক এই গবেষণাটুকু করত, তাহলে কতই না ভালো হতো।

tauhiderdak.com

মুহাম্মাদ আলি মিশরকে ইসলামি কেন্দ্রস্থল থেকে একেবারে সর্বশেষ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করার মতো ভয়ানক ভূমিকা পালন করেছে; চাই সে তা জেনে-বুঝে করুক বা ক্রুসেডাররা তাকে ব্যবহার করুক। তবে কামাল আতাতুর্ক ও জামাল আব্দুন নাসের এই দুই অভিজ্ঞতা থেকে এটাই ধারণা হয় যে, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল এবং দক্ষতার সাথে পালন করেছে। তবে স্বেচ্ছায় হোক বা ব্যবহৃত, দুই অবস্থাতেই সে তার কাজ করে গেছে। বাস্তবায়নকারী ইচ্ছার গণ্য করা ব্যতীতই সে একটি নির্দিষ্ট ফলাফলের দায়িত্ব আদায় করেছে। তবে সর্বাবস্থায় একটি বিষয় নিশ্চিত, সত্যিকার মুসলিম কখনো এমন কাজ করতে পারে না, 'স্বেচ্ছায় বা না বুঝে' কখনোই না। কেননা, তার ইসলাম তাকে ইসলামের শত্রু থেকে নির্দেশনা গ্রহণে বাধা দেবে।

ইসলামের শত্রুদের স্বার্থে মুহাম্মাদ আলি যে ভূমিকা পালন করেছে, এর বাস্তবতা বোঝার জন্য আমাদের জানতে হবে শত্রুদের আসল লক্ষ্য কী ছিল।

তারা সামগ্রিকভাবে ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়। তবে তাদের পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে; যাতে সর্বশেষ তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে পারে। এসব লক্ষ্যের মধ্যে হচ্ছে, উসমানি শাসন ধ্বংস করা। পুরো মুসলিম-বিশ্বকে পশ্চিমাকরণ করা, বিশেষ করে মিশরকে।

এখানে উসমানি শাসন ধ্বংসের বিষয়টা একেবারেই স্পষ্ট। আর বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে পশ্চিমাকরণের প্রথম দায়িত্ব হলো ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামি জিহাদের চেতনা নষ্ট করে ফেলা; যাতে সশস্ত্র ক্রুসেড যুদ্ধে তারা যে ধারাবাহিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে, তা থেমে যায়। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা বিশ্বাসের বাঁধ ভেঙে ফেলেছে। যা সর্বদা প্রত্যেক মুসলিম স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সে হচ্ছে মুসলিম এবং তার শত্রুরা হচ্ছে কাফির, যাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ফরজ এবং তাদেরকে মুসলিম-ভূমি দখলের সুযোগ দেওয়া যাবে না। তাই যখন পশ্চিমাকরণ হয়ে গেছে, তখন আর তার অন্তরে এই বাধা বহাল থাকেনি এবং ইসলাম একজন মুসলিমের মাঝে যে চেতনা জাগ্রত করে, তা আর তার মধ্যে জাগ্রত হয় না। কেমন যেন চিন্তা-বিশ্বাসে পশ্চিমাকরণ হচ্ছে, মুসলিম-বিশ্বের পশ্চিমাদের সামনে অনুগত রাখার চাবিকাঠি (প্রথমে তাদেরকে সামরিকভাবে পরাজিত করার পর)। কারণ, সে যখন পশ্চিমাপন্থী হয়ে যাবে, তখন সে অনুভব করবে যে, তার সম্পর্ক এখন ইসলামের সাথে নেই; বরং তা এখন পশ্চিমাদের জন্য। ফলে কখনোই তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছা জাগবে না; এমনকি কখনো এই

tauhiderdak.com

ইচ্ছা জাগ্রত হলেও সামগ্রিক আনুগত্যের অধীনেই 'স্বাধীনতা' লাভ করবে, যা তাকে তার মনিবের সীমা থেকে বের করবে না। সে মনিবের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে।

শত্রুদের পরিকল্পনা বোঝার পর এখন আমরা মুহাম্মাদ আলি ফ্রান্সের আয়ত্তে যাওয়ার পরের ভূমিকা দেখব।

ক্রুসেডীয় পরিকল্পনা ছিল (ফ্রান্স যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছিল) মুহাম্মাদ আলিকে শক্তিশালী করা এবং সুলতান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা। যার ফলে মুসলিম একটি ভূমি ইসলামি রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যাবে (যা নিঃসন্দেহে একে দুর্বল করে ফেলবে।) অতঃপর মুহাম্মাদ আলি অন্যান্য গভর্নরদের জন্য প্রলুব্ধকারী দৃষ্টান্তে পরিণত হবে। একই সাথে মিশরকে পশ্চিমাকরণ করা হবে; যাতে এটা সর্বদা পশ্চিমাদের অনুগত থাকে এবং চূড়ান্তভাবে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মুহাম্মাদ আলি তার এই দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করেছে। ফ্রান্স তার জন্য যে বাহিনী প্রস্তুত করেছে এবং যা সুলাইমান পাশা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, এই বাহিনী দ্বারা মুহাম্মাদ আলি শুধু খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং স্বয়ং খলিফার সাথেও যুদ্ধ করেছে; এমনকি যদি ব্রিটেনের অনুপ্রবেশ না ঘটত, তাহলে খলিফার ওপর হয়তো জয়ী হয়ে যেত। ব্রিটিশরা বাহ্যত খলিফার সারিতে অবস্থান নেয়। বাস্তবে এর পেছনে ফ্রান্সের প্রতিহিংসা কাজ করছিল, যারা খলিফার বন্ধুত্ব এবং মিশরের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বাগিয়ে নিয়েছিল। একই সাথে মিশরকে সত্যিকার অর্থে মুহাম্মাদ আলির হাতে তুলে দেয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তার বংশের হাতে এর শাসন প্রদান করে; যদিও শুধু নামে সুলতানের আনুগত্য বাকি ছিল। (তা সত্ত্বেও ইউরোপের পুরো খ্রিষ্টজগৎ নাফিরিনের যুদ্ধে মুহাম্মাদ আলিকে ধ্বংসের জন্য একত্রিত হয়েছিল, যখন সে নিজের সীমা ভুলে খ্রিষ্টান-রাষ্ট্র গ্রিসকে আক্রমণে দুঃসাহস করে। খ্রিষ্টানরা তাকে বড়ো করেছে এবং শুধুই ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। তাই যদি সে তা করে, তবে তাকে পূর্ণ সাহায্য করা হবে। কিন্তু যদি তার ব্যক্তিগত লোভ বেড়ে যায় এবং খ্রিষ্টজগতের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে আদব শিক্ষা দেওয়া; বরং প্রয়োজনে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা আবশ্যক।)

দায়িত্বের অপর অংশ ছিল মিশরকে পশ্চিমাকরণ। যা মুহাম্মাদ আলি বাস্তবায়ন করেছে যুবকদেরকে ইউরোপে শিক্ষার জন্য প্রেরণের মাধ্যমে। এটা ছিল তার সবচেয়ে ক্ষতিকর কর্ম। কারণ, তখন থেকে শিক্ষাখাতে সেক্যুলার ধারার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে মুসলিম মিশরের পুরো জনজীবনে তা ছেয়ে যায়।

tauhiderdak.com

কেউ হয়তো বলতে পারে, তার সামনে মিশরকে উন্নত করার ভিন্ন কোনো পথ খোলা ছিল না। এই কথাটি চূড়ান্তভাবে ভুল।

কারণ, যদি মুহাম্মাদ আলির স্থলে সচেতন কোনো মুসলিম নেতা হতেন, যিনি ইসলামি মিশরকে উন্নত করতে চাচ্ছেন, অর্থাৎ ইসলামি নীতিমালা ও ভিত্তির ওপর, তাহলে তার সামনে আরও বহু পথ ছিল। যেমন আল-আজহারের উত্থান ঘটানো, যা শুধু মিশর নয়; বরং পুরো মুসলিম-বিশ্বের জন্য জ্ঞানের উৎস ছিল। তিনি একে সোনালি যুগের ইসলামি ভার্সিটিগুলোর মতো সমৃদ্ধ করতে পারতেন। যেখানে তখন শরিয়াহ ও পার্থিব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। যেখানে আলিমের পাশাপাশি মুসলিম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, রসায়ন ও পদার্থবিদ তৈরি হতো। যারা একদিন ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল।

আর যদি তার রাষ্ট্রে অর্থাৎ পুরো মুসলিম-বিশ্বে এসব বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ সংকট থাকত, যারা আজহারের উত্থানের জন্য আবশ্যক, তাহলে তখন তার উচিত ছিল নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে প্রেরণ করা। যাদেরকে দ্বীন, তাকওয়া, বিচক্ষণতা ও গাম্ভীর্যের ভিত্তিতে সূক্ষ্মভাবে বাছাই করা হবে। যারা ফিতনার বয়স পার করে ফেলেছে এবং বিবাহের মাধ্যমে সুরক্ষিত। ফলে তারা চারিত্রিক অনিষ্টতায় ফেঁসে যাবে না। তখন তারা সেখানে বিভিন্ন জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে ফিরে এসে ইসলামি পরিবেশে ছাত্রদের শিক্ষা দেবে। এভাবে যুবকরা ইসলামের ওপর সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদের জ্ঞানের ঘাটতিও পূরণ করতে সক্ষম হবে। যার ফলে তাদের মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুভূতি ফিরে আসবে, যা মুসলিমরা দীর্ঘ যুগের অধঃপতনের ফলে হারিয়ে ফেলেছে। আর তখন মিশরের উত্থান ঘটবে। সেই সাথে আজহারের মাধ্যমে পুরো মুসলিম-বিশ্বের উত্থান হবে, যেখানে পুরো বিশ্ব থেকে আসা ছাত্ররা পড়াশুনা করে। এভাবেই সে মুসলিম নেতা হিসেবে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে তার দায়িত্ব পালন করতে পারত।

মুহাম্মাদ আলি কি এভাবে চিন্তা করেছে বা সে কি এদিকে চলার ইচ্ছা করেছে? যদি সে তা করত, তাহলে কি তাকে বাছাই করা হতো?! পশ্চিমারা কখনোই তাকে এই মহা দায়িত্ব আদায়ের জন্য আনত না। তার সমগ্র মানসিকতা ও অভিমুখ ছিল ভিন্ন দিকে, পশ্চিমের দিকে।

তাই সে দলে দলে অল্প বয়সি যুবকদের ইউরোপে পাঠিয়েছিল। যখন তারা ছিল ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার বয়সে। ছিল না কোনো কিছু দ্বারা সুরক্ষিত। যাতে তারা মনমতো জ্ঞানার্জন করতে পারে, আবার মনমতো অশ্লীলতাও করতে পারে। অথবা

tauhiderdak.com

ইচ্ছা হলে জ্ঞান ও অশ্লীলতা একই সাথে গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তারা ফিরে এসে পশ্চিমা মিশনের অগ্রপথিক হয়ে উঠবে, যারা পুরো দেশকে সেদিকে টেনে নিয়ে যাবে।

এটা কোনো ধর্তব্য নয় যে, সে প্রতিটা দলের সাথে একজন ইমাম দিত, যারা তাদের নামাজ পড়াবে এবং দ্বীন শিক্ষা দেবে। কারণ, সে যুগে মুসলিমদের অন্তরে নামাজের এতটুকু গুরুত্ব ছিল যে, কেউ এটা কল্পনাও করত না যে, কোনো মুসলিম তা আদায় করবে না। এটা কমপক্ষে মর্যাদাপূর্ণ 'ঐতিহ্য' ছিল, যা কোনো মুসলিম ত্যাগ করতে পারে না। তাই এটা কল্পনাতীত যে, কোনো মুসলিম দলের মধ্যে নামাজের জন্য ইমাম থাকবে না। মুহাম্মাদ আলির পক্ষেও তখন এই রীতি ভাঙার ক্ষমতা ছিল না।

কিন্তু সেই ইমামরা কী করেছে?!

রিফাআহ রাফি তাহতাবি ছিল সেই মহান ইমামদের একজন, অন্তত ফ্রান্সে যাওয়ার সময় এমনই ছিল। কিন্তু ফিরে এসেছে পশ্চিমাকরণের ইমাম হয়ে। দুই বছর পর সে যেদিন ফিরে এসেছিল, তার পরিবার তাকে উষ্ণ আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু সে রেডিওতে তাদেরকে কৃষক বলে তাচ্ছিল্য করে, যারা তার মতো ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য উপযুক্ত ছিল না।

অতঃপর সে একটি বই লিখে। যেখানে প্যারিসের প্রশংসা করে এবং নারী-স্বাধীনতার দাবি তোলে, অর্থাৎ নগ্নতা ও অবাধ মেলামেশার আহ্বান করে। যুগল নাচের ব্যাপারে নোংরা প্রচারণা চালায়। সে বলে, এটা শুধু মিউজিকের তালে তালে কিছু ব্যায়ামের মতো নড়াচড়া, যাকে মন্দ হিসেবে দেখা উচিত নয়।

স্বাভাবিকভাবেই এটা অপ্রত্যাশিত ছিল যে, মিশরের মুসলিম জাতি তার এই আহ্বানে সাড়া দেবে। কারণ, তখনও মুসলিমদের অন্তরের ইসলাম অবশিষ্ট ছিল এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি রীতিনীতি প্রয়োগ ছিল। যা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, এ ধরনের আহ্বানকে তাচ্ছিল্য ও কঠিন প্রত্যাখ্যানের বস্তু বানানোর জন্য যথেষ্ট।

তবে বর্শার ফলার লক্ষ্য ছিল পশ্চিমের দিকে।

রিফাআহ তাহতাবি (তার পেছনে মুহাম্মাদ আলি) যে কাজ করেছে, তা নির্দিষ্টভাবে ছিল নিচের ধারাবাহিকতায়—

tauhiderdak.com

প্রথমত মিশর ও অন্যান্য মুসলিম-রাষ্ট্রের মুসলিমদের জীবন এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তা ছিল ইসলাম (সাময়িক সময়ের জন্য সব বিচ্যুতির থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে)। অতঃপর রিফাআহ তাহতাবি এসে প্রতিষ্ঠিত বিশাল কেন্দ্রের পাশে ছোটো একটি কেন্দ্র স্থাপন করে, যা ছিল পশ্চিমা সভ্যতা। এবং মুসলিমদেরকে এখানে এসে কেন্দ্রীভূত হওয়ার আহ্বান করে। ধীরে ধীরে মুসলিমদের জীবনে এই ছোটো বিন্দুটি বড়ো হতে থাকে, একসময় ইসলামের পাশে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। আরও কিছু দিন পর এই ছোটো বিন্দুটিই প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং পূর্বের মূল কেন্দ্রটি ছোটো হয়ে অস্তিত্ব বিলীনের উপক্রম হয়।

ধারাবাহিক পরিবর্তনের এই মিশন সম্পন্ন হতে প্রায় এক শতাব্দীকাল গত হয়েছে। তবে এটা ছিল চলমান প্রক্রিয়া, যা কখনো থেমে থাকেনি; বরং সর্বদা বিস্তৃত হয়েছে, যা আমরা সামনের অধ্যায়সমূহে আলোচনা করব। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধাপগুলো অনুসরণ করব। সামাজিক, চারিত্রিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক। আর বিশেষ করে 'নারী-স্বাধীনতা'র বিষয়টি। তবে এই আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে এই প্রশ্ন করতে হবে, কেন এই পরিবর্তন ঘটেছে?

এটা কি পশ্চিমাদের কাছে সামরিক পরাজয়ের পর 'বিজিতরা বিজয়ীদের অনুকরণে'র রীতি হিসেবে ঘটেছে?

শুধু এই একটা বিষয় সেই শতাব্দীতে যা ঘটেছে, তা ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা, তখন পুরো মুসলিম-বিশ্ব পশ্চিমাকরণ হয়ে গেছে! তারা ইসলামের সব মূলনীতি ভুলে গেছে। কেমন যেন তারা কখনো মুসলিম ছিল না; বরং তারা মনে হয় পূর্বে ধারাবাহিক তেরোশ বছর ইসলামের ওপর জীবনযাপন করেনি!

শুধু সামরিক পরাজয় কি এই ভয়াবহ পরিবর্তন ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট হবে? যেখানে মাত্র এক শতাব্দীতে এত বিশাল অধঃপতন ঘটেছে! সঠিক আকিদা-বিশ্বাসধারী জাতির ওপর সামরিক পরাজয় কখনো এত প্রভাব ফেলে না; বরং অনেক সময় বিন্দু পরিমাণ প্রভাবও ফেলতে পারে না।

মুসলিমরা উহুদে কঠিন পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সেখানের বাস্তব অবস্থা বোঝার জন্য শুধু এই আয়াতটুকু যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

tauhiderdak.com

'(স্মরণ করো) যখন তোমরা ওপরের দিকে ছুটে যাচ্ছিলে এবং কারও দিকে ফিরছিলে না; অথচ তোমাদের পেছনে রাসুল তোমাদের ডাকছিলেন।'[২৬৩]

এই পরাজয় তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত করেছে; কারণ, তারা এটা কল্পনাও করতে পারেনি যে, তারা মুমিন এবং শত্রুরা কাফির হওয়া সত্ত্বেও তারা পরাজিত হতে পারে!! এমনকি তারা হতভম্ব হয়ে বলেছে, 'এটা কোথা থেকে এসেছে?' 'কীভাবে সম্ভব?'

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا

'কী ব্যাপার! যখন তোমাদের ওপর একটি বিপর্যয় এল—যার দ্বিগুণ বিপর্যয় ইতিপূর্বে তোমরা (তোমাদের প্রতিপক্ষের ওপর) ঘটিয়েছিলে—তখন তোমরা বললে, "এটা কোথা থেকে এল?"'[২৬৪]

কিন্তু পরাজয়ের পর আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা ছিল ক্ষত সুস্থকারী শান্তভাবে—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং বিষণ্ণ হয়ো না। (প্রকৃত) ইমানদার হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[২৬৫]

যেদিন থেকে এই নির্দেশনা নাজিল হয়েছে, উম্মাহ এটা বুঝে নিয়েছে এবং এই মতে আমল করেছে। ফলে পরাজয় আর কখনো তাদের হতোদ্যম করতে পারেনি। কেননা, এটা তাদের ইমানকে বৃদ্ধি করত এবং সেসব ব্যক্তি থেকে সান্ত্বনা গ্রহণ করত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ - وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ - فَآتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

২৬৩. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৫৩।
২৬৪. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৬৫।
২৬৫. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৩৯।

tauhiderdak.com

'কত নবি যুদ্ধ করেছেন! তাঁদের সাথে অনেক ধার্মিক লোক ছিল। আল্লাহর পথে (যুদ্ধে) তাদের যে কষ্ট হয়েছে, তাতে তারা ক্লান্ত হয়নি; তারা দুর্বলও হয়নি এবং নতি স্বীকারও করেনি। আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের ভালোবাসেন। তারা কেবল বলেছে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন, আমাদের পদক্ষেপসমূহ দৃঢ় করুন এবং কাফির লোকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।" অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার ও আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করেছেন। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'[২৬৬]

এমনকি তাতার ও ক্রুসেডারদের হাতে কঠিনভাবে পরাজিত হওয়ার পরেও।

তাতাররা চূড়ান্ত আক্রমণ করেছিল; এমনকি তারা আব্বাসি শাসনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং বাগদাদকে তছনছ করে ফেলে। মানুষকে এত নির্যাতন করে যে, মুসলিমদের রক্তে চল্লিশ দিন নদীতে লাল পানি প্রবাহিত হয়েছে। মুসলিমদের মাঝে দুর্বলতা ও ভীতি এতটা প্রবল ছিল যে, কোনো তাতার সেনা বাগদাদের রাস্তায় কোনো মুসলিমকে বলত, 'এখানে দাঁড়া, আমি তরবারি নিয়ে এসে তোকে হত্যা করব।' তখন সেই মুসলিম দুর্বল ও লাঞ্ছিত অবস্থায় সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকত, যতক্ষণ না তাতার সেনা তরবারি এনে তাকে হত্যা করছে। এসব সত্ত্বেও মুসলিমদের অন্তর এতটা নিচে নামেনি যে, তারা তাতারদেরকে তাদের থেকে উত্তম বা তাদেরকে সম্মানের উপযুক্ত মনে করবে; বরং তাদের দৃষ্টিতে তাতাররা ছিল জংলি বর্বর পৌত্তলিক জাতি, যারা শুধুই অবজ্ঞা ও ঘৃণার উপযুক্ত; এমনকি বিজয়ী হলেও।

ক্রুসেডারদের হামলা ছিল একেবারে আকস্মিক; কারণ, মুসলিমরা তখন ছিল অপ্রস্তুত। যা প্রায় দুই শতাব্দীকাল চলমান ছিল। তারা তখন মিশর ও শামে ছোটো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বসে এবং মুসলিমরা তাদের হাতে বারবার লাঞ্ছনার শিকার হয়, সর্বশেষ আল্লাহ তাআলা সালাহুদ্দিনের হাতে বিজয় দান করেন। এসব সত্ত্বেও মুসলিমদের অন্তর এত নিচে নামেনি যে, তারা খ্রিষ্টানদেরকে তাদের থেকে উত্তম বা কোনো সম্মানের উপযুক্ত মনে করবে; বরং তাদের দৃষ্টিতে খ্রিষ্টানরা ছিল মুশরিক ক্রুশের পূজারি। তাদের শিরক ও চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে মুসলিমরা তাদেরকে প্রচণ্ড রকম ঘৃণা করত। তারা খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে বলত, তারা হচ্ছে দাইয়ুস; কারণ, রাস্তায় স্বামী-স্ত্রী একসাথে হাঁটার সময় যদি স্ত্রীর কোনো ছেলে বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হতো, তখন স্বামী

.....

২৬৬. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৪৬-১৪৮।

tauhiderdak.com

সাইডে সরে যেত; যাতে মহিলা তার বন্ধুর সাথে যতক্ষণ ইচ্ছা কথা বলতে পারে![২৬৭]

তাই বোঝা গেল, আকিদাধারী উম্মাহর ওপর সামরিক পরাজয় কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না, তা যত প্রচণ্ড ও অপ্রত্যাশিতই হোক।

বলা হতে পারে, মুসলিমদের সর্বশেষ পরাজয়ের সাথে কাফিরদের বিজ্ঞান, সভ্যতা ও বস্তুগত উন্নতির ফলে তাদের মাঝে এই প্রভাব পড়েছে এবং তাদের এমন পরিবর্তন করে ফেলেছে। কারণ, তারা প্রথমে হতবাক হয়ে গেছে, পরবর্তী সময়ে তাদের এই বিশাল পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আবিষ্কার করে।

এই কথাটি বাহ্যত আশ্বস্তকারী মনে হয়। কারণ, মুসলিমরা যখন পশ্চিমাদের সামনে তাদের অধঃপতন আবিষ্কার করে, তখন তা নিঃসন্দেহে পশ্চিমাদের প্রতি মুগ্ধতা সৃষ্টি করে। কিন্তু শুধু এটাই মূল কারণ বা সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

মুসলিমদের প্রথম যুগে তারা পার্শ্ববর্তী দুই শক্তি রোম ও পারস্যের সামনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং বস্তুগত ও সাংগঠনিক দিকে এতটা পিছিয়ে ছিল, যা তুলনাহীন। তাই মুসলিমরা তখন এই ক্ষেত্রে তাদের থেকে গ্রহণ ও শিক্ষার মুখাপেক্ষী ছিল। কিন্তু আমরা প্রথম অধ্যায়ে যেমনটা ব্যাখ্যা করেছি, তারা কখনোই এটা মনে করেনি যে, তাদের শত্রুরা তাদের থেকে ঊর্ধ্বে। অথবা তাদের শত্রুদের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, চালচলন তাদের কাছে যা আছে, তা থেকে উত্তম; বরং ইমানের মর্যাদার অবস্থান থেকে এসব কিছুকে দেখেছে এভাবে যে, এগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহিলিয়াত, যারা আল্লাহর সুপথপ্রাপ্ত নয় এবং আল্লাহর দ্বীন তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে না। এই হিসেবে তারা তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করেছে এবং বস্তুগত ও সাংগঠনিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করেছে। অতঃপর এগুলোকে তাদের নিজেদের জীবনপদ্ধতির অনুগত করে ফেলেছে। কিন্তু কখনোই তাদের জাহিলি বিশ্বাস, চিন্তাধারা বা আচরণবিধি গ্রহণ করেনি। আর এটাই হচ্ছে কোনো মুসলিম জাতির যখন নিজেদের মধ্যে কোনো কিছুর ঘাটতি দেখতে পাবে এবং তা জাহিলি জাতির মাঝে খুঁজে পাবে, তখন সেগুলো গ্রহণের সঠিক পন্থা।

কিন্তু এই সময়ে এসে তাদের আচরণ সম্পূর্ণ পালটে যায়।

.....

২৬৭. কিন্তু সর্বশেষ পরাজয়ের পর অবস্থা সম্পূর্ণ পালটে যায়। তখন মুসলিমরাই তাদের এই আচরণের প্রশংসা শুরু করে!

tauhiderdak.com

তারা এখন পশ্চিমাদের প্রতি মুগ্ধতার পথ গ্রহণ করেছে। যে মুগ্ধতা বিজয়ী জাতির সামনে অধঃপতন এবং কোনো নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই তাদের হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার দিকে নিয়ে যায়। পূর্ণরূপে তাদের আনুগত্য মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে; বরং বিজয়ী জাতি যদি তাদের অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দিত হওয়ার দিকে পর্যন্ত নিয়ে যায়।

এমনটা কীভাবে ঘটছে?

সঠিক আকিদাধারী জাতির মধ্যে তো শুধু সামরিক পরাজয় এমনটা ঘটাতে পারে না। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও বস্তুগত পিছিয়ে থাকার ফলেও এমন হয় না; এমনকি পশ্চাৎপদতা ও পরাজয় একত্রিত হলেও এতটা পতন ঘটাতে পারে না।

এর মূল কারণ ছিল, মানসিক পরাজয়, যা আকিদাগত বিচ্যুতি থেকে সৃষ্ট।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

> 'তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং বিষণ্ন হয়ো না। (প্রকৃত) ইমানদার হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[২৬৮]

এই আয়াতে কারিমায় ইমানের শর্ত অনর্থক আসেনি। কারণ, শুধু সত্যিকার ইমান শত্রুর সামনে পরাজয়ের অবস্থায় দুর্বলতা ও বিষণ্নতা থেকে রক্ষা করতে পারে। এবং দুর্বলতা ও বিষণ্নতা থেকে সৃষ্ট ফলাফল অর্থাৎ শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করা, শত্রুকে প্রতিরোধ ও নব উদ্যমে যুদ্ধের চেষ্টা ত্যাগ করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি ইমানের সঙ্গী। জরুরি হলো, জাহিলিয়াতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব এবং এগুলোকে জাহিলিয়াত হিসেবে দেখা; যদিও তাদের কাছে সামরিক বিজয় ও জমিনে বস্তুগত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপাদান রয়েছে।

এই আয়াতে কারিমা মুমিনদেরকে সত্যিকার মানদণ্ড ও মাপকাঠির দিকে ফিরিয়ে আনে। তাই যখন ইমান ও কুফরের প্রশ্ন সামনে আসবে, তখন মুমিনরাই ঊর্ধ্বে; যদিও তারা সামরিক পরাজয় বা দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। কারণ, স্বয়ং ইমান কুফরি থেকে ঊর্ধ্বে; মানসিক, আত্মিক, বুদ্ধিগত, চারিত্রিক, মানবিক সর্বদিকে ততটাই ঊর্ধ্বে, যতটা সত্য ঊর্ধ্বে মিথ্যা থেকে, সঠিক মানহাজ ঊর্ধ্বে ভ্রান্ত কর্মপন্থা থেকে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ঊর্ধ্বে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সরল পথ ঊর্ধ্বে বক্র পথ থেকে।

.....

২৬৮. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৩৯।

tauhiderdak.com

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

'যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎপথে চলে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?'[২৬৯]

এটা মানসিক, অনুভূতি ও আত্মিক দিক থেকে, যা শত্রুর মাঝে বিলীন হওয়া বা তাদের সামনে মানসিক পরাজয়কে রুখে দেয়।

আর কর্মগত দিকে, মুমিনরা যখন বিশ্বাস করবে, তারাই সঠিক আকিদা ও কর্মপন্থার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ—যদিও তাদেরকে সামরিক পরাজয় বা দুর্বলতা আক্রান্ত করেছে—তখন এই বিশ্বাসটিই তাদেরকে অধঃপতন থেকে উঠে দাঁড়াতে, শক্তি ফিরিয়ে আনতে এবং পুনরায় শত্রুর সাথে লড়াই শুরু করতে সাহায্য করবে—

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ - الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

'যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, "(শত্রুপক্ষের) মানুষেরা তোমাদের (মোকাবিলার) জন্য (সৈন্য) সমাবেশ করেছে; অতএব তাদেরকে ভয় করো।" এ কথায় তাদের ইমান আরও বেড়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি বড়ো উত্তম কর্মবিধায়ক!"'[২৭০]

সুতরাং সত্যিকার ইমান—যা হবে সঠিক ইসলামি অর্থে, ইরজায়ি বা ভ্রান্ত সুফিবাদী অর্থে নয় এবং আল্লাহর দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত নয়—এই ইমানই উম্মাহকে শত্রুর সামনে মানসিক পরাজয়, তাদের হাতে নেতৃত্ব প্রদান ও তাদের আনুগত্য মেনে নেওয়া থেকে মুক্ত রাখবে। যখন ক্রুসেডাররা ইসলামের ভূমিতে আক্রমণ করেছে, এখানে জুলুম ও ফিতনা-ফাসাদ চালিয়ে, তখন কি এই সত্যিকার ইমান উপস্থিত ছিল? না, নিঃসন্দেহে ছিল না।

.....

২৬৯. সুরা আল-মুলক, আয়াত নং ২২।

২৭০. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৭২-১৭৩।

tauhiderdak.com

যদি এই ইমান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে উপস্থিত থাকত, তাহলে মুসলিমদের ওপর এমনটা কখনো ঘটত না। তাদের সামরিক শক্তি যতই দুর্বল হোক বা তারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, বস্তুগত ও সাংগঠনিক দিক থেকে যতই পিছিয়ে থাকুক। কারণ, উম্মাহকে দুর্বলতা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ানো, পশ্চাৎপদতা থেকে উন্নতি করা এবং নব উদ্যমে শত্রুর সাথে লড়াই শুরু করার জন্য শুধু ইমানই যথেষ্ট।

হ্যাঁ, সেখানে এক ধরনের ইমান ছিল ঠিক, যা এই উম্মাহকে ক্রুসেড আক্রমণের মোকাবিলায় এবং ইসলামি জিহাদে অর্থাৎ কালিমার পতাকাতলে যুদ্ধে বের করেছিল। তারা একে মুসলিম-ভূমির ওপর কাফিরদের আক্রমণ হিসেবে দেখেছিল, যার বিরুদ্ধে জিহাদ ও প্রতিরোধ করা আবশ্যক। তারা ইসলামি শাসন বিলুপ্ত করে তদস্থলে কুফরি আইন প্রচলনের প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়েছে। এই ভিত্তিতে যে, এটা কুফর, যা কেউ মেনে নিলে দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়। তেমনই মুসলিম উম্মাহ মিশরে নেপোলিয়নের ক্রুসেড হামলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাকে ইসলামি শাসন বিলুপ্ত করা থেকে বাধা দিয়েছে। উত্তর আফ্রিকার মুসলিমরা ফ্রান্সের ক্রুসেড হামলার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। হিন্দুস্থানে ইংরেজ ক্রুসেডের বিরুদ্ধে, ইন্দোনেশিয়ায় প্রথমে পর্তুগিজ হামলা ও পরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছে। মোটকথা, সমস্ত অঞ্চলেই মুসলিম উম্মাহ তাদের দেশে ইউরোপীয় ক্রুসেড হামলার মোকাবিলা করেছে।

কিন্তু তাদের এই ইমানে ততদিনে ইরজায়ি চিন্তা, সুফি ঝোঁক ও দায়িত্বে অবহেলা এসে যুক্ত হয়েছিল। এ ছাড়া এই দ্বীন মানুষের কাছে কিছু রীতিনীতি ও কুসংস্কারের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল। যার ফলে এ হামলার সামনে দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারেনি; যদিও তাদের প্রতিরোধ ছিল অনেক দুঃসাহসী। তাই যখন তাদের পতন ঘটেছে, তখন পুরো উম্মাহ তাদের সাথে পতিত হয়েছে এবং স্রোতের ধাক্কায় নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

আমরা মিশরি অভিজ্ঞতার ইতিহাস বর্ণনার আলোচনায় আবারও ফিরে যাচ্ছি।

tauhiderdak.com

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত ও তাদের অনিষ্টতা সৃষ্টির মাধ্যমসমূহ

মুহাম্মাদ আলি ও তার বংশধর; এমনকি ইসমাইল পাশা পর্যন্ত ফ্রান্সের সুনজরে ছিল। তারা মিশরে ফ্রান্সের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেয়। তারা কাঙ্ক্ষিতভাবে পশ্চিমাকরণ মিশন সম্পন্ন করে। গ্রেট ইসমাইলের প্রসিদ্ধ বক্তব্য ছিল, 'আমি মিশরকে এক টুকরো ইউরোপ বানাতে চাই।'

একসময় তাওফিক পাশা ক্ষমতায় আসে। তখন বৈঠার মাঝি পরিবর্তন হলেও দিক ঘুরেনি। তার সময়ে ইংরেজ-কর্তৃত্ব দূর থেকে মিশরের বিষয়ে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। অতঃপর একসময় ইংরেজরা ১৮৮২ সালে মিশর দখল করে।

তখন স্বাভাবিকভাবেই নতুন পরিকল্পনামতে ফ্রান্সের পদ্ধতির পরিবর্তে ইংরেজ-পন্থায় পশ্চিমাকরণ মিশন চলতে থাকে। তবে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, ইংরেজরা ফ্রান্সের খ্রিষ্টসংস্থা যেমন বিদ্যালয় ও মিশনারি কেন্দ্রগুলোতে আঘাত করেনি; যদিও তারা ফ্রান্সের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করতে সর্বোচ্চ সতর্ক ছিল। এর কারণ, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো কর্তৃত্ব ও লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে এমন হিংস্র প্রতিযোগিতা করে, যা কখনো যুদ্ধ পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই একে অপরকে সাহায্য করে এবং পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করে।

তাদের চক্রান্তে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন ছিল, মানুষকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে ইংরেজদের উত্তেজনাহীন ঠান্ডা কৌশল। যে কৌশলটি তাদের প্রসিদ্ধ প্রবাদের মধ্যে ফুটে ওঠে, (Slow but Sure) 'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী।'

পূর্বে নেপোলিয়নের মাঝে ছিল ফরাসিদের নির্বুদ্ধিতা। তারা রাগ করে আঘাত করে, তখন আঘাত থেকে আরও মানুষ সচেতন হয় এবং আরও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। যা ঘটেছে আজহারে গোলা নিক্ষেপ ও একে ঘোড়ার আস্তাবল বানানোর পর।

tauhiderdak.com

অন্যদিকে ইংরেজদের ক্রুসেডীয় মানসিকতা ফ্রান্সের চেয়ে কম নয়, তেমনই আজহারের প্রতি ঘৃণা অন্যান্যদের থেকে কম নয়।[২৭১] তবে তাদের পরিবর্তনের পন্থার মাধ্যমে কিছু ভিন্নতা রয়েছে; যদিও উদ্দেশ্যে ভিন্ন নয়। তাই সর্বশেষ ফলাফলও ভিন্ন হয়।

'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী' এই নীতি মানুষকে জাগ্রত না করেই পরিবর্তন করে।

মিশরে প্রেরিত প্রথম ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড ক্রোমার বলেছে, 'এই রাষ্ট্রের জন্য প্রভুর পক্ষ থেকে নির্বাচিত সাদা চামড়ার ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে, যথাসম্ভব সর্বোচ্চ স্তরে খ্রিষ্টান সভ্যতার ভিত মজবুত রাখা; যাতে এটাই মানুষের মাঝে সম্পর্কের মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়। তবে সন্দেহ সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক হলো, মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান না বানানো এবং তাদের ইসলাম ধর্মের বাহ্যিক নকল পোশাক টিকিয়ে রাখা, যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ইত্যাদি।'[২৭২]

সে যখন মিশরে তার শাসন শুরু করে, তখন সেখানের খ্রিষ্টান মিশনারিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে তার ব্যাপারে অভিযোগ দেয় যে, সে তাদেরকে চাপে ফেলে দিচ্ছে। তখন ব্রিটিশ সরকার তার কাছে অভিযোগের কৈফিয়ত তলব করে। তখন সে মিশনারিদের একত্রিত করে বলে, 'আপনারা কীভাবে ভাবতে পারলেন যে, আমি আপনাদের বাধা দিতে পারি! কিন্তু আপনারা রাস্তা থেকে কোনো শিশু বা ব্যক্তিকে কিডন্যাপ করে এনে খ্রিষ্টান বানানোর চেষ্টা করেন। এভাবে আপনারা মুসলিমদেরকে উত্তেজিত করে তোলেন; ফলে তারা আরও কঠিনভাবে দ্বীন আঁকড়ে ধরে। কিন্তু আমি লন্ডনের ত্রিত্ববাদ কলেজের (Trinity College) এক যুবকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি যে, সে কিছু দিনের ভেতর পাশ করে এসে শিক্ষা-সিলেবাস প্রণয়ন করবে। যা আপনাদের সব লক্ষ্য পূরণ করে দেবে।'[২৭৩]

'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী' কাজ এমনই হয়ে থাকে।

শিক্ষা-কার্যক্রম ধীরে ধীরে মিশনারিদের (ক্রুসেডারদের) সমস্ত উদ্দেশ্য পূরণ করে, কোনো হইচই সৃষ্টি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সন্দেহ সৃষ্টি ব্যতীতই।

.....

২৭১. পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত সেই মিশনারির কথা স্মরণ করুন, যে বলেছে, 'আজহার কি খ্রিষ্টান গির্জার জন্য হুমকি?'

২৭২. Modern Egypt – 'আধুনিক মিশর' লর্ড ক্রোমার, বইয়ের প্রথম খণ্ড থেকে।

২৭৩. এটা আমি তার Mission & Missionaries 'খিষ্টধর্ম প্রচার ও মিশনারি দল' বইয়ের পথম খণ্ডে পড়েছিলাম। এটা একটি প্রকাশ নিষিদ্ধ বই, যা এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

tauhiderdak.com

এক. শিক্ষা-সিলেবাস

ক্রোমার 'মিস্টার ডনলোপ' নামক এক সন্ন্যাসীকে শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করে। আর তার হাতেই ছিল মুসলিম-ভূমি মিশরের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের সম্পূর্ণ কার্যকরী ক্ষমতা। যখন একজন খ্রিষ্টান সন্ন্যাসী এসে শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়, শিক্ষা-কার্যক্রমের কী ভয়াবহ অবস্থা হবে, তা তো চিন্তা করলেই বোঝা যায়।

ডনলোপ এসে খ্রিষ্টান গির্জার জন্য হুমকি আল-আজহারের ওপর আঘাত হানে। তবে নেপোলিয়নের মতো নির্বুদ্ধিতা করে নয়। সে জানত, নির্বোধের মতো আঘাতের ফলে মুসলিমরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

সে আজহারকে আপন হালতে ছেড়ে দেয়, কোনো ধরনের বাধা সৃষ্টি করেনি। তবে সে তাদের—ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী—পন্থায় নতুন কিছু শিক্ষাকেন্দ্র খোলে। যেখানে দুনিয়াবি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হবে; কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞান একেবারে স্বল্প কিছু বিষয় ব্যতীত আর কিছুই শিক্ষা দেওয়া হবে না। আর এই স্বল্পটুকু শিক্ষা দেওয়াও তাদের ইসলাম থেকে মুসলিমদের বের করার চক্রান্তের অংশ (বিস্তারিত সামনে আসবে)।

মানুষ এই কাজের সূচনালগ্নে (তাৎক্ষণিকভাবে ও তাদের অন্তরের ইসলামের অবশিষ্ট অনুভূতির প্রেরণায়) বলে ফেলে, এগুলো হলো কুফরি শিক্ষাকেন্দ্র; কারণ, এখানে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয় না। আল-আজহারে ভর্তির পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় (মক্তব) চার বছর পুরো কুরআন শিক্ষা দেওয়া হতো।

কিন্তু ডনলোপের পরিকল্পনায় এই কুফরি শিক্ষাকেন্দ্রগুলো একসময় একদিকে জীবিকা উপার্জন এবং অন্যদিকে সামাজিক অবস্থান তৈরির মাধ্যমে পরিণত হয়।

এই কলেজগুলোতে মাত্র চার বছর পড়াশুনা করে বের হওয়ার পর সাথে সাথেই তাকে সরকারি পদে নিয়োগ দেওয়া হতো কমপক্ষে চার পাউন্ড বেতনে। যা সে সময়ের জন্য বিশাল অর্থ ছিল। কারণ, বর্তমান মুদ্রামানের তুলনায় সে সময় এর মান অকল্পনীয় পরিমাণ বেশি ছিল এবং মিশরি পাউন্ডের ক্রয়ক্ষমতা ছিল বিশাল। এতটাই বেশি যে, চার পাউন্ড দিয়ে স্বয়ং রাজধানীতে সম্মানজনক জীবনযাপনের পাশাপাশি বিয়ে করে পরিবার চালানোর পরেও এতটুকু অর্থ রয়ে যেত, যা দ্বারা মফস্বলে জমি ক্রয় করা সম্ভব ছিল।[২৭৪]

.....

২৭৪. কায়রো শহরের উপকণ্ঠে বিশাল বাগানবাড়ি ভাড়া দেওয়া হতো মাত্র দেড়শ পয়সা দিয়ে। এক ওকা

tauhiderdak.com

অন্যদিকে আজহারে একটানা ২০ বছর পড়াশুনা করে বের হয়ে অনেকে কোনো চাকরি পেত না। অথবা শুধু মসজিদের চাকরি পেত, যেখানে বেতন ছিল মাত্র ১২০ পয়সা। যা দিয়ে জীবন চালানো যেত ঠিক, তবে তা ছিল দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন করে বের হওয়া সরকারি চাকরিজীবীদের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছভাবে।

অবস্থা যখন এমন হবে, আর আপনার কোনো সন্তান থাকবে, তখন তাকে শিক্ষার জন্য কোথায় নিয়ে যাবেন? আপনি কি তাকে আজহারে নিয়ে যাবেন; যাতে জীবনের মূল সময় সেখানে কাটিয়ে এসে বেকার বসে থাকে বা স্বল্প বেতনে মসজিদে চাকরি করে? না ডনলোপের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাবেন, যেখানে মাত্র চার বছর পড়াশুনা করে বের হয়েই সমাজে মর্যাদাবান এবং সরকারি চাকরি পেয়ে যাবে। তখন দোকানদার, কসাই, বাড়ির মালিকরা তার পেছনে ছুটবে এবং সর্বস্থানে সম্মানের স্থান দখল করে রাখবে?

পূর্বে আল-আজহারের উপাধি এতটা সম্মানের ছিল, এর জন্য মানুষ প্রতিযোগিতা করত। যে পরিবারে আজহার থেকে পাশ করা 'আলিম' থাকত, তারা মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হতো; চাই তা রাজধানী হোক বা গ্রামাঞ্চলে। মানুষ তাদের দিকে মর্যাদা ও বড়ত্বের দৃষ্টিতে তাকাত। কারণ, অধিকাংশ সরকারি চাকরি ছিল আজহারিদের দখলে। তাই তারা ইসলামি সমাজে সম্মান ও উচ্চাসনের সব সুযোগ ভোগ করত।

আল-আজহার সঠিক ইসলামি মানহাজ (কর্মপন্থা) থেকে কতটা পিছিয়ে ছিল, সেদিকে আপাতত দৃষ্টি না দিয়ে, এটা ছিল আন্দালুসের ভার্সিটিগুলোর অনুরূপ; বরং আজহার সোনালি যুগে নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত ছিল। সেখানে দ্বীন ও দুনিয়ার সব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। মানুষকে আল্লাহর মানহাজে দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করা হতো। এই আজহার ছিল মানুষের ইসলামের অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত। তাদের মণিকোঠায় এটা ছিল জীবন্ত এক নিদর্শন। তাই এটা নিয়ে তারা গর্ববোধ করত, এদিকে ধাবিত হতো। এবং এখান থেকে পাশ করা ব্যক্তিরা ছিল ইসলামি সমাজে উঁচু স্থানে। কিন্তু ডনলোপের যুগে এসে অবস্থা পালটে যায়।

তখন আজহারে কেবল দরিদ্র ছাত্ররা পড়াশুনা করতে যেত, যারা আধুনিক বিদ্যালয়ের ব্যয় বহনে সক্ষম নয়। যার ফলে তারা সমাজের বোঝা হয়ে তাদের দারিদ্র্যের ফল সারা জীবন ভোগ করতে বাধ্য হয়।

(সোয়া এক কেজি) চিনি বিক্রি হতো আড়াই পয়সা দিয়ে। দশটি বড়ো ডিমের দাম ছিল এক পয়সা। এভাবে বাকি পণ্যের দাম এমনই ছিল।

tauhiderdak.com

কখনো কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবার তাদের সন্তানকে আজহারে পাঠাত ঠিক, তবে তা শুধু বরকত হাসিল এবং গ্রামাঞ্চলের মানুষের মাঝে একটা অবস্থান তৈরির জন্য। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সন্তান, যারা আজহার থেকে পাশ করেছে, তাদের সংখ্যা এতটাই স্বল্প যে, তারা আজহারের বর্তমান সামগ্রিক চিত্রকে মুছে দিতে পারবে না। তা হলো, এটা হচ্ছে সেসব গরিবের আশ্রয়স্থল, যারা আধুনিক শিক্ষা অর্জনের ব্যয় বহনে সক্ষম নয়, একই সময়ে তারা আধুনিক সমাজে কোনো অবস্থান অর্জন করতে পারে না।

অন্যদিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা হচ্ছে সমাজের নতুন সুশীল শ্রেণি, উন্নত শ্রেণি, যারা সর্বদা ব্রিটেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে, একে নিয়ে গর্ব করে। আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও তাদেরকে আপন করে নেয়। ফলে তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করে। যা 'ধীর পদক্ষেপ; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী'।

এসব গ্র্যাজুয়েট কারা? তাদের সংস্কৃতি-দর্শন কী? তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? কীভাবে ডনলোপ তাদের মাধ্যমে তার খ্রিষ্টীয় চক্রান্ত বাস্তবায়ন করেছে, যে জন্য ক্রোমার তাকে নিয়োগ দিয়েছিল এবং সুলতানের মতো সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল?

ডনলোপ তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করেছিল, সেখানে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল, ধর্মীয় শিক্ষা ও ইতিহাস শিক্ষা।

আর আরবি ভাষা—যা কুরআনের ভাষা এবং খ্রিষ্টানরা যার প্রতি প্রবল ঘৃণা পোষণ করে—একে ডনলোপ ধ্বংস ও বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার ভার্সিটিগুলোয় উচ্চ স্তরের শিক্ষকরা সবাই ১২ পাউন্ড বেতন পেত, শুধু আরবি ভাষার শিক্ষক ৪ পাউন্ড পেত।

আর নিশ্চিতভাবেই ভার্সিটির ভেতর ও বাইরের সমাজে এই বৈষম্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভার্সিটির ভেতরে তাদের চেয়ে নিম্নস্তরের স্টাফরা; এমনকি ঝাড়ুদারও যদি দীর্ঘ দিন চাকরি করত, তাহলে তার বেতন বেশি হয়ে যেত। তাই ভার্সিটিতে আরবি শিক্ষকরা কোনো কথা বলতে পারত না। কোনো বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া বা পরিচালনাগত কোনো বিষয়ে অংশ নিতে পারত না। যার ফলে ছাত্রদের কাছেও তাদের কোনো সম্মান ছিল না। আর যদি সেসব শিক্ষকের হাতে বেত না থাকত, যা দ্বারা ছাত্রদের আদব শিক্ষা দিত, তাহলে তাদেরকে কেউ সম্মান করত না বা গোনায় ধরত না। অথচ একই বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষকরা অনেক সম্মান ও মর্যাদা পেত।

tauhiderdak.com

কিন্তু বিস্তৃত সমাজে তারা বিদ্যালয়ের ভেতর থেকেও বেশি নিগৃহীত ছিল। কারণ, সমস্ত মানুষ তাদের আর্থিক অবস্থার কথা জানত। তারা যে পেছনে পড়ে আছে এবং অন্যান্য শিক্ষকরা তাদের চেয়ে বেতন ও মর্যাদায় এগিয়ে আছে, তা জানত। তাই বেত যদিও ছাত্রদের ভীত করত; ফলে তারা ক্লাসে আদব বজায় রাখত। কিন্তু সমাজ তো তার বেতকে ভয় পায় না; বরং এটাকে তারা তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টার বস্তু বানিয়ে নিত। অন্যদিকে তার ভার্সিটির ইংরেজি শিক্ষক বেত বহন সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে সম্মান পেত এবং সমাজ তাকে এ জন্য তিরস্কার করত না; যদিও এটা তাকে সম্মান এনে দিত না।

মোটকথা আরবি শিক্ষকের বেতনের পরিমাণের সাথে তার সামাজিক অবস্থান নিচে নেমে যেত। সে সর্বদা তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে থাকত। মানুষ তার অজ্ঞতা, পিছিয়ে থাকা, সংকীর্ণ বুঝ. দারিদ্র্য এবং সামাজিক ও চিন্তাগত স্তরের নিচুতার কথা বলাবলি করত। তাকে যে জন্য সবচেয়ে বেশি তিরস্কার করা হতো, তা হলো সে বিদেশি ভাষা পারে না।

যখন আরবি ভাষা-শিক্ষকের এমন অপদস্থ অবস্থা হবে, তখন অবশ্যই তা তার পাঠ্যবস্তুর মাঝে প্রভাব ফেলবে, যা সে শিক্ষা দেয়। আর এটাই ছিল এসব নিকৃষ্ট পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এমনটাই ঘটে, শিক্ষকের এই অবস্থার ফলে স্বয়ং আরবি ভাষাই অবজ্ঞা, ঘৃণা ও বিমুখতার বস্তু হয়ে যায়। ছাত্ররা আরবি ভাষার নাহু, সরফ, বালাগাত, বাক্য, সাহিত্য ইত্যাদি জটিল ও কষ্টসাধ্য হওয়ার অভিযোগ জানাতে থাকে। অথচ পূর্বে তারাই প্রায় তেরোশ বছর কোনো অভিযোগ ছাড়াই বাস করেছে। কেমন যেন হঠাৎ তারা এ জটিলতা আবিষ্কার করেছে, যা তারা এত দিন বোঝেনি। তারা আরবিকে অন্য ভাষার সাথে তুলনা করা শুরু করেছে, বিশেষত ইংরেজির সাথে। তারা আবিষ্কার করে যে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষা সর্বক্ষেত্রে অধিক সহজ, কারণ সেখানে কোনো ইরাব নেই। পাঠককে জবর, জের, পেশ নিয়ে দ্বিধায় ভুগতে হয় না। সেগুলোর ব্যাকরণ, উচ্চারণ ও বাক্য গঠন সহজ।[২৭৫]

মোটকথা, আরবি ভাষা শিক্ষা অপ্রয়োজনীয়; বরং কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বিদেশি ভাষা শিক্ষা হয়ে যায় আবশ্যক। তারা নির্দ্বিধায় আরবিতে ভুল করত, তখন কেউ সংশোধন করে দিলে কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলত, 'মামা, আমি কি ফকিহ নাকি?! এসব রাখো তো।' অথচ বিদেশি ভাষায় ভুল থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকত। অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল হলে আড্ডার সবাই তাকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করা শুরু করত।

.....

২৭৫. অথচ ভাষাবিদরা জানে, ফ্রান্সের ভাষা হলো সবচেয়ে জটিল। কারণ, সেখানে ক্রিয়াপদের সংখ্যা অনেক বেশি। আবার প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্যে আরবির মতো কাল তিনটি নয় যেমন, অতীত, বর্তমান ও আদেশ;

tauhiderdak.com

লেখকরা বলত, আরবি নাকি স্থবির ও সাবলীলতাহীন। এখানে সুন্দরভাবে ভাব-মর্ম উপস্থাপন করা যায় না, যেমনটা বিদেশি ও ইংরেজিতে সহজ, সাবলীল ও গভীর মর্মে ব্যক্ত করা যায়। যেন তারা গত তেরোশ বছর এই ভাষায় কথা বলেনি। কেমন যেন তারা হঠাৎ এই ভাষায় সীমাবদ্ধতা আবিষ্কার করে বিদেশি ভাষার দিকে চলে গেছে। তাই এখন মুতানাব্বি, বুহতারি বা আলকামা ও ইমরুল কায়েস তাদের কাছে কিছু তুচ্ছ নামে পরিণত হয়, যারা ছিল চিন্তা ও সভ্যতায় পশ্চাৎপদ। অন্যদিকে শেক্সপিয়ার, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, অঁদ্রে জিদ, আনাতোল ফ্রঁস, ভিক্টর হুগো নামগুলো সুশীলদের মুখে বেশি বেশি উচ্চারিত হতে থাকে এটা প্রমাণের জন্য যে, তারা বুদ্ধিজীবী; যদিও তারা এদের শুধু নাম ছাড়া আর কিছুই জানত না।

বিজ্ঞানীরা বা সঠিক অর্থে বিজ্ঞানের অনুবাদকরা অভিযোগ করে যে, আরবি বিজ্ঞানের জন্য উপযুক্ত নয়। এটা সাহিত্যচর্চার জন্য উপযোগী হলেও বিজ্ঞান এতে চলে না। তাই বিজ্ঞান শেখার জন্য এই স্থবির, জটিল, সীমাবদ্ধ ও পশ্চাৎপদ ভাষা ছেড়ে বিদেশি ভাষা ব্যবহার করতে হবে। ভবিষ্যতে যদি বিজ্ঞানী চাই, তাহলে বাচ্চাদের ইংরেজি শেখাতে হবে। যেমন আরবির সাথে কখনো—মুসলিমদের সোনালি যুগেও—বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল না বা এটা বিজ্ঞানের কখনোই ভাষা ছিল না। অথচ মধ্যযুগের রজার বেকন বলেছিল, 'যে বিজ্ঞানী হতে চায়, সে যেন আরবি শিখে; কারণ তা বিজ্ঞানের ভাষা।'

ভাষার এই পরিত্যক্ত অবস্থা খুব দ্রুত এই ভাষার লিখিত বিষয়ের ওপর প্রভাব ফেলে। আর এটাই ছিল এই চক্রান্তের মূল লক্ষ্য। কারণ, এই উম্মাহর সমগ্র শিক্ষার ভান্ডার এই ভাষাতেই লেখা, যার মূলে রয়েছে কুরআনুল কারিম। তাদের মূল চক্রান্ত ছিল উম্মাহকে তার সমগ্র তুরাস (ঐতিহ্য), বিশেষ করে কুরআন থেকে বিমুখ করা।[২৭৬] ফলে ধীরে ধীরে মানুষ তাদের কুরআন ও তুরাস ত্যাগ করে। তারা এখন আর একে তাদের জীবনের 'পাথেয়' মনে করছে না; বরং পশ্চিমা প্রভুদের ভাষায় লিখিত বস্তুকে পাথেয় ভাবছে।

বরং অনেক বেশি। তা ছাড়া পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের শব্দও ভিন্ন-ভিন্ন। উচ্চারণও অনেক জটিল। আর ইংরেজি বাহ্যত ফ্রান্সের ভাষা থেকে সহজ হলেও বাক্য গঠনের পরিভাষা (Idioms) অসামঞ্জস্যশীল। যেগুলো সব আলাদাভাবে মুখস্থ করতে হয়। ফরাসির মতো এখানেও ক্রিয়াপদের ছয়টি সময়কাল। উচ্চারণ অসাদৃশ্যপূর্ণ, বিশেষ করে OUGH শব্দগুচ্ছের ক্ষেত্রে।

২৭৬. তুরস্কে মালাউন আতাতুর্কের মাধ্যমে আরবি অক্ষর পরিবর্তন করে ল্যাটিন অক্ষর চালু করা হয়। তুর্কি ভাষা থেকে অধিকাংশ আরবি শব্দ বাতিল করা হয়; যাতে এমন প্রজন্ম গড়ে উঠে, যারা তাদের ইসলামি

tauhiderdak.com

ডনলোপের সিলেবাসে ইসলামশিক্ষার অবস্থাও ছিল খারাপ। কারণ, আরবির শিক্ষকই ইসলামধর্ম ক্লাস করাতো। আর সবচেয়ে বয়স্ক শিক্ষককে ধর্মশিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হতো, এ বলে যে, তারা এখন বিদ্যালয়ের খাতাপত্র টানাটানি করতে পারছে না। তা ছাড়া ধর্মশিক্ষার ক্লাস হতো একেবারে শেষ সময়ে। যার ফলে ছাত্ররা ধর্মশিক্ষার ক্লাস করত এমন অবস্থায়, যখন তারা একেবারে ক্লান্ত ও অমনোযোগী থাকত। কখন ছুটির ঘণ্টা দেবে আর তারা বাড়ির দিকে দৌড় দেবে, সে অপেক্ষায় থাকত। তা ছাড়া শিক্ষক হতো বৃদ্ধ, যিনি বারবার কাশি দিচ্ছেন এবং নড়াচড়া করছেন। ফলে এই ক্লাসটা তাদের কাছে ছিল দুর্বলতা, অস্থিরতা ও অমনোযোগিতার প্রতীক। সর্বোপরি পাঠদানের পদ্ধতিও ছিল নীরস। সেখানে শুধু কিছু নস মুখস্থ করানো হতো, যার কোনো প্রাণ নেই।

এটা যে ছাত্রদেরকে ধর্মশিক্ষা অতঃপর স্বয়ং ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার জন্য পরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল, তা এসব মিশনারি স্কুলে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার ক্লাস থেকেও স্পষ্ট হয়। যদিও তারা নিজেদের সেক্যুলার মনে করে, যার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। মুসলিম শিক্ষার্থীরা একেবারে সকালে হাসি-খুশি ও উদ্যম নিয়ে সেই ক্লাসে উপস্থিত হতো। সেখানে ক্লাস করাতো অল্প বয়সি ও ছাত্রদের কাছে প্রিয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আর ক্লাস গতানুগতিক ক্লাসরুমে হতো না; যাতে সেখানে একঘেয়েমি না থাকে; বরং এ ক্লাস হতো বিদ্যালয়ের গির্জায় এবং ছাত্রদেরকে গানের তালে তালে তাদের ধর্মবিশ্বাস শিক্ষা দিত। ফলে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা ছিল তাদের কাছে আনন্দ, উদ্যম, খুশি ও খেলাধুলায় পরিপূর্ণ।

সর্বোপরি ডনলোপের সিলেবাসে ধর্মশিক্ষা ছিল মূলত শিক্ষার পোশাকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এক তালি। কারণ, তা ছিল মূলত সেক্যুলার পোশাক, পশ্চিমা পথ-পন্থার মতো, যার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা ধর্মকে বিজ্ঞান ও জীবন থেকে আলাদা করেছে। এখন যখন ধর্মের ক্লাস হবে, সেখানে অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসুল, দ্বীন ও আখিরাতের আলোচনা আসবে। কিন্তু এই আলোচনার আওয়াজ ছিল দুর্বল, যা অন্তরে তো দূরে থাক কান পর্যন্ত প্রবেশ করত না। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে, এগুলো শুধু কিছু বাক্য, যা ব্যাখ্যা করা হয় না এবং এতে প্রাণসঞ্চার হয় না; বরং কোনো বুঝ ছাড়াই শিক্ষা দেওয়া হয়, এ ছাড়া তা শিক্ষা দেয় এমন দুর্বল বৃদ্ধ, যার আওয়াজ নিভে গিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে, যার কোনো প্রভাব নেই, তখন তো বিপরীত

জ্ঞানের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মিশরে আব্দুল আজীজ ফাহমি ও অন্যদের মাধ্যমে এমন বহু চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে।

tauhiderdak.com

প্রভাব পড়বে এবং মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে। আর এটাই মূল লক্ষ্য।[২৭৭]

এটা যে পরিকল্পিত, তা আরও স্পষ্ট হয় এ থেকে, খ্রিষ্টধর্মের শিক্ষা শুধু ক্লাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এটা ছিল এমন চেতনা, যা শিক্ষার্থীদের মাঝে অনুষ্ঠানে, ক্লাস ও খেলার ফাঁকে ফাঁকে, বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার সময় জাগ্রত করা হতো। ফলে ছাত্রদের অন্তরে তা গভীর প্রভাব ফেলত। ফলে খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা তাদের শিক্ষাক্রমের পোশাকের অসামঞ্জস্যপূর্ণ তালি নয়; বরং মূল অংশ ছিল।

তা ছাড়া ডনলোপের সিলেবাসে এটা ছিল অতিরিক্ত বিষয়, যা শীতকালে ক্লাসের সময় কমে আসলে বাদ দেওয়া হতো। যেভাবে ড্রয়িং, কারিগরি শিক্ষা ও ব্যায়াম বাদ দেওয়া হতো। ফলে তা ছাত্রদের কাছে অতিরিক্ত বিষয় হয়ে যায়।

এভাবে 'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী' চক্রান্তে একের পর এক প্রজন্ম বের হতে থাকে, যারা দ্বীনের প্রতি কোনো ধরনের শ্রদ্ধাবোধ অনুভব করে না।

তাদের চক্রান্তের তৃতীয় খুঁটি ছিল ইতিহাসের পাঠ, ইসলামি ও ইউরোপীয় ইতিহাস।

ইসলামি ইতিহাসের পাঠ স্বাভাবিকত জাহিলিয়াতের অবস্থা আলোচনার মাধ্যমে শুরু হয়, যা নবুওয়ত প্রেরণ ও ইসলাম আবির্ভাবের আলোচনার সূচনাস্বরূপ।

জাহিলিয়াতের অধ্যায়ে এই প্রসিদ্ধ বাক্যটি আওড়ানো হতো, জাহিলি যুগে আরবরা মূর্তিপূজা করত, নারীদের নির্যাতন করত, মদ খেত, জুয়া খেলত, ছিনতাই-ডাকাতি করত। ইসলাম এসে এগুলো থেকে তাদের নিষেধ করে।

এই বাক্যটি বাহ্যত সমস্যাহীন মনে হলেও বাস্তবে তা চূড়ান্ত নিকৃষ্ট।

বাহ্যিকভাবে সমস্যা না থাকার অর্থ হলো, আরবরা জাহিলি যুগে বাস্তবেই এমন ছিল, যা এই বাক্যে বলা হয়েছে। আর ইসলাম এসে সত্যিই এই অবস্থা পরিবর্তন করেছে। তবে এখানে সমস্যাটি হলো, এই বাক্যে জাহিলিয়াতের মূল বিষয়বস্তুর কথা বলা হয়নি, যা বিলুপ্ত ও ধ্বংসের জন্যই মূলত ইসলাম এসেছে; বরং এখানে শুধু আরব জাহিলিয়াতের বিশেষ কিছু লক্ষণ বলা হয়েছে, যা অন্য কোনো জাহিলিয়াতে পাওয়া

২৭৭. বিস্তারিত জানার জন্য 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ে সেক্যুলারিজম অধ্যায় দেখুন।

tauhiderdak.com

যায় না। অথচ ইসলাম শুধু আরব জাহিলিয়াতের লক্ষণ দূর করার জন্য আসেনি; বরং তা এসেছে সমস্ত জাহিলিয়াতের শিকড় উৎপাটন করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

অন্যভাবে বলা যায়, আমরা যদি বাহ্যিক কিছু লক্ষণ দূর করার মধ্যেই ইসলামের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করে ফেলি, তাহলে বর্তমানে ইসলামের আর কী দায়িত্ব থাকবে?

ছাত্ররা তাদের চারপাশে তাকিয়ে যখন কোনো মূর্তি[২৭৮] খুঁজে পাবে না, তখন তাদের দৃষ্টিতে এই দায়িত্ব বাদ পড়ে যাবে। যখন দেখবে, মেয়েদের নির্যাতন করা তো হচ্ছেই না; বরং উলটো তাদেরকে সর্বোচ্চ ছাড় দেওয়া হচ্ছে, তখন ইসলামের এই দায়িত্বও বাদ হয়ে যাবে।

যখন দেখবে, কিছু মানুষ মদ খায় এবং জুয়া খেলে—সেখানে গিয়ে ইসলাম তার চারিত্রিক আহ্বান করেছে; ফলে কিছু মানুষ সাড়া দিয়েছে এবং কিছু মানুষ গুনাহের মাঝেই লিপ্ত রয়েছে। এখন ইসলাম তার দায়িত্ব আদায় করেছে, তার আর কিছু করার নেই। এ ছাড়া চুরি-ডাকাতি রোধ করার জন্য সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী আছে, যারা এমন কাজের ইচ্ছাকারী যে কাউকে থামিয়ে দিতে পারে।

তাই ইসলামের আর কী দায়িত্ব বাকি আছে, যা বর্তমান যুগে আদায় করতে হবে?

এভাবেই তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম তার উদ্দেশ্য অর্জন করে ফেলেছে। আর এটাই হচ্ছে ইসলামি ইতিহাস পাঠের প্রথম দিন থেকেই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, এটা নির্দিষ্ট একটা যুগের জন্য এসেছিল, যখন এর প্রয়োজন ও কার্যকারিতা ছিল; কিন্তু এখন বর্তমানে এর কোনো প্রয়োজন নেই। তাই এটা শুধু অতীতের ইতিহাসের অংশ।

কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ পালটে যেত যদি সত্যিকার বিষয়বস্তু আলোচিত হতো, যে জন্য দ্বীন এসেছে। আদম ﷺ থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সব দ্বীনের দাওয়াত ছিল একটিই। তা হলো, এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান, যাঁর কোনো অংশীদার নেই। এমন ইবাদত, যেখানে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস থাকবে এবং সব ইবাদত শুধু তাঁর জন্যই করা হবে। জীবনের সর্ববিষয়ে তাঁর শরিয়াহর শাসন বাস্তবায়ন করা হবে। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাজিলকৃত শেষ রিসালাতের বৈশিষ্ট্যসহ। সেই বৈশিষ্ট্য হলো, এটি কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য রিসালাত।

.....

২৭৮. তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের মূর্তির বিষয় এড়িয়ে যায়।

tauhiderdak.com

যদি দ্বীন আগমনের এই মূল বিষয়বস্তু পাঠদান করা হতো এবং সর্বশেষ রিসালাতের বৈশিষ্ট্য শেখানো হতো, তবে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা পরিবর্তন হতো?

একেবারে আসমান-জমিন পার্থক্য হয়ে যেত!!

তারা বুঝত, এই দ্বীন না পূর্বে তার সব উদ্দেশ্য অর্জন করেছে, আর না বর্তমানে হয়েছে এবং না ভবিষ্যতে অর্জিত হবে। কারণ, পুরো বিশ্বে যতদিন একজন মুশরিক বাকি থাকবে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে বা গাইরুল্লাহকে ইবাদত করে বা আল্লাহর সাথে অংশীদার করে বা আল্লাহর শরিয়াহ ব্যতীত আইনে শাসন করে, ততদিন ইসলামের দায়িত্ব বহাল থাকবে।

বরং যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই যে, দুনিয়ার সবাই ইমানদার হয়ে গেছে—এটা এমন ধারণা, যা কখনোই বাস্তবায়িত হবে না; কেননা, তা আল্লাহর ফায়সালার বিপরীত[২৭৯]—তবুও এই দ্বীনের দায়িত্ব শেষ হবে না। কারণ, তখন এর দায়িত্ব হবে আল্লাহর বাণী আলোচনা করে মানুষের ইমান সতেজ রাখা; যাতে আল্লাহর এই আদেশ পালন হয়—

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

'উপদেশ দিন; কারণ, উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।'[২৮০]

আর যদি অবস্থা বর্তমানের মতো হয়, যেখানে এত এত শিরকে পরিপূর্ণ, মূর্তির শিরক, বিকৃত আসমানি রিসালাতের শিরক, যা ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা করছে এবং আল্লাহর শরিয়াহ বাদ দিয়ে জাহিলি বিধানে শাসন করার মতো আনুগত্যের শিরক, তখন অবস্থা কী হবে?

বরং যেখানে স্বয়ং মুসলিম-বিশ্বকে আল্লাহর শরিয়াহর শাসন থেকে দূরে সরিয়ে সেখানে জাহিলি আইন চালু হয়েছে, তখন অবস্থা কী হবে?

বর্তমানে মানুষকে সমস্ত শিরক থেকে ফিরানো ও তাওহিদের দাওয়াহ দেওয়া থেকে বড়ো দায়িত্ব ইসলামের জন্য আর কী হতে পারে?

.....

২৭৯. আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলো, মানুষ তাদের কর্ম ও দায়িত্বে স্বাধীন হবে; যার ফলে কিছু মানুষ ইমান আনে এবং কিছু অস্বীকার করে। (যদি আপনার রব চাইতেন, তবে সকল মানুষকে এক জাতি বানিয়ে দিতেন। - সুরা হুদ, আয়াত নং ১১৮) অর্থাৎ ইমানের জন্য বাধ্য করে। কিন্তু আল্লাহ এমনটা চাননি।

২৮০. সুরা আজ-জারিয়াত, আয়াত নং ৫৫।

tauhiderdak.com

কিন্তু স্বয়ং এই বিষয়টা ছাত্রদের শ্রবণ থেকে দূরে রাখা হয়। এই চেষ্টা করা হয়, যাতে তারা কখনো এটা স্মরণ না করে যে, ক্রুসেড দখলদারিত্ব প্রবেশের পর মিশর থেকে ইসলামি শরিয়াহ আইন বাতিল করা হয়েছে। সেখানে এখন জাহিলি আইনের শাসন হচ্ছে। কারণ, এটা স্মরণের ফলে মিশরের মুসলিমরা দখলদার ক্রুসেডারদের দেশ থেকে বের করার জন্য ইসলামি জিহাদে নেমে আসবে।

তাই প্রথম ক্লাস থেকেই তাদের চিন্তাধারা এভাবে বিকৃত করা হয়; যাতে এই কুফরি বিদ্যালয় থেকে বের হওয়া ছাত্ররা ভুলে যায় যে, ইসলামের এমন কিছু দায়িত্ব রয়েছে, যা বর্তমান সময়েও পালন করা আবশ্যক।

অতঃপর ছাত্রদেরকে নবুওয়তের যুগ ও ইসলামের প্রারম্ভ নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যেটা মোটামুটি মেনে নেওয়া যায়; যদিও তারা সেই মূল জাহিলিয়াতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না, যা ধ্বংসের জন্য ইসলামের আগমন হয়েছে। এবং তাদের সামনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আলোচনা করা হয় না, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যা মানুষের সামনে বর্ণনা করা, এদিকে আহ্বান করা ও জিহাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

কিন্তু তাদের আলোচনায় নবুওয়ত ও ইসলামের শুরু-যুগের এই উজ্জ্বল চিত্র হঠাৎ স্তমিত হয়ে নিভে যায়। কারণ, এর পরবর্তী অধ্যায়ে ছাত্রদেরকে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ানো হয়, অথবা বলা যায় ইসলামি ইতিহাসের শুধু সেই অংশটুকু পড়ানো হয়, যেখানে বিচ্যুতি প্রবল ছিল।

এটা সত্য যে, বিচ্যুতির ধারা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। বিশেষ করে মুসলিমদের জীবনের রাজনৈতিক অংশে। এই বিচ্যুতি উমাইয়া যুগ থেকেই শুরু হয়ে যায়। সে সময় থেকেই শাসনক্ষমতা দখল বা টিকে থাকার জন্য এমন সব জুলুম করা হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সন্তুষ্ট করে না এবং মুসলিমদের জন্য উপযুক্ত নয়।

কিন্তু শুধু বিচ্যুতির অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাকি সব অংশের আলোচনা ত্যাগ করা এমন ইচ্ছাকৃত বিকৃতি, যা চক্রান্ত করে ইসলামের ইতিহাসের সাথে করা হয়েছে।[২৮১] যদি সঠিক চিত্র তুলে ধরা হতো, তবে ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা অর্জিত হতো।[২৮২]

.....

২৮১. আমি আমার 'ইসলাম ও প্রাচ্যবিদ' বইয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

২৮২. আমি এই বিষয়টা আমার লিখিত 'কীভাবে ইসলামি ইতিহাস লিখব' বইয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছি।

tauhiderdak.com

হ্যাঁ, কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। কিন্তু ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়নি! বরং ইতিহাসের বাস্তবতায় ইসলামের বহু দিক এমন ছিল, যা বাস্তব জগতে প্রয়োগ হচ্ছিল। ইসলামের এমন বহু মর্যাদার বিষয় ছিল, যা লিপিবদ্ধ করা ও মুসলিমরা তা নিয়ে গর্ব করার উপযুক্ত ছিল।

কিন্তু ডনলোপের শিক্ষা-কারিকুলামে ইসলামের ইতিহাস শিক্ষা দ্বারা মুসলিমদের মাঝে তাদের ইতিহাসের প্রতি গর্ববোধ জাগ্রত করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং উলটো এই গর্ববোধ নষ্ট করাই ছিল মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে তারা ইসলামি ইতিহাসের সব উজ্জ্বল পাতাগুলো গোপন করে এবং শুধু মন্দ পৃষ্ঠাগুলো উল্লেখ করে দাবি করে, এটাই হচ্ছে ইতিহাস!

তারা গোপন করে বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস প্রচারের অবদানের কথা, যার সীমা এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানে মুসলিমরা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনে, আল্লাহর শরিয়াহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রভুর ইনসাফ বাস্তবায়ন করে এবং সেই বিশাল অঞ্চলে অমুসলিম জিম্মিদের ওপর এমন ইনসাফ বাস্তবায়ন করে, পুরো মানব ইতিহাসে যার কোনো নজির নেই। কিন্তু তারা এসব কথা অস্পষ্ট সংক্ষিপ্ত ভাষায় উপস্থাপন করে বলে, এটা ইসলামি বিজয়ের বিস্তৃতি। কেমন যেন এটা শুধু যুদ্ধ-জয়, যার পেছনে শুধু ভূমি দখল ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য নেই।

তারা গোপন করে ইসলামি সমাজের সাধারণ মানুষরা যে দীর্ঘ সময় ধরে অশ্লীলতা থেকে মুক্ত ছিল এবং তাদের বংশধারা সংরক্ষিত ছিল। তেমনই যেসব স্থানে ইসলামের শাসন শক্তিশালী ছিল, যেখানে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ ছিল।

তারা গোপন করে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানের কথা, যারা পুরো বিশ্বে তাদের আলো ছড়িয়েছে; এমনকি ইউরোপ তাদের আধুনিক উত্থানের সূচনায় তাদের থেকেই সব শিখেছে, যখন তারা বিভিন্ন স্থান ও ক্ষেত্রে মুসলিমদের সংস্পর্শে এসেছিল।

তারা গোপন করে ইসলামি সভ্যতার উভয় দিকের বিশাল অবদানের কথা, যেখানে আত্মিক ক্ষেত্রে মানুষের উঁচু আদর্শ-মূল্যবোধে গড়ে তোলা এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রে জমিনের বস্তুগত উন্নয়ন ও জীবনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তারা আরও গোপন করে এই কার্যক্রমের ইসলামি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা, যা ইসলামি কর্মপন্থা থেকে আহরিত। তা হলো, মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবদান

tauhiderdak.com

রাখার সুযোগ করে দেওয়া আল্লাহ-প্রদত্ত কর্মপন্থাকে সামনে রেখে, যা আত্মিক ও বাহ্যিক উভয়টিকে একত্রিত করে এবং দুনিয়া ও আখিরাতকে এক শৃঙ্খলায় জমা করে।

ইসলামি ইতিহাসের এত কিছু গোপন করার পর আর কী বাকি থাকে?

শুধু দুটি মন্দ বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে বোঝানো হয়—

প্রথমত, ইসলাম শুধু খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে একেবারে স্বল্প সময়ের জন্য শাসন করেছে, অতঃপর তা চিরকালের জন্য নিঃশেষ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের ইতিহাস—প্রথম প্রজন্মের পর—মানবজীবনকে গঠনকারী সব আদর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে খালি। এটা শুধু ক্ষমতার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস।

এভাবে ইসলামের ইতিহাসকে তার সত্যিকার বিষয়বস্তু থেকে খালি করে শিক্ষা দেওয়ার পর ছাত্রদেরকে ইউরোপের ইতিহাস পড়ানো হয়।

ইউরোপ হচ্ছে জ্ঞান! ইউরোপ হচ্ছে সভ্যতা! ইউরোপ হচ্ছে মূল্যবোধ! ইউরোপই হলো গণতন্ত্র! ইউরোপ হচ্ছে মানবাধিকার! ইউরোপ হচ্ছে শিল্প-বিপ্লব! মোটকথা ইউরোপই হচ্ছে মানুষের সর্বক্ষেত্রে সঠিক আদর্শ ও দৃষ্টান্ত!

তারা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে, সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র জুলুমের কথা, যা তারা যত অঞ্চলে গিয়েছে সর্বত্র চালিয়েছে, বিশেষ করে মুসলিম-বিশ্বে। তারা ইচ্ছাকৃত গোপন করে, ইউরোপকে মুসলিম-বিশ্বের দিকে ক্রুসেডের চেতনায় লেলিয়ে দেওয়ার কথা। তারা ইচ্ছাকৃত গোপন করে, তাদের মাঝে ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেতে থাকা অশ্লীলতার কথা। তারা ইচ্ছাকৃত গোপন করে, সেই সভ্যতার আধ্যাত্মিকতা হারিয়ে বস্তুবাদের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার কথা।

এভাবে তারা ইসলামি ও ইউরোপীয় দুই দিকেই মিথ্যা ইতিহাস শিক্ষা দেয়; যদিও তাতে আংশিক সত্যের ছোঁয়া থাকে। ইসলামের ইতিহাসে পূর্ণ গুরুত্বের সাথে শুধু কালো অধ্যায়গুলোই পেশ করে, আর বাকি উজ্জ্বল পাতাগুলো গোপন রাখে। ইউরোপের ইতিহাসে পূর্ণ সতর্কতার সাথে শুধুই উজ্জ্বল অধ্যায়ের আলোচনা হয় এবং মন্দ পাতাগুলো গোপন রাখা হয়। এভাবে যখন উভয় দিকে মিথ্যা ইতিহাস বর্ণিত হয়, তখন কী ঘটে?

tauhiderdak.com

একের পর এক প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সেখানে পড়াশুনা করে বের হয়। যারা ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হতে থাকে এই জন্য যে, এর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে। বর্তমানে এমন কোনো দায়িত্ব বাকি নেই, যা ইসলামের দ্বারা অর্জন করতে হবে। বরং তারা মনে করে, ইসলাম তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় টিকে গেছে। এর তো বহু যুগ পূর্বেই বিলীন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। বিপরীতে তারা ইউরোপের দিকে এমনভাবে ধাবিত হয়, যেন তা ওহির অবতরণস্থল ও নুরের উৎস। এমন হাসপাতাল, যেখানে মানুষ তাদের পশ্চাৎপদতা ও ব্যর্থতা থেকে সুস্থ হয়।

এসব কিছু ডনলোপের কারিকুলামের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই সম্পন্ন হয়ে যায়। অতঃপর মাধ্যমিক স্তরে একই বিষ ঢুকানো হয়, তবে আরও বেশি করে। কারণ, কলেজের ছাত্ররা তো নিঃসন্দেহে বেশি বুঝমান ও আত্মস্থ করতে সক্ষম; ফলে তাদের যখন বিষ দেওয়া হয়, তা বেশি প্রভাব ফেলে।

সেখানে আরবি ভাষার পাঠকে আরও অপদস্থ করা হয়। অন্যদিকে বিদেশি সব ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। ধর্মশিক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ের অবহেলিত রাখা হয়। মুসলিমদের ইতিহাসের বিচ্যুতির ধারাকে বিস্তৃত করে তাদের সব অবদান মুছে ফেলা হয়। অন্যদিকে ইউরোপের ইতিহাসের সব মন্দ অধ্যায়কে মুছে ফেলা হয়। সর্বশেষ ইউরোপকে এমনভাবে চিত্রিত করা হয়, যেন তা মানব ইতিহাসের উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়া। ছাত্ররা তখন সেখানে পড়াশুনার জন্য মুগ্ধতার সাথে উদগ্রীব হয়ে যায়।

এসব কর্ম সম্পাদনের পর উচ্চতর শিক্ষক ট্রেনিং করানো হয়; যাতে ডনলোপের চক্রান্ত পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়।

এই ভার্সিটিগুলো থেকেই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষকরা গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি সম্পন্ন করে বের হয় শুধু আরবি ভাষা ব্যতীত। কারণ, আরবির শিক্ষকরা প্রথমে আজহার থেকে পাশ করে পরবর্তী সময়ে এখান থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি সম্পন্ন করত। কারণ, এটাই হচ্ছে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের কারখানা। যা তাদের 'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী পদ্ধতি' হিসেবে গভীর প্রভাব ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম ছিল।

শিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য তারা প্রথমে মাধ্যমিকের ছাত্রদের থেকে বাছাই করত, যারা ধারাবাহিক দুই ধাপে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্লাসে একটানা নয় বছর তাদের বিষ পান করেছে। অতঃপর দ্বিতীয়ত নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে বাছাই করা হতো, যা তৈরি করত ভার্সিটির ইংরেজ শিক্ষকরা। এখন আপনি তাদের কাঙ্ক্ষিত

tauhiderdak.com

যোগ্যতা ও নমুনা কী হবে, তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই এসব যোগ্যতায় ইসলামপালন, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির কোনো স্থান নেই।

তাদের ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র যেমনই হোক, পাশ করে বের হওয়ার সময় নিশ্চিতভাবেই তাদের কাঙ্ক্ষিত ধরন ও গঠনে তৈরি হয়েই বের হবে। আর এ কারখানায় সবকিছু নিবিড় পরিচর্যায় হয়ে থাকে; কারণ, এখানেই পুরো জাতির ভবিষ্যৎ গড়া হচ্ছে।

তাদের এই ভার্সিটির অবস্থান ছিল আল-মুনিরা গ্রামে, যা ছিল দখলদার বাহিনীর নীলনদের প্রাসাদ থেকে কয়েক মিনিটের পথের দূরত্বে অবস্থিত। তাদের ইংরেজ শিক্ষকরা ক্লাসে শুধু শিক্ষক হিসেবে প্রবেশ করত না; বরং তারা দখলদার বিজয়ী শক্তি হিসেবে ক্লাসে ঢুকত, যারা এসেছে এসব ছাত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদেরকে সাদা চামড়ার লোকদের সামনে তুচ্ছতা ও আনুগত্যের অনুভূতি সৃষ্টির জন্য, যাদেরকে প্রভু দয়া করে এই রাষ্ট্রের শাসনে বসিয়েছে। এটাই ছিল এসব শিক্ষকের আচরণের বাহ্যিক উদ্দেশ্য। আর গোপন উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টবাদের অধীন করা, যা তারা কখনো স্পষ্ট করে বলত না; কিন্তু তাদের সব অনুষ্ঠান ও নির্দেশনায় তা বোঝাত।

অবস্থা যা-ই হোক, এসব শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের মনে ভীতি কাজ করত, যা দূর করা যেত না; বরং ছাত্ররা পড়াশুনা শেষ করে পাশ করা পর্যন্ত নিরাপদ বোধ করত না; এমনকি পাশের পরেও জীবনের বহু ক্ষেত্রে ভয় লেগেই থাকত।

এই ভীতিকর পরিবেশে ছাত্ররা বিষের ডোজ নিত। সেখানে কি তা গ্রহণ থেকে বাধা দিতে পারবে? না কেউ ইচ্ছা করলেও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে?

সেখানে বিষের ডোজ ছিল স্পষ্ট, ইনজেকশন ছিল সরাসরি।

যেমন, তোমাদের পশ্চাৎপদতার কারণ ইসলাম! সব ধর্মই পশ্চাৎপদ, তবে বিশেষভাবে ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে বেশি পশ্চাৎপদ!! তোমরা যত দিন ইসলামকে ধরে রাখবে, ততদিন পিছিয়ে থাকবে! মধ্যযুগের মতো ধর্ম দ্বারা জীবন-পরিচালনার চিন্তা থেকে বের হওয়া ব্যতীত তোমরা আধুনিক হতে পারবে না! বর্তমানে জীবন-পরিচালনার নীতি ধর্ম নয়; বরং বিজ্ঞান।

এ ছাড়াও ছিল পরোক্ষ বিষের ইনজেকশন।

tauhiderdak.com

যেমন. ইউরোপ মধ্যযুগীয় অন্ধকার সময়ে ধর্মের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাই তারা ছিল মূর্খ, পশ্চাৎপদ ও স্থবির। যখন ধর্ম ত্যাগ করেছে, তখন তারা উন্নত, সভ্য, শিক্ষিত হয়েছে এবং তাদের হাতে শক্তি ও শাসনের সব মাধ্যম উপস্থিত হয়েছে। ধর্ম ছিল বিজ্ঞানের পথে বাধা; কারণ, তা কিছু কুসংস্কারের সমষ্টি। তেমনই ধর্ম হলো কাজকর্ম, উদ্যম ও উৎপাদনের পথে বাধা; কারণ, তা শুধু আখিরাতের চিন্তা করে এবং দুনিয়াকে অবহেলা করে। তাই একে বিলুপ্ত করা আবশ্যক; যাতে কুসংস্কার দূর হয় এবং দুনিয়াকে উপভোগ করা যায় স্বাধীন মানুষের চিন্তা নিয়ে। এই স্বাধীন মানুষরাই দুঃসাহসের সাথে কুসংস্কার বিলুপ্ত করে আজকের আধুনিক ইউরোপ গড়ে তুলেছে। তারাই গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মানুষের মানবিক মর্যাদা সমুন্নত করেছে। তারা এটা করেছে ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি মেনে, যা ধর্মের অধীনে রহিত ছিল।

তখনকার ছাত্ররা তাদের এসব বিষাক্ত কথার উত্তর দিতে পারত না; এমনকি তাদের অন্তরে জবাব দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও পশ্চিমাদের প্রতি মুগ্ধতা এবং তাদের ভূমিতে সামরিক আগ্রাসন ও এসব বিষাক্ত শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষকদের প্রতি ভীতির ফলে কী জবাব দেবে, তাও জানত না।

তাদের পক্ষে তখন এটা কীভাবে জানা সম্ভব হতো যে, তাদের শিক্ষকরা যে অধঃপতনের যুক্তি দিয়ে তাদের আকিদা, দ্বীন ও ঐতিহ্যের ওপর আঘাত করছে, এর কারণ ইসলাম ছিল না; বরং উলটো এর কারণ ছিল সত্যিকার ইসলামি আকিদা থেকে বিচ্যুত হওয়া!

কীভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল পশ্চিমা সভ্যতার বাস্তবতা এবং তাদের শক্তি ও দুর্বলতার দিকগুলো বুঝতে পারা?! তাহলে তারা বুঝত যে, ইউরোপ উন্নত ও আধুনিক হওয়ার জন্য যে ধর্ম ত্যাগ করেছে, তা ছিল মূলত গির্জার বানানো নকল ধর্ম। তাই এটা ধ্বংস করাই উচিত ছিল; কারণ, তা ছিল তাদের জীবন, উন্নতি ও দুনিয়াকে সমৃদ্ধ করার পথে বাধা। কিন্তু অন্যদিকে ধর্মহীন জীবনের ক্ষতি নকল ধর্মের ক্ষতি থেকে কোনো অংশে কম নয়। যা সবশেষে তাদের সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়।

না! তাদের পক্ষে সেদিন এসব কিছুই জানা সম্ভব ছিল না; যদিও শিক্ষকদের এসব বিকৃতি ও তাদেরকে অপদস্থ করা এবং তাদের জীবনে ইসলামহীনতা ছাত্রদের কষ্ট দিত। আর যেহেতু এসব কিছু বোঝা সম্ভব ছিল না! তখন যা ঘটার আশঙ্কা ছিল তা-ই ঘটেছে। তারা এসব বিষাক্ত শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে যায় এবং তাদেরকে যে ছাঁচে

tauhiderdak.com

গড়ার চক্রান্ত করা হয়েছিল, তারা কোনো বাধা ছাড়াই সেভাবে গড়ে ওঠে।

তা ছাড়া এসব শিক্ষক কি কোনো ছাত্রের মাঝে তাদের স্বার্থের বিরোধিতা দেখলে চুপ করে থাকত? কখনোই না! তবে যা-ই হোক, আমরা কখনো কোনো ছাত্রের ব্যাপারে বিরোধিতা বা বিরোধিতার কারণে ক্লাস থেকে বহিষ্কারের কথা শুনিনি।

এই ভয়াবহ পরিবেশে চার বছর পড়ে যখন পড়াশুনা শেষ হয়, তখন মূলত তাদের কাঙ্ক্ষিত পণ্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়, যা তারা এই কারখানায় তৈরি করেছে। যারা এখান থেকে বের হয়ে নতুন প্রজন্মকে শিশু থেকে গড়ে তুলবে। তারা কোনো নির্দেশনা ব্যতীত নিজ থেকেই তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করবে। কারণ, তাদের অন্তরে সবকিছু মুদ্রিত রয়েছে। ফলে তারা নিজ থেকেই এসব বিষ উগরে দিতে থাকে। কিন্তু তারা এই বিষ উগরে দিয়ে এ থেকে মুক্ত ও সুস্থ হয়ে যায় না, যেমনভাবে কোনো সুস্থ মানুষ বিষ খাওয়ার পরে করে; বরং তারা নতুন শিশুদের তা শিক্ষা দেয়। যারা তাদের চতুষ্পার্শ্বের কিছুই জানে না; ফলে তাদের সামনে যা রাখা হয়, কোনো পার্থক্য ছাড়া সব গ্রহণ করে নেয়।

এই নিকৃষ্ট চক্রান্তের মাধ্যমে ডনলোপ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। কারণ, যদি পুরো প্রজন্মকে নষ্ট করা না যায়, তাহলে তাদের চলে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের অন্যায়-অনাচারের যুগ শেষ হয়ে যাবে। তাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী প্রজন্মের মাঝেও যেন ভাইরাস সংক্রমিত হতে থাকে; যাতে পরবর্তী কোনো প্রজন্ম আর ইসলামে ফিরে আসার চিন্তাও না করে।

তাদের প্রতিষ্ঠিত বিশাল ভার্সিটির মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে এই বিষাক্ত জ্ঞান চক্রাকারে অব্যাহত থাকা নিশ্চিত করে। যেখানে শিক্ষক তার ছাত্রকে নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ে তোলে এবং ছাত্ররা তাদের এই গঠনকে প্রতিরোধ করতে পারে না।

তবে তাদের চক্রান্ত এখানেই শেষ হয়নি। এই শিক্ষকদের মধ্যে যারা কিছুটা দক্ষ ছিল, তাদের পুরস্কারস্বরূপ ইংল্যান্ডে নিয়ে নতুনভাবে গড়ে তোলা হতো। ফলে তারা স্বয়ং পশ্চিমাদের অবস্থানে গিয়ে আরও হিংস্রভাবে চক্রান্ত বাস্তবায়ন করত। তারা পুরাদস্তুর পশ্চিমা হয়ে যেত, যারা দ্বীন, ভাষা ও জাতিকে চিনে না। এগুলোর দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়। তাদেরকে মূল কেন্দ্রে রাখা হতো; যাতে এদের নিকৃষ্ট প্রভাব আরও ব্যাপক হয়; এমনকি সর্বশেষ তাদের কেউ হতো শিক্ষামন্ত্রী বা সচিব। তারা স্বজাতির পবিত্র বিষয়গুলো ধ্বংস করত, যা হয়তো স্বয়ং ডনলোপ করতে সাহস

tauhiderdak.com

করত না। কেননা, ডনলোপ পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্দেহ সৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য বাহ্যিক ধর্মীয় আবরণ ধারণ করে রাখত; ফলে মানুষ উত্তেজিত হতো না।

আর এই দুষ্টচক্রের মাঝে আরবি ভাষা ও ইসলাম ধর্মের শিক্ষকদের আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হতো, পা দিয়ে মাড়ানো হতো। সর্বদা অন্যরা তাদের ফেলে এগিয়ে যেত। তারা এই 'নতুন সমাজে'র নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে এগিয়ে যেত।

এভাবেই একে একে নতুন সরকারি বিদ্যালয় ও ভার্সিটি খোলা হতো। যার মাধ্যমে মূল চক্রান্তকারীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেলেও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারা চলমান থাকত। যা ছিল 'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী' পদ্ধতি।

tauhiderdak.com

দুই. প্রচারমাধ্যম ও মিডিয়া

ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের আরেকটি মাধ্যম হলো মিডিয়া। যেমন বই, নাট্যমঞ্চ, ছায়াছবি, রেডিও। (সেই যুগে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে তখনও টিভি, মোবাইল, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া আবিষ্কার হয়নি। এগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর সেই একই পরিকল্পনায় চলতে থাকে এবং প্রবল তরঙ্গের মতো সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।)

বইয়ের ক্ষেত্রে তাদের আধুনিকায়নের প্রথম যুগে শুধু অনুবাদকর্ম চলে। তবে অনুবাদের ধারা পরেও জারি ছিল।

মুসলিমদের তখনকার পশ্চাৎপদ অবস্থার ভিত্তিতে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তারা অনুবাদকর্ম শুরু করবে। কারণ, তখন তাদের নিজস্ব মৌলিক লেখার অবস্থা ছিল না এবং পুরো ইসলামি পরিবেশ জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তি কার্যক্রম থেকে শূন্য হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু কোন বিষয়গুলো অনুবাদ করা আবশ্যক ছিল?

তখন আবশ্যক ছিল (প্রথম যুগের অনুবাদ-কার্যক্রমের মতো) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইগুলো অনুবাদ করা। কারণ, বিজ্ঞানের প্রতি তাদের প্রয়োজন ছিল অত্যধিক, আর মুসলিমরা ক্রুসেডের আক্রমণের সামনে পরাজয় থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধঃপতনই সবচেয়ে বেশি অনুভব করে।

এটা সত্য যে, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু বই অনুবাদ হয়েছে; কিন্তু তাদের অনুবাদ-কার্যক্রমের মূল অংশই কাঙ্ক্ষিত ধারা থেকে ভিন্ন পথে চলে গিয়েছিল বা বলা যায় প্রয়োজন থেকে ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল।

স্বল্প কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই অনুবাদের পাশাপাশি শত শত গল্প-কাহিনি ও নাটক-উপন্যাসের বই অনুবাদ হয়। যেগুলো পশ্চিমা ধর্মবিরোধী সেক্যুলার চিন্তার ভিত্তিতে লেখা হয়েছিল। পাশাপাশি সেগুলোতে খুব গুরুত্বের সাথে ডারউইনের বিবর্তনবাদের তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছিল।

এসব গল্প ও নাটক ব্যাপক প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি রীতিনীতি ধ্বংস করে দেওয়া, যা অবাধ মেলামেশাকে বাধা দেয়; অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অধঃপতন থেকে

tauhiderdak.com

দূরে রাখে। কারণ, এসব রীতিনীতি যদিও প্রাণশূন্য ছিল[২৮৩], তবুও তা ছিল মুসলিম-সমাজে ব্যাপক চারিত্রিক অধঃপতন ঘটাতে খ্রিষ্টবাদের চক্রান্তের পথে বিশাল বাধা।

যেমন নেপোলিয়ন তার সাথে কিছু চরিত্রহীন উলঙ্গ নারী নিয়ে এসেছিল, যা ঐতিহাসিকরা তার ঘটনায় লিখেছে। এটা তার হামলার একটি উদ্দেশ্য ছিল। যাতে মিশরীয় মুসলিম-সমাজে পর্দাহীনতার প্রসার ঘটে, অতঃপর অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করে। তাদের এসব প্রেমকাহিনি ও নাট্যমঞ্চের মূল উদ্দেশ্য এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে, তারা এগুলো এমন পরিবেশে প্রদর্শন করত, যা ছিল মুসলিম রক্ষণশীল পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দখলদার ক্রুসেডাররা ইসলামি জীবনাচারের মূল একটি ভিত্তি তথা রক্ষণশীল পরিবেশকে ধ্বংস করে দিতে চেষ্টা করেছে।

তাদের গল্প-উপন্যাস ও নাটকে মৌলিকভাবে নারী-পুরুষ বা যুবক-যুবতিদের মাঝে অবৈধ সম্পর্ককে উপস্থাপন করা হতো এবং এর মাধ্যমে ইসলামি মূল্যবোধের বাইরে গিয়ে এগুলোকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হতো। সেগুলো এমন শৈল্পিক পরিবেশে উপস্থাপন করা হতো, যেখানে সবকিছুই হতো খুব চাকচিক্যময় এবং জাদুময়ী ভঙ্গিতে। যা মন্দের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি করত।

এটাই হলো শিল্পকলার ভয়াবহতা। এই শিল্পকলা প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। কারণ, এখানে বিষয়গুলো এমন আবেগ-অনুভূতিপূর্ণ পরিবেশে উপস্থাপন করা হয়; যার ফলে পাঠক বা দর্শক তার কল্পনায় উপস্থাপিত দৃশ্যের ছবি আঁকতে থাকে এবং দৃশ্যে দেখানো ব্যক্তিদের মতো প্রতিক্রিয়া করতে থাকে। যার ফলে শিল্পীরা এর দায়ভার বহন করে। কারণ, তারা যখন কল্যাণের পথে থাকবে, উত্তম আদর্শ ধারণ করবে, তখন তারা কল্যাণকে সুন্দর করে উপস্থাপন করবে এবং মন্দ থেকে বিরত রাখবে। এটা সরাসরি নির্দেশনার মাধ্যমে হওয়া আবশ্যক নয়; বরং শিল্পীরা যত বেশি পরোক্ষ মাধ্যম ব্যবহার করবে, অর্থাৎ যা উপস্থাপন করতে চাচ্ছে, তা কোনো ঘটনা ও দৃশ্যপটের মাধ্যমে আবেগ-অনুভূতি মিশ্রিত করে উপস্থাপন করবে, সরাসরি সে নিজে এতে প্রবেশ করা ব্যতীত, তখন সেগুলো পাঠক ও শ্রোতার মনে তত বেশি প্রভাব ফেলবে এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর হবে।[২৮৪] কিন্তু সে যদি উত্তম আদর্শের ধারক না হয় বা এর বিরোধী হয়, সমাজ থেকে এই আদর্শ ও মূল্যবোধ ধ্বংসের প্রতি আগ্রহী হয়, তাহলে সে শিল্পের মাধ্যমে পাঠক বা শ্রোতাকে তার কাঙ্ক্ষিত সারিতে টেনে নেওয়ারও সক্ষমতা রাখে।

২৮৩. বক্ষ্যমাণ বইয়ের 'অধঃপতনের ধারা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৮৪. আমি 'ইসলামি শিল্পকলা' বইয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি।

tauhiderdak.com

পশ্চিমাদের থেকে যে শিল্প-সাহিত্য অনুবাদ হতো, তা ছিল ধর্মীয় সকল মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তা এমন সমাজ গঠনের আহ্বান করত, যা পূর্ণরূপে আদর্শ থেকে মুক্ত হবে। এটা হবে এমন সমাজ, যা ধারাবাহিকভাবে অধঃপতিত হয়ে সর্বশেষ পশুসমাজে পরিণত হবে। যারা এসব ঘটনা উপন্যাস ও নাটক আরবিতে রূপান্তর করত, হোক তারা তাদের এ কাজের ফলাফলের ব্যাপারে সচেতন বা অসচেতন। এ শিল্প প্রচার করা বিশেষ করে যুবকদের মাঝে ছড়ানোর পেছনে অনেক প্ররোচনা দেওয়া হতো।

এসবের পেছনে উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

একজন যুবক-যুবতি যখন প্রেমকাহিনি পাঠ করবে বা দেখবে, যেখানে তার মতো যুবক-যুবতিরা নিজেদের মাঝে মিলিত হচ্ছে এবং আবেগপূর্ণ কথাবার্তা ও আচরণ করছে, যেগুলো শিল্পের আকর্ষণ ও উত্তেজনার মিশ্রণে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তখন সে অন্তরে এই কামনা করবে যে, যদি সে স্বয়ং সেই দৃশ্যে অবস্থান করত অথবা সে চাইবে যাতে এই ঘটনা বা নাটকের মতো কিছু তার জীবনেও হয়। সেই যুবক হয়তো ভালো করেই জানে, একটি রক্ষণশীল সমাজে যেটা সে পড়ছে বা দেখছে, এ রকম ঘটনার সুযোগ নেই। তখন সে কামনা করবে যেন এমন একদিন আসে, যেদিন এই সামাজিক রীতিনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। যা তার জন্য পশ্চিমাদের মতো অবাধ ভোগের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আর সত্যিই যদি এমন একদিন চলে আসে, যখন এই সামাজিক রীতি ভেঙে পড়বে—আর বর্তমানে এই পরিস্থিতি চলেও এসেছে—তখন এ যুবকরা তো এর বিরোধী হবেই না; বরং উলটো তারাই একে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসবে।

আর যেসব বইয়ে সেক্যুলার চিন্তাধারা রয়েছে, তা অনুবাদের উদ্দেশ্য তো আরও স্পষ্ট।

ঐতিহাসিক শাতলিয়ে তার 'মুসলিম-বিশ্বের ওপর হামলা' বইয়ে লিখেছে,

'নিঃসন্দেহে প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যক্রম মুসলিমদের অন্তরে ইসলামি আকিদার ব্যাপারে দ্বিধা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তারা তাদের চিন্তাগুলো ইউরোপীয় ভাষায় প্রচার করেছে। এগুলোকে ইংরেজি, জার্মান, হল্যান্ড বা ফরাসি ভাষায় ইউরোপীয় পত্রিকার মাধ্যমে ছড়ানো হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বস্তুবাদী উন্নতির পথ সুগম করা এবং মিশনারিদের মাধ্যমে ইসলামি

tauhiderdak.com

চিন্তার মূল ভিত ধ্বংস করে দেওয়া। কারণ, তারা আকিদা থেকে বিচ্যুত হলে তাদের শক্তি ও অবস্থান টিকে থাকবে না।'

এই মিশনারির বক্তব্যই আমাদের সামনে আরবি ভাষায় তাদের চিন্তাধারা অনুবাদ করে প্রচার করার পেছনে উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেয়। তা হলো, বিদেশি ভাষায় তাদের চিন্তার প্রচার যতই বিস্তৃত হোক, অধিকাংশ জনগণই এসব মতাদর্শ এর মূল ভাষায় পাঠ করতে অক্ষম থাকবে। যার ফলে এই মিশনারি যে বাধার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে, তা সর্বদাই মুসলিমদেরকে বহিরাগত ধ্বংসাত্মক উপকরণ থেকে রক্ষা করে যাবে। তাই এখন যদি অনুবাদের মাধ্যমে এ বাধা ভেঙে যায়, তাহলে এই প্রাচ্যবিদের বর্ণনামতে ইসলামি আকিদার মূল ভিত্তি ধ্বংস করে দেওয়া যাবে এবং কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

ডারউইন ও বিবর্তনের থিউরি প্রচারে বিশেষ গুরুত্বের কারণ বোঝার জন্য প্রটোকলের বক্তব্য যথেষ্ট—(আমরাই ডারউইন, মার্ক্স, ফ্রিডরিখ নিচের সাফল্যের পেছনে কলকাঠি নেড়েছি। কারণ, মূর্খদের বিশ্বাসের ওপর তাদের চিন্তাধারার প্রভাব আমাদের সামনে স্পষ্ট।)[২৮৫] (আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদীরা ডারউইনের মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ইউরোপের অবশিষ্ট মূর্খদের বিশ্বাস ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সেখানে এমন এক নব্য সমাজ গড়ে উঠেছে, যাদের কোনো ধর্ম, চরিত্র ও রীতিনীতি নেই।)[২৮৬] (ক্রুসেডারদের চক্রান্ত ছিল একই উদ্দেশ্যে মুসলিম-সমাজেও এসব ধ্বংসাত্মক আবর্জনা ব্যবহার করা; যাতে এখানেও এমন নতুন সমাজ গড়ে ওঠে, যাদের কোনো দ্বীন, চরিত্র ও রীতিনীতি থাকবে না। এ জন্যই মুসলিম-বিশ্বেও এসব থিউরি প্রচারে গুরুত্ব দেওয়া হয়; যেন এখানেও তা-ই ঘটে, যা সেখানে ঘটেছিল।)[২৮৭]

সংবাদমাধ্যমের (ও বর্তমানের ইলেকট্রনিক মিডিয়া) অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ!

কারণ, বইপত্র সাধারণত শুধু শিক্ষিত ব্যক্তিরাই পড়ে থাকে; কিন্তু সংবাদমাধ্যমের সীমা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়; এমনকি যারা এসবের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, তারাও পাশের মানুষদের থেকে জেনে যায়।

.....

২৮৫. জায়োনিস্ট প্রবীনদের প্রটোকলসমূহের ২য় প্রটোকল।

২৮৬. 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতাদর্শসমূহ' বইয়ের 'ইউরোপ ধ্বংসে ইহুদিদের ভূমিকা' অধ্যায়টি দেখুন।

২৮৭. মুসলিম-বিশ্বের সর্বত্রই বারবার এই চেষ্টাগুলো করা হচ্ছে।

tauhiderdak.com

এ জন্যই পশ্চিমারা প্রত্যক্ষভাবে মুসলিম-দেশগুলোতে সংবাদমিডিয়া প্রতিষ্ঠা করত। যা এখন তাদের অনুগত সেক্যুলার ও নাস্তিকরা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে। যেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এই উম্মাহকে ইসলাম থেকে দূরে সরানো। এর কর্মপন্থা হবে তাদের পশ্চিমা প্রভুর নীতিতে, যা 'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী', যাতে সন্দেহ না হয়।

ব্রিটিশদের সামনে মিশরে নেপোলিয়নের বোকামিপূর্ণ অভিজ্ঞতা উপস্থিত ছিল। যেখানে তাড়াহুড়োর ফলে মুসলিমরা তার চক্রান্ত বুঝে ফেলে এবং তার বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাই তারাও যদি তাড়াহুড়ো করত, তবে তাদের চক্রান্তও ফাঁস হয়ে যেত। তাই ক্রোমার ও ডনলোপ সন্দেহ সৃষ্টি না হওয়ার জন্য ধীরে কাজ করে যায়।

এ জন্য তারা প্রথমে মিডিয়াতে ইসলামের ওপর সরাসরি আক্রমণ করত না; বরং এমন ধারায় সংবাদ বর্ণনা করত, যে কেউ প্রথম দৃষ্টিতে একে ইসলামি পত্রিকা ভেবে ভুল করত। কারণ, সেখানে ইসলামের প্রশংসা, মহান রাসুলের প্রশংসা করা হতো। দৈনিক খবরের একটি অংশে থাকত উসমানি সুলতানের বিভিন্ন খবরাখবর। যেখানে সুলতানের সাথে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর আলোচনা, বৈঠক বা চুক্তির খবর থাকত। একজন মুসলিম তার পত্রিকায় এর চেয়ে আর বেশি কী চায়?

কিন্তু কেউ যদি এসবের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায়, তাহলে তার সামনে ভিন্ন উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেখানে ইসলামের এমন প্রশংসা করা হতো; যাতে মুসলিমদের আবেগ সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু কখনোই একে জীবনব্যবস্থা ও শাসনবিধান হিসেবে আলোচনা করা হতো না। যখন রাষ্ট্রীয় বা মুসলিম-বিশ্বের কোনো সমস্যার আলোচনা হয়, তখন সমাধান হিসেবে ইসলামি শরিয়াহ বা এমনকি ইসলামি মানসিকতা থেকে সমাধান দেওয়া হতো না; বরং পশ্চিমাদের অভিজ্ঞতা ও সেক্যুলার মানসিকতা থেকে তা দেওয়া হতো।

শুধু এতটুকুই নয়। ইসলামের আবেগি আলোচনা প্রতিদিন করা হতো না; যাতে মানুষের মনে দ্বীনের স্মরণ জাগ্রত থাকে। বরং শুধু কিছু নির্দিষ্ট উপলক্ষ্যে এর আলোচনা হতো। যার ফলে ইসলাম তার মূল চেতনাই শুধু হারায়নি; বরং তা মুসলিমদের জীবনে মাঝে মাঝে আগত কিছু উপলক্ষ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। রাসুলের প্রশংসা করে একটু আবেগকে শানিত করা হতো। অতঃপর মাসের পর মাস তাদের আবেগ ইসলামের স্মরণশূন্য অবস্থায় রয়ে যেত।

tauhiderdak.com

বরং তারা ধর্মীয় আলোচনা ও ইসলামি ইতিহাস বর্ণনার এই শূন্যতাকে পূরণ করত ডনলোপের কর্মপন্থায় ইউরোপের শক্তি, উত্থান, সভ্যতা, মহত্ত্বের কথা বর্ণনা করে। এতে প্রতিদিন ইউরোপের আলোচনা হতো। সেখানের সংবাদ প্রচার হতো।

সাধারণত ইউরোপের সংবাদ প্রচার করা একেবারেই স্বাভাবিক বিষয়। তা শুধু এ জন্য নয় যে, মিডিয়ার দায়িত্ব হচ্ছে পাঠকের সামনে বিশ্বের সংবাদ তুলে ধরা। শুধু এ জন্যও নয় যে, ইউরোপ তখন সর্বক্ষেত্রে উন্নতির কেন্দ্রে ছিল। বরং বাস্তবতা হলো—আমরা মানি বা না মানি—ইউরোপ তখন বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে ছিল। বিশ্বের সামরিক, রাজনৈতিক, বিজ্ঞান ও সভ্যতার লাগাম তারাই নিয়ন্ত্রণ করত।

তা সত্ত্বেও একটি মুসলিম-দেশের ইসলামি পত্রিকা এসব সংবাদ এমন ধাঁচে লিখবে; যাতে পাঠক অনুভব করবে, সে মুসলিম। সাময়িক পরাজিত হলেও সে অনুধাবন করবে যে, এসব বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের থেকে ভিন্ন। সে এমন বিষয়ে রাগান্বিত হবে, যা অন্যদের খুশি করে। আবার এমন বিষয়ে খুশি হয়, যা অন্যদের রাগান্বিত করে। সে অন্যদের সাথে অংশ নেবে, তবে তার বিশেষ অবস্থান থেকে।

এমনকি আমরা তাদের সংবাদ উপস্থাপনের পদ্ধতির কথা বাদ দিলেও সেসব পত্রিকায় সর্বদা যেভাবে ইউরোপের আলোচনা হয়, তাতে ছাড় দিতে পারি না। তা ছাড়া পত্রিকায় ইউরোপের আসল চিত্র তুলে ধরা হতো না; বরং তাতে রংচং মেখে এমনভাবে পেশ করা হতো; যেন পাঠক ভাবে, ইউরোপই হলো বিশ্ব। ইউরোপ ছাড়া সভ্যবিশ্বে আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

অথচ পশ্চিমারা বিজয়ী ও ক্ষমতাবান ছিল ঠিক, তবে তাদের জীবনব্যবস্থা পুরোটাই ছিল বিকৃতি ও ভ্রষ্টতায় পরিপূর্ণ।

এসব পত্রিকায় কি পশ্চিমাদের সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহতা ও জুলুমের কুৎসিত চিত্র তুলে ধরত, যা তারা দখলকৃত দেশগুলোয় চালাত, যার অধিকাংশ ছিল মুসলিম-দেশ?

এখানে কি তাদের মুসলিম-দেশগুলো দখলের পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের আড়ালে ক্রুসেডীয় চেতনার কথা উল্লেখ করা হতো?

পত্রিকায় কি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ও এর মূল লক্ষ্য যে উম্মাহকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করা, তা লেখা হতো?[২৮৮]

.....

২৮৮. এটা অসম্ভব ছিল; কারণ, এই পত্রিকাই তো ছিল চিন্তাযুদ্ধের অংশ।

tauhiderdak.com

ইউরোপীয় ও পশ্চিমাদের জীবনের চারিত্রিক অধঃপতন ও তাদের জীবনে এর ভয়াবহ প্রভাবের কথা কি পত্রিকায় উঠে আসত?

সেখানে কি সুদ ও পুঁজিবাদ এবং এগুলো কীভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধ্বংস সৃষ্টি করছে, তা নিয়ে কোনো আলোচনা হতো?[২৮৯]

এসব পত্রিকায় কি উসমানি খিলাফত ধ্বংসের জন্য ইউরোপীয়দের—জায়োনিস্ট ক্রুসেডীয়—চক্রান্তের কথা লেখা হতো?

মুসলিম-রাষ্ট্রের ইসলামি পত্রিকার পক্ষে এই বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করা বা বিমুখ থাকা সম্ভব ছিল না যে, ইউরোপ বিশ্বকে শাসন করবে। মুসলিম-রাষ্ট্রের ইসলামি পত্রিকার পক্ষে এই বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করা বা এ থেকে বিমুখ থাকা সম্ভব ছিল না। তাদেরকে এটা স্বীকার করে নিতে হতো যে, ইউরোপ এখন বিশ্ব শাসন করছে। তারা এখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শক্তিশালী; কিন্তু প্রথমে ইউরোপের ভ্রান্তি, বিচ্যুতি ও অধঃপতনের বিষয়গুলোকে সমালোচনা করবে, যা ইউরোপীয়দের জীবনে ব্যাপকভাবে রয়েছে। অতঃপর সেখানে এমনভাবে আলোচনা করা হবে; যাতে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে এবং তারা তাদের অধঃপতন থেকে উঠে আসে এবং এর মাধ্যমে জমিনের যেই কর্তৃত্ব তারা হারিয়েছে, তা ফিরে আনতে সক্ষম হয়। যার পদ্ধতি হবে ইউরোপ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী সভ্যতার উন্নতিগুলো গ্রহণ করবে সেই সাথে নিজেদের দ্বীনি চরিত্র ঐতিহ্য রক্ষা করে চলবে। ইউরোপের মাঝে বিলীন হয়ে যাবে না। ইসলামের আকিদা, শরিয়াহ এবং দ্বীনি চেতনার বিরোধী কোনো বিষয়ে তাদের অনুকরণ করবে না।

এটাই হচ্ছে ইসলামি এবং অনৈসলামিক সাংবাদিকতার মাঝে পার্থক্য।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে, মুসলিমরা সেদিন কোথায় ছিল? কেন তারা এমন কোনো পত্রিকা প্রকাশ করেনি, যা তাদের নিজস্ব অবস্থান স্পষ্ট করবে, তাদের অস্তিত্ব ও স্বার্থের জন্য কাজ করবে?

এ ক্ষেত্রে আমরা বলব, মুসলিমরা চেতনাহীন ছিল এবং বিশ্বাসগত বিচ্যুতির ফলে পশ্চিমামুগ্ধতা তাদের জীবনে আরও অন্যান্য অধঃপতন সৃষ্টি করে রেখেছিল।

.....

২৮৯. আলোচনা হলেও সেখানে এসবের বৈধতা ও আবশ্যকীয়তা বোঝার চেষ্টা চলত।

তবে শুধু সাংবাদিকতার ব্যাপারটির ক্ষেত্রে বলতে গেলে, মুসলিমদের সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকলেও তাদের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল যে, তারা ইউরোপীয় সভ্যতার সকল মন্দ ও বিচ্যুতিকে প্রতিরোধ করবে। সে সাথে মুসলিমদেরকে ইউরোপের অনুকরণ করা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সব সমস্যাকে ইউরোপীয়দের ধারায় সমাধান না করতে আগ্রহী করে তুলবে।

আপনাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যা আমাদের উদ্দিষ্ট অর্থ স্পষ্ট করবে।

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের ফলে সেখানে পরিবারব্যবস্থা ভেঙে গেছে, চারিত্রিক নষ্টামি ও অবাধ মেলামেশার প্রসার ঘটেছে। এখানে আমরা সবকিছু (এটা যে মূলত শিল্প-বিপ্লব ছিল না; বরং সম্পূর্ণরূপে ইহুদিদের চক্রান্তে ঘটেছে এবং এর চারিত্রিক অধঃপতনের পেছনে যে মানসিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তার করেছে) এসব কথা বাদ দিলেও, এটা ছিল শুধুই ইউরোপের নিজস্ব সমস্যা, যা সেখানকার স্থানীয় পরিবেশে ঘটেছে।

এর সাথে মুসলিমদের কী সম্পর্ক?

কেন তারা এটা নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছে?

এমনকি যদি এটা নিয়ে ব্যস্ত হয়, তবে কোন দৃষ্টিতে বিচার করছে? তা কি এই দৃষ্টিতে যে, ইউরোপ যখন ধর্ম, চরিত্র ও ঐতিহ্য ত্যাগ করেছে, তখন তাদের ওপর এই চারিত্রিক বিচ্যুতি নেমে এসেছে; না এই দৃষ্টিতে যে, এটা ছিল শিল্প-সভ্যতার জন্য সামাজিক বিশেষ প্রয়োজন?

এটাই হচ্ছে মূল পার্থক্য।

খ্রিষ্টান ও সেক্যুলার মিডিয়াতে অবাধ মেলামেশা ও ব্যভিচারকে সভ্যবিশ্বের সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে উপস্থাপন করে! অথচ মুসলিমরা শত শত বছর কাটিয়ে দিয়েছে, যখন তাদের এর কোনো প্রয়োজন বা আলোচনারও দরকার হয়নি।

তারা এসব কেন বলে? এগুলো কি শুধুই শ্রোতা ও পাঠককে বিনোদন দেওয়ার জন্য? এসব মানসিক, চারিত্রিক ও সামাজিক নোংরামি নিয়ে কি মজা করা যায়?

না, এগুলো শুধু বিনোদনের জন্য নয়; বরং এসব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম-সমাজে অশ্লীলতা প্রচারের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে তোলা এবং একে সমাজের অংশ বানিয়ে

tauhiderdak.com

ফেলা। যাকে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে রক্ষা করা হবে।

এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামি চেতনাবোধ নষ্ট করে ফেলা, যা অশ্লীলতা থেকে ও তা প্রকাশ্যে করা থেকে বিরত রাখে। এর পূর্বে শরিয়াহকে অপসারিত করা হবে, যা ব্যভিচার রুখে দেয় এবং এর ফলে শাস্তি দেয়। যাতে কাঙ্ক্ষিত দিন আসলে মানুষের মন একে অপছন্দ না করে এবং অন্তর ঘৃণা না করে। সেখানে অবশ্য পূর্ব থেকেই তারা এ 'সভ্যতা' থেকে জন্ম নেওয়া 'সামাজিক প্রয়োজন' মেনে নিয়েছিল এবং এই 'প্রয়োজন' চর্চার বিরোধীরা গণ্য হতো পশ্চাৎপদ ও স্থবির, যারা সভ্যতার কাফেলায় চড়তে চায় না এবং পুরো বিশ্বে চলমান উন্নতির চেতনা ধারণ করে না।

এটা শুধু একটি নমুনা, যার ওপর তাদের অন্যান্য সব ধ্বংসাত্মক বিষয়কে পরিমাপ করা যায়। যেমন অবাধ মেলামেশা, ফ্রি মিক্সিং, নারীবাদ, আধুনিক সেক্যুলার জীবনে দ্বীনের ভূমিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। কীভাবে তাদের মিডিয়ায় এগুলোকে উপস্থাপন করে এবং ক্রুসেডের চিন্তাযুদ্ধের সব চক্রান্ত বাস্তবায়ন করে।

এসব সংবাদমিডিয়া মুসলিমদের জীবনে মৌলিকভাবে দুটি পন্থায় এই ক্ষতিকর চক্রান্ত বাস্তবায়ন করে, ইসলামের কর্তৃত্ব হ্রাস করা এবং এর কেন্দ্র ইউরোপের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া; যাতে ধীরে ধীরে ইসলামের পরিবর্তে এটাই মুসলিমদের গন্তব্যে পরিণত হয়। যেখানে তারা তাদের বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থার সমাধান খুঁজবে এবং এর মাধ্যমে সভ্যতার বাহনে চড়ে পশ্চাৎপদতা ও অধঃপতন থেকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে।

এটাই হচ্ছে পূর্বে রিফাআহ তাহতাবির আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ। কেননা, সে এমন জাতির মাঝে হঠাৎ এসব প্রচারণা শুরু করে, যারা তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু আজ এর থেকে বেশি খারাপ জিনিস মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছে। কারণ, মিডিয়া 'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী' পন্থায় মানুষের শ্রবণ ও অন্তরকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। যার ফলে তা যখন এসেছে, মানুষ এর জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল; বরং অনেকে এর জন্য অগ্রগামী ছিল।

কেউ হয়তো বলতে পারে, এই বিষয়গুলো কি মুসলিমদের বেষ্টন করে নেওয়া অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটা নিশ্চিত ছিল না? তাহলে তো এসব মিডিয়া নতুন কিছু করেনি; বরং মানুষের চিন্তা-অনুভূতিতে যে পরিবর্তন ঘটা আবশ্যক ছিল, তা এর স্রোতে ভেসে গেছে।

tauhiderdak.com

আমরা দুটো পয়েন্টে এর উত্তর দেবো।

মুসলিমদের অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমনটি ঘটার বিষয় আমরা প্রাধান্য দিচ্ছি, তবে এটাই ঘটবে, তা নিশ্চিত ছিল না। কারণ, জাজিরাতুল আরবে মানুষের আকিদা শুদ্ধ করা ও সব ভ্রান্তি দূর করার জন্য মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদি ﷺ যে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তা প্রমাণ করে অন্যান্য অঞ্চলে ঘটা পরিস্থিতি নিশ্চিত কিছু ছিল না। সেসব স্থানেও জাজিরাতুল আরবের মতো উম্মাহর অবস্থা সংশোধনের জন্য 'আকিদাগত বিচ্যুতি' দূর করার আন্দোলন হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এই সংবাদ মিডিয়াগুলো (অবশ্যই অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমের সাথে) যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তা অন্যান্য অঞ্চলে এমন আকিদাগত শুদ্ধির আন্দোলনের সম্ভাবনাকে একেবারে ক্ষীণ করে ফেলেছে।[২৯০]

আরেকটা বিষয় হলো, এই সংবাদমাধ্যম শুধু সহযাত্রী ছিল না; বরং তারা ছিল চালক। তারা শুধু মানুষের চিন্তায় পূর্ব থেকে থাকা বিষয় নিয়ে কথা বলত না; বরং তারা এমন বিষয়ে আলোচনা করত, যা মানুষের মনে প্রবেশ করানো তাদের উদ্দেশ্য ছিল। অশ্লীলতা ছড়ানোর উদাহরণ এখানে স্পষ্ট। এই পত্রিকাগুলোই মুসলিম-সমাজে পশ্চিমা ধর্মহীন চিন্তাধারা প্রচার করেছে; যদিও তারা তা গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না বা পূর্বে এটা নিয়ে ব্যস্ত হয়নি।

এমনকি যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, বিজয়ী ও পরাজিতের অবস্থা এখানে চূড়ান্ত ফলাফল ঘটিয়েছে—চাই পত্রিকার কোনো ভূমিকা থাকুক বা না থাকুক—তবে এতে সন্দেহ নেই যে, পত্রিকার ভূমিকা ছিল পরাজিতকে বিজয়ী

.....

২৯০. এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। তৎক্ষণাৎ সময়ে জাজিরাতুল আরবের দেশগুলোতে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক সংযোগ তৈরি হলেও আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়িম হতে পারেনি। এর কারণ হলো, সেখানে ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মিডিয়া ও সংস্কারবাদী ধারার জন্ম হতে পারেনি। এ জন্য আরব দীর্ঘ দিন দ্বীনি পরিবেশের দিক থেকে রক্ষণশীল থাকতে পেরেছে। জাজিরাতুল আরবে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও দ্বীনহীনতার পরিবেশ বর্তমান সময়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষত ৯/১১ এর পর থেকে। সেখানের সমাজ ও প্রজন্ম এখন আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। শাসকরা আধুনিকতার পরিবেশ তৈরিতে নিকৃষ্টভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপনিবেশ আমলে হিন্দুস্তানেও উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে উপনিবেশবিরোধী ও শুদ্ধি আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে ব্রিটিশরা তাদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়িম করতে পারার অন্যতম কারণ হলো ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা ও মিডিয়ামাধ্যমগুলো। তারা মুসলিমদের ভেতরই তাদের চিন্তাচেতনার লোক তৈরি করে ফেলেছিল।

tauhiderdak.com

খ্রিষ্টানদের গোলাম বানানোর কাজ দ্রুত করা, অধঃপতন গভীর করা ও পুনর্জাগরণকে বাধা দেওয়া।

একপর্যায়ে খুব ধীরে এসব মিডিয়া ইসলামকে আক্রমণ শুরু করে।

তখন কি সরাসরি ইসলামের ওপর আক্রমণ করত? কখনো না, উম্মাহর অন্তরে থাকা দ্বীনের অবশিষ্ট চেতনা এমন ঘটনাকে বাধা দিত। যদি এমন ঘটত, তবে জনগণ মিডিয়ার বিরুদ্ধে নেমে তাদেরকে ধ্বংস করে দিত।

তারা বিভিন্ন প্রথাকে আঘাত করত প্রাচীন প্রথার শিরোনামে।

যদি খোঁজ নিই যে, এসব প্রাচীন প্রথাগুলো কী, যাতে তারা আঘাত করত? তাহলে দেখব, এগুলোর অধিকাংশই ছিল ইসলাম।

এটা সত্য যে, প্রচলিত এসব প্রথার মাঝে এমন কিছু জাহিলি প্রথা ছিল, যা মুসলিম উম্মাহর আকিদাগত বিচ্যুতির যুগে তাদের মাঝে ফিরে এসেছিল।

এসব অনৈসলামিক প্রথা ছিল তাদের নিকৃষ্ট দরজা, যা দ্বারা সংবাদমিডিয়াগুলো প্রবেশ করে প্রাচীন প্রথার ওপর আঘাত করে, এই যুক্তিতে যে, ইসলামে এসব নেই। কট্টরপন্থী কিছু লোক এগুলো বানিয়ে এতে ধর্মের পোশাক পরিয়ে দিয়েছে; যাতে এর আড়ালে তারা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ ও পশ্চাৎপদতা রক্ষা করতে পারে। এটা এমন সত্য, যা দ্বারা মন্দ উদ্দেশ্য। কারণ, এসব প্রথার ওপর আঘাতের দ্বারা একে সঠিক ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছা ছিল না; বরং তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, এই নোংরা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ইসলামের মূল সঠিক প্রথাগুলোর ওপরেও আঘাত করা। এই বলে যে, এগুলো সবই হচ্ছে প্রাচীন রীতি, যা ইসলামে নেই।

নারীকে অবজ্ঞা করা, তার ইসলাম-প্রদত্ত অর্থনৈতিক অধিকার খর্ব করা, তার সাংসারিক দায়িত্ব ও ভূমিকার মূল্যায়ন না করা, সংসারে তাদের সম্মানজনক অবস্থানকে রক্ষা না করা, তাকে পুরুষের মানবিক সত্তার সমান মনে না করা এবং মূর্খ ও অপদস্থ অবস্থায় ফেলে রাখা—এসব ইসলামে নেই।

কিন্তু অপ্রয়োজনীয় মেলামেশাকে বাধা দেওয়া, সৌন্দর্য প্রদর্শন ও ফিতনাকে বাধা দেওয়া, নারী-পুরুষের মাঝে অবাধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা, সংসারকে তার মূল দায়িত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা—এ সবই ইসলামের আদেশ। যা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর

tauhiderdak.com

রাসুল ﷺ নির্ধারণ করেছেন। কোনো কট্টরপন্থী 'ধর্মীয় ব্যক্তি' নির্ধারণ করেনি বা পুরুষরা নিজ কর্তৃত্ব ও পশ্চাৎপদতা রক্ষার জন্য এতে ধর্মের পোশাক পরায়নি।

কিন্তু সেসব সাংবাদিক ও লেখকরা সব রীতির ওপর সামগ্রিকভাবে আঘাত করেছে; সঠিক হোক বা ভুল, এমন রীতির সমালোচনা করেছে, যা নারীদের শিক্ষাকে বাধা দেয়। তেমনই সেই নীতির ওপরও আঘাত করেছে, যা নারীকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশাতে বাধা দেয়।

এসব সাংবাদিক ও লেখকদের সবচেয়ে বড়ো বিষয় ছিল 'নারীবাদ'। যা ছিল সমাজকে ক্রুসেডারদের চক্রান্তপানে ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাবশালী মাধ্যম।

নারীবাদ নিয়ে চাঞ্চল্যের পেছনে ক্রুসেডারদের চক্রান্তের ব্যাপারে যাদের সন্দেহ আছে, তারা যেন ১৯১৩ সালে লখনৌতে অনুষ্ঠিত মিশনারি কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত পাঠ করে, তাহলে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য মিশনারি কনফারেন্সের মতো এখানেও তারা প্রকাশ্যে ইসলামকে ধ্বংস ও অস্তিত্ব মুছে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। যার ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত ছিল—

(মুসলিম নারীদের মানসিক ও সামাজিক উন্নতি)[২৯১]

এর পদ্ধতি ছিল, নারীদেরকে শিক্ষিত ও স্বাধীন করা।

ইউরোপে ইহুদিদের প্রথম যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল,[২৯২] খ্রিষ্টানরাও মুসলিম-বিশ্বে একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। তা হলো, তারা কোনো সমাজকে নষ্ট করার জন্য পুরুষকে নষ্ট করার মাধ্যমে যতই চেষ্টা করুক, সর্বশেষ সেই সমাজ নষ্ট হয় না বা তাদের কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ নষ্ট হয় না বা তাদের কাঙ্ক্ষিত গতিতে নষ্ট হয় না। কেননা, যতদিন সেই সমাজে ধার্মিক মা থাকবে—চাই তিনি পড়ালেখায় অজ্ঞ হোক—তিনি সন্তানের মাঝে শিশুকালেই আকিদার বীজ বপন করে দেবেন; ফলে তারা যুবক অবস্থায় যত নষ্টই হোক, বারবার শিশুকালে মায়ের শিক্ষার দিকেই ফিরে আসে। ফলে কাঙ্ক্ষিত বিচ্যুতি ঘটে না। তাই স্বয়ং মাকে নষ্ট করতে হবে; যাতে সমাজের

২৯১. ইসলামি-বিশ্বের ওপর হামলা, অনুবাদ- মুহিব্বুদ্দীন খাতিব, পৃষ্ঠা নং ১৪৭।

২৯২. বিস্তারিত জানতে চাইলে 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ের 'ইউরোপ ধ্বংসে ইহুদিদের ভূমিকা' অধ্যায়টি দেখুন।

tauhiderdak.com

অধঃপতন স্থায়ী হয়; এমনকি তাকে মা হওয়ার পূর্বে যুবতি অবস্থায় নষ্ট করে ফেলতে হবে; যাতে মা হওয়ার পর তার মাঝে এমন আকিদা না থাকে, যা সন্তানের মাঝে বপন করবে। এমন ধর্মীয় চরিত্র না থাকে, যার ওপর সন্তানকে গড়ে তুলবে।

এখন তারা মুসলিম মা ও মুসলিম যুবতিকে কীভাবে নষ্ট করবে?

তারা যদি বাড়িতেও বসে থাকে, তবে তাদের কাছে পৌঁছাবে কীভাবে? তারা যদি মূর্খ থাকে, তবে কীভাবে সেসব চিন্তা তাদের মাঝে প্রবেশ করাবে, যা দ্বারা তাদের বুদ্ধিকে নোংরা করবে এবং যা দ্বারা তার আকিদা ও চরিত্রকে নষ্ট করবে?

সুতরাং এ জন্য অবশ্যই তাকে স্বাধীন ও শিক্ষিত করতে হবে; যাতে শয়তানের চক্রান্ত তার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতেও তার শিক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু তা কোন ধরনের শিক্ষা?

আর নারীকে তাদের পন্থায় স্বাধীন করার অর্থ ছিল তাকে তার দ্বীন, চরিত্র ও নৈতিকতা থেকে মুক্ত করা। আর এটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

tauhiderdak.com

তিন. নারী-স্বাধীনতার ইস্যু

কাসিম আমিন। তুর্কি বংশোদ্ভূত মিশরি পরিবারের রক্ষণশীল পরিবেশে বেড়ে ওঠা যুবক। যে তার অস্বাভাবিক মেধার ফলে মাত্র বিশ বছরে কায়রো থেকে লিসান্স ডিগ্রি অর্জন করে। যেখানে অন্যদের প্রাথমিক সার্টিফিকেট পেতেই পঁচিশ বছর পেরিয়ে যেত।

তার এই প্রতিভা দেখে তাকে কুড়িয়ে নেয় সেসব ব্যক্তি, যারা এমন বিরল প্রতিভা ও যোগ্য ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে বের করে; যাতে তাদের নষ্ট করতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের মাধ্যমে এ উম্মাহকে নষ্ট করতে পারে। তারা তাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেয়।

ফ্রান্সে যাওয়ার পূর্বে এক প্রাচ্যবিদের লেখা একটি বই তার নজরে আসে। বইটিতে ইসলামের ওপর নারীকে অবজ্ঞা করা ও তাদের মানবিক সত্তাকে স্বীকৃতি না দেওয়ার অভিযোগ করা হয়। এটা দেখে তার রক্ত গরম হয়ে যায়, যেমনটা সে তার ডায়রিতে লিখেছে। সে তখন সেই প্রাচ্যবিদের ইসলামের ওপর তোলা অভিযোগের জবাবও দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু সে ফ্রান্স থেকে ফিরে আসে ভিন্ন এক চেহারা নিয়ে।

অল্প বয়সে ফ্রান্স সফর তার পুরো সত্তার ওপর চূড়ান্ত প্রভাব ফেলে; ফলে সে নতুন চিন্তা, মস্তিষ্ক ও চেহারা নিয়ে মিশরে ফিরে আসে। সে এসেই মিশনারিদের পরিকল্পিত ইসলাম ধ্বংসের পন্থায় 'নারী-শিক্ষা ও মুক্তি'র আহ্বান করতে থাকে।

সে তার ডায়রিতে লিখেছে, সেখানে সে এক ফরাসি যুবতির সাক্ষাৎ পায়। ওই মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তবে তা 'পবিত্র'। সে তাকে বিভিন্ন ফরাসি পরিবার, ক্লাব ও বৈঠকখানায় নিয়ে যেত, তখন এসব স্থানে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হতো।[২৯৩]

হয়তো ওই মেয়ের সাথে কাসিম আমিনের আকস্মিক সাক্ষাৎ হয়েছে অথবা পরিকল্পিতভাবেই মেয়েটাকে তার পথে নিযুক্ত করে রাখা হয়েছিল। বাস্তবে যা-ই হোক, সেই মেয়ে তার মন-মস্তিষ্ক নিয়ে খেলেছে এবং তার জীবনের পথ পরিবর্তন

২৯৩. মুজাকারাতু কাসিম আমিন।

tauhiderdak.com

করে দিয়েছে। তাকে তার কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব আদায়ে উপযুক্ত করে তুলেছে। যে দায়িত্বের সিদ্ধান্ত মিশনারি কনফারেন্সে ইসলামকে ধ্বংসের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল।

আমরা ধরে নিলাম, ওই মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিল 'পবিত্র'। তবে তা ইসলামি অর্থে নয়; বরং এই অর্থে যে, এই সম্পর্ক ব্যভিচারের স্তরে পৌঁছায়নি। কারণ, এমন অবস্থায় সে তার চিন্তা-চেতনা পরিবর্তনে অধিক সক্ষম হবে। কেননা, সম্পর্ক যদি ব্যভিচারের স্তরে চলে যেত, তাহলে মেয়েটি তার দৃষ্টিতে পতিতা নারী হয়ে যেত, যে সম্মানের যোগ্য নয় এবং তার অনুপ্রেরণার উৎস হওয়ার উপযুক্ত নয়।

এখানে হয়তো মেয়েটি দক্ষতার সাথে 'অভিনয়' চালিয়ে গেছে; যাতে তাদের মাঝে শুধু আত্মিক ও চিন্তাগত সম্পর্ক থাকে এবং তার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। অথবা রক্ষণশীল পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে সে সম্পর্ককে এ স্তরে আটকে রেখেছিল, যাকে সে পবিত্র বলছে। তবে এর শেষ ফলাফল ছিল তার পুরো সত্তার মাঝে চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটে যাওয়া।

আসুন, আমরা পুরো দৃশ্যপট কল্পনা করার চেষ্টা করি।

যুবকটি নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান, তবে সে এসেছে ইউরোপীয় এক রাষ্ট্রের দখলকৃত দেশ থেকে, যেখানের মানুষ ইউরোপের প্রতি মুগ্ধ। যাকে তারা এমন বিশাল শক্তি মনে করে, যার সামনে প্রাচ্য বিলীন হয়ে যায়। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি, সে পরাজিত মানসিকতা নিয়ে ইউরোপে এসেছে। যার মধ্যে সর্বদা ক্ষুদ্রতা, হীনতা ও তুচ্ছতার অনুভূতি বিরাজমান। যার সর্বোচ্চ কামনা হচ্ছে, এই কল্পনাতীত সৌন্দর্যের ভিনদেশে মানসিক ও চিন্তাগত প্রশান্তি লাভ করা।

তার এই উৎকণ্ঠিত জড়সড় অবস্থায় এক সুন্দরী যুবতি এসে তার হাত ধরেছে, তার একাকিত্ব দূর করেছে। ফলে তার জড়তা ও উৎকণ্ঠা কেটে গেছে। জনসম্মুখে সে প্রশান্তি ও স্থিরতা অনুভব করছে।

অতঃপর এই মেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেছে; ফলে স্থিরতার সাথে সুখ ও আনন্দ অনুভব করছে। এখন সে মানসিকভাবে অপরিচিতি অনুভব করছে না; যদিও বাইরের সমাজের ক্ষেত্রে অপরিচিতি ভাব রয়ে গেছে। কারণ, তাদের সাথে এখনো মিলিত হয়নি। এখানে এসে সেই মেয়ে তাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। তাকে বিভিন্ন ফরাসি পরিবার, ক্লাব ও আড্ডায় নিয়ে গেছে, যারা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ফলে মানসিক ও বাইরের সমাজের সাথে অপরিচিতি ভাব সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে।

tauhiderdak.com

এখন সে নতুন সমাজে দৃঢ়পদে চলতে পারছে।

তার মাঝে এ বিষয়গুলোর প্রভাব কেমন হবে? সেই মেয়ের সাথে সম্পর্ককে কীভাবে দেখবে? তার মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টিকারী এসব আচরণকে কোন দৃষ্টিতে দেখবে?

'পবিত্র' সম্পর্ক অর্থাৎ যা জিনা পর্যন্ত পৌঁছেনি, যা তার মাঝে বিশাল পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে সে জড়তা ও একাকিত্ব থেকে বের হতে পেরেছে। কর্মতৎপরতা ও উদ্যম অর্জিত হয়েছে। সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি অর্জিত হয়েছে।

তাহলে এ আচরণে সমস্যা কী? আমাদেরও এমন পবিত্র সম্পর্ক গড়তে বাধা কোথায়?

বিষয়টাকে আমরা যতই ভালো ধারণা করি, কিছু মৌলিক ভুল থেকে যায় :

প্রথম ভুল : তার দাবি অনুযায়ী এই সম্পর্ক প্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থে পবিত্র হলেও তারা নির্জনে মিলিত হয়েছে, যা ইসলামি দৃষ্টিকোণে হারাম; চাই তা জিনা পর্যন্ত পৌঁছাক বা না পৌঁছাক। কারণ, ইতিহাসে মানুষ যখনই এই মেলামেশাকে বৈধ বানিয়েছে, প্রথমবার বা প্রথম প্রজন্মে না হলে সর্বশেষ তা অশ্লীলতা পর্যন্ত নিয়ে গেছে। যা থেকে ইতিহাসের কোনো প্রজন্ম ব্যতিক্রম ছিল না।

দ্বিতীয় ভুল : ফরাসি সমাজে এমন সম্পর্কের বাস্তব প্রভাবকে উপেক্ষা করা। সে নিশ্চিতভাবেই জানত, সে সমাজে বহু অপবিত্র সম্পর্ক হচ্ছে, যা কোনো গোপন বিষয় ছিল না। যদি আমরা ধরে নিই, সেই মেয়ে কিংবা তার পক্ষ থেকে বাধার ফলে শুধু তাদের সম্পর্কটি জিনার স্তরে পৌঁছায়নি; তবুও এটা তার পক্ষ থেকে এসব সম্পর্ককে বৈধতা দেওয়া বা এর দিকে আহ্বানের পেছনে যৌক্তিক হতে পারে না। কেননা, সমাজে এর বাস্তব ফলাফল তার চোখের সামনে স্পষ্ট ছিল।

তৃতীয় ভুল : তার লিখিত প্রথম বই 'নারী-স্বাধীনতা', এতে সে দাবি করেছে, এই স্বাধীনতা থেকে শুধু কল্যাণই ঘটবে। এতে সেই নিকৃষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি হবে না, যা সে স্বচক্ষে ফরাসি সমাজে দেখে এসেছে; বরং এই স্বাধীনতার ফলে সমাজের ভিত্তি মজবুত হবে এবং সমাজ দৃঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ হবে।[২৯৪]

যা-ই হোক, কাসিম আমিন ফ্রান্স থেকে নারী-স্বাধীনতার স্লোগান, নারীর হিজাব ত্যাগ ও পর্দাহীনতার প্রচারক হিসেবে আসে। হুবহু যে আহ্বান নিয়ে পূর্বে রিফাআহ

.....

২৯৪. তার দ্বিতীয় বই 'আধুনিক নারী' এতে তার চিন্তাধারা আরও নিচে নেমে যায়।

tauhiderdak.com

তাহতাবি ফ্রান্স থেকে ফিরে এসেছিল। কিন্তু ততদিনে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পার হয়ে গেছে, যে সময়টাতে তাদের ধারাবাহিক চিন্তাগত যুদ্ধে মানুষের মন-মস্তিষ্ক অনেক পালটে গিয়েছিল। তাই সে পূর্বের মতো প্রত্যাখ্যাত হয়নি। তবুও তার জন্য বিষয়টা সহজ ছিল না। তার নারী-স্বাধীনতা বইটা নিয়ে এত বিরোধিতা হয়; যার ফলে সে ভয়ে বা হতাশায় বাড়িতে বসে যায়। এই বিষয়ে কোনো লেখালেখি না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু সাদ জাগলুল তাকে উৎসাহ দিয়ে বলে, 'এগিয়ে যাও, আমি রক্ষা করব।'

তখন আবার ফিরে এসে তার আসল চেহারা উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম বইয়ে তো ইসলামের কিছু ছোঁয়া ছিল। যেমন বলেছে, সে মুসলিম নারীকে ইসলাম-প্রদত্ত হক দিতে চায়, যার মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষার অধিকার। কিন্তু তার দ্বিতীয় বইয়ে ইসলাম বাদ দিয়ে মিশরি নারী হিসেবে উল্লেখ করে বলে, মিশরি নারীদের উচিত তার ফরাসি বোনের মতো একই পথ অনুসরণ করা; যাতে তাদের মতো মুক্ত ও উন্নত হতে পারে। পুরো সমাজ অগ্রসর হতে পারে। এভাবে সে মুসলিম নারীর বিশেষ রক্ষাকবচ ভেঙে ফেলে। এবং দুই বোনকে কোনো পার্থক্যবিহীন একত্রিত করতে চেষ্টা করে।

অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, সে পশ্চিমাদের মতো একই পথে চলার আহ্বান করে; এমনকি পশ্চিমা নারীরা যেসব ধাপ পাড়ি দিয়েছে, সব পাড়ি দিতে বলে। যার মধ্যে রয়েছে পর্দাহীনতা ও চারিত্রিক অধঃপতন। সে বলে, পশ্চিমা জাতি যেই পথে উন্নতি লাভ করেছে, সেই পথে চলতে আমরা কোনো বাধা দেখি না। কেননা, আমরা দেখছি, দিনদিন তাদের সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে।

সে তার জীবনের শেষ রাতে ফ্রান্স থেকে মিশরে আগত কিছু ছাত্রছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমি তোমাদের শিক্ষাসফরকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিশেষ করে মেয়েদেরকে, যারা প্রাচ্যের শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে কষ্ট করে এখানে এসেছে। আমি এমন দিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন মিশরি ছেলে-মেয়েরা একত্রে মিলেমিশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করবে, যা থেকে তারা বঞ্চিত। সেদিন এর মাধ্যমে মিশর এগিয়ে যাবে।'

একপর্যায়ে নারীকেন্দ্রিক একটা ইস্যু তৈরি হয়, এখন প্রয়োজন একটি আন্দোলন। নারীবাদীদের একটি দল এসে ইস্যুটা লুফে নেয়। তাদের সাথে কিছু নারী অধিকারের পক্ষের পুরুষও ছিল। এই নারীবাদীরা তাদের প্রথম যে অধিকারের দাবি জানায়, তা ছিল পর্দাহীনতার অধিকার। ফলে এই ইস্যুর মূল বিষয় হয়ে যায় হিজাব ও

tauhiderdak.com

পর্দাহীনতা।

কিন্তু এই ইস্যুটা কোত্থেকে এসেছে?

ইউরোপে যখন নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তখন নারীদের বাস্তবে একটা ইস্যু ছিল। তা হলো, পুরুষের সাথে একই কারখানায় সমপরিমাণ কাজ করা সত্ত্বেও তারা পুরুষের অর্ধেক বেতন পেত। তাই তারা সমান বেতনের দাবি জানায়।[২৯৫]

সেখানে যখন এই ইস্যুটা বড়ো হয়, তখন (স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা শয়তানের চক্রান্তে) এর পরিধি বাড়তে থাকে। প্রথমে ইস্যু ছিল পুরুষের সমান বেতন লাভ করা। পরবর্তী সময়ে যখনই নতুন কোনো অধিকারের দাবি উঠত, তখনই তারা আন্দোলনে নেমে আসত। সর্বশেষ ইস্যু দাঁড়ায়, সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সাথে পূর্ণ সমতা অর্জন করা। সব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, পুরুষের মতো যেমন খুশি অশ্লীলতা করার অধিকার। নারীবাদের মধ্যে অশ্লীলতার অধিকারের প্রথম নাম দেওয়া হয় 'নারীকে জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের অধিকার' প্রদান। অতঃপর নাম দেওয়া হয় 'নারীর প্রেম করার অধিকার'। সর্বশেষ 'নারীর যাকে ইচ্ছা শরীর দেওয়ার অধিকার' এবং 'নারীর সমকামিতার অধিকার'।

অন্যদিকে মুসলিম-বিশ্বে নারীদের বিশেষ কোনো সমস্যা ও ইস্যু ছিল না। এখানে মূল সমস্যা ছিল এই সমাজ সঠিক ইসলাম থেকে বিচ্যুত হওয়া। যাকে আমরা নাম দিয়েছি 'আকিদাগত বিচ্যুতি'। এখান থেকেই মুসলিমদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে অধঃপতন ঘটেছে। তাই নারীকে অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য করা, মানবিক মর্যাদা না দেওয়া হলো ইসলাম থেকে বিচ্যুতির অসংখ্য ক্ষেত্রের একটি মাত্র ক্ষেত্র। অন্যগুলোর মতোই এর সমাধান হলো, ইসলামের সঠিক অবস্থায় ফিরে আসা ও বিচ্যুতি থেকে উঠে আসা।

এটি হচ্ছে মূল সমস্যা। এখানে নারীবাদ বা পুরুষতন্ত্রের মতো কোনো ইস্যু নেই; বরং এটা পুরো উম্মাহর সমস্যা; পুরুষ-নারী, ছেলে-বুড়ো, আলিম-জাহিল সকল সদস্যের সমস্যা। এখন এটাকে নারী-ইস্যু হিসেবে আলাদা বিশেষায়িত করা ও গভীর বিশ্লেষণ না করা এই সমস্যাকে সমাধান করবে না; বরং তখন রোগের একটি লক্ষণ ধরে চিকিৎসা করা হবে, মূল রোগ থেকেই যাবে। ফলে কোনো চিকিৎসা কাজ করবে না।

.....

২৯৫. 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ের 'ইউরোপ ধ্বংসে ইহুদিদের ভূমিকা' অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ করেছি।

tauhiderdak.com

কেননা, এখানে মূল সমস্যাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং বিষয়টাকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে না।

ইউরোপে তো এই ইস্যুটা অন্তত বাহ্যিকভাবে শুরুর দিকে যৌক্তিক ছিল। কারণ, কোনো নারী যখন পরিস্থিতির কারণে চাকরি করতে বাধ্য হবে, অতঃপর যদি পুরুষের সমপরিমাণ কাজ করেও অর্ধেক বেতন পায়, তাহলে তো বেতনের সমতার দাবি একদিকে সত্যিকার সমস্যা, অন্যদিকে যৌক্তিক দাবি।

কিন্তু হিজাব ও পর্দাহীনতার ইস্যুতে যৌক্তিকতা কোথায়? কোনটা সঠিক?

এখানে কোনো পুরুষ এসে নারীদের ওপর হিজাব আবশ্যক করেনি যে, নারীরা তাদের জুলুম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আন্দোলন করবে। যেমনটা ইউরোপে নারী ও পুরুষের মাঝে ঘটেছিল; বরং হিজাব তো ফরজ করেছেন স্বয়ং তাদের রব আল্লাহ তাআলা।[২৯৬] সে যদি মুমিন হতে চায়, তবে তো রবের বিধানের সাথে কোনো বিতর্ক বা এতে বাছাইয়ের সুযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিলে কোনো ইমানদার পুরুষ বা নারীর পক্ষে ভিন্ন কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হয়, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়।'[২৯৭]

এ ছাড়া স্বয়ং হিজাব কোনো সমস্যা বা ইস্যু হতে পারে না।

পর্দা ফরজ হয়েছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এবং সেই যুগ থেকে ধারাবাহিক চোদ্দোশ বছর ধরে তা পালিত হচ্ছে। এখন কোনো মুমিন বলতে পারবে না যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নারীরা মাজলুম ছিল; এমনকি পরে যদি তাদের ওপর জুলুম হয়ে থাকে, যখন তারা সঠিক আকিদা ও আমল থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখন স্পষ্টতই হিজাব

---

২৯৬. পূর্বেও আমরা টীকায় এই বিষয়টা স্পষ্ট করেছি। অনেকে বলে হিজাব নাকি ইসলামপূর্ব থেকেই চলে আসা আরবের বেদুইন সংস্কৃতি ছিল। যেখানে আমরা আয়িশা ﷺ-এর বর্ণিত হাদিস বলেছি, 'যখন হিজাবের আয়াত নাজিল হয়েছে, সব নারী কাপড় নিয়ে নিজেকে ডেকে নিয়েছে।'

২৯৭. সুরা আল-আহজাব, আয়াত নং ৩৬।

tauhiderdak.com

জুলুমের উৎস বা কারণ বা মাধ্যম ছিল না। কেননা, তা ছিল শ্রেষ্ঠ যুগের চারিত্রিক ও আত্মিক পবিত্রতার নিদর্শন। মর্যাদার নিদর্শন, যার কোনো নজির ইতিহাসে নেই।

কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে হিজাব খুলে ফেলা, পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা। সর্বশেষ নারীরা উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসা। মিশনারি কনফারেন্স এটাই চায়, এ জন্যই খ্রিষ্টানরা চক্রান্ত করে। তাই সমস্যা সৃষ্টি করেছে হিজাব ও পর্দাহীনতার ইস্যু দিয়ে। যেখানে হিজাবকে সব মন্দ বিশেষণে ভূষিত করা হবে এবং উলঙ্গপনাকে সব ভালো গুণে গুণান্বিত করা হবে।

কিছু নারীবাদী এসে এ ইস্যুটা লুফে নেয়। তারা পোশাকের স্বাধীনতার অধিকার দাবি করতে শুরু করে এই বলে যে, সমাজ এটা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে অথবা কট্টর পশ্চাৎপদ পুরুষতন্ত্র তা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রী ছিল হুদা শারাবি। সে তার ঘরে একটি মিলনায়তন বা বৈঠকের ব্যবস্থা করে। যেখানে সে কোনো প্রকার মাহরামের উপস্থিতি ছাড়াই পুরুষদের সাথে বেপর্দা হয়ে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করত। হুদা শারাবি ছিল মুহাম্মাদ পাশার মেয়ে। সে শিক্ষালাভের জন্য ফ্রান্সে গমন করে। ফ্রান্সে গমনের সময় সে ছিল হিজাবে আবৃত নারী। কিন্তু সে দেশে ফিরে বেপর্দা ও সৌন্দর্য-প্রদর্শনকারী নারী হিসেবে। দেশে ফেরার সময় তার বাবা বন্ধুবান্ধবসহ তাকে অভ্যর্থনা জানাতে যায়। কিন্তু তার এই খোলামেলা অবস্থা দেখে মুহাম্মাদ পাশা লজ্জিত হয়। তার চেহারা লাল হয়ে যায়। মেয়েকে অভিবাদন জানানো ছাড়াই সে ফিরে যায়।

দেশে এসে হুদা শারাবির পাশে কিছু নারীবাদী পুরুষ জুটে যায়, যারা তার সাথে একটু আবেগি বৈঠক, বিশেষ ইঙ্গিতবোধক হাসি বা টাকার বিনিময়ে তাদের আন্দোলনের পক্ষে মিডিয়ায় আলোচনা করত।

১৯১৯ সালের দিকে তখন মিশরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। কায়রোর রাস্তা-ঘাট মিছিল ও স্লোগানে মুখরিত ছিল। অন্যদিকে ইংরেজরা মিছিলে গুলি চালিয়ে প্রতিদিন অগণিত মানুষ হত্যা করছিল। এই তীব্র আন্দোলনের মাঝেই নারীবাদীদের মিছিল বের হয়, যাদের নেতৃত্বে ছিল সাদ জাগলুলের স্ত্রী সাফিয়্যাহ হানম। নারীবাদীরা ইংরেজদের সামরিক ঘাঁটির সামনে একত্রিত হয়ে দখলদারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। অতঃপর পূর্ব-পরিকল্পনামতে কোনো ভূমিকা ছাড়াই হিজাব মাটিতে ছুড়ে মারে এবং তাতে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আর এভাবেই নারীরা স্বাধীন হয়ে যায়!

tauhiderdak.com

মানুষরা তাদের এই উদ্ভট আচরণে অবাক হয়ে যায়। ইংরেজ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তাদের এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার দাবির সাথে হিজাব খুলে ফেলা এবং এতে আগুন ধরানোর কী সম্পর্ক?

মুসলিম নারীদের ওপর হিজাব কি ইংরেজরা জুলুম ও বাধ্য করে চাপিয়ে দিয়েছে; যার ফলে নারীবাদীরা এসে ইংরেজ খেদানোর আন্দোলনের পাশাপাশি ইংরেজদের জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হিজাবকে ছুড়ে ফেলছে?

ইংরেজরা কি গত তেরোশ বছর যাবৎ নারীদের ওপর হিজাব পরিয়ে রেখেছিল? না তারা প্রাচীনকাল থেকে তাদের পোশাকের স্বাধীনতা হরণ করে রেখেছিল? ফলে নারী আজ তাদের জুলুম থেকে মুক্ত হয়েছে এবং তাদের মুখের সামনে হিজাব নিক্ষেপ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে!

এই নাটকের কারণ কী? আসলে এর পেছনে কোনো যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট হয় যে, যেগুলোর পেছনে কোনো যৌক্তিকতা নেই, সেগুলোই ইসলামের সাথে যুদ্ধের আদর্শ মাধ্যম।

যারা ইসলামকে ধ্বংস ও ভাঙার কাজ করবে, তাদেরকে অবশ্যই সমাজের দৃষ্টিতে 'বীর' হতে হবে; যাতে বীরের মুখোশের ছায়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে সব চক্রান্ত ঢাকা পড়ে যায়।

কামাল আতাতুর্ক, জামাল আব্দুন নাসের, আহমদ বিন বাইলা—এমন অসংখ্য বীর ছিল, যারা কোনো না কোনো মাধ্যমে ইসলামের সাথে যুদ্ধ করেছে। তাদের প্রত্যেককেই ইসলামের সাথে যুদ্ধ করার সময় সমাজের দৃষ্টিতে নায়ক ও বীর হতে হবে, অন্যথায় তাদের আসল খেলা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং ইসলামের শত্রু খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের গোলামি মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে।

কামাল আতাতুর্ক যখন খিলাফত ধ্বংস করেছে, তখন সে তুর্কিদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছে। এ জন্য আরবি ভাষা নিষিদ্ধ করেছে এবং তুর্কি ভাষাকে ল্যাটিন অক্ষরে লেখা চালু করেছে। হিজাব খুলে ফেলার আদেশ করেছে এবং অসংখ্য মুসলিম আলিমকে জবাই করেছে। কিন্তু সে ছিল তখনকার দখলদার বিরোধী বীর, শত্রুর সাথে পরিকল্পিতভাবে সাজানো এ বীরত্বের মিথ্যা অভিনয় তার মুসলিমদের রক্তে রঞ্জিত হাতকে গোপন রেখেছে, ইসলামের বিরুদ্ধে তার ভয়ংকর অপরাধকে ঢেকে রেখেছে।

tauhiderdak.com

জামাল আব্দুন নাসের মিশরে ইসলামি দাওয়াতের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করেছে এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য মিশরের কারাগারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের হিংস্র রিমান্ডের ব্যবস্থা করেছে। ইতিহাসে যার একমাত্র নজির ছিল আন্দালুসিয়া থেকে ইসলামকে বিলুপ্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান আদালত। সে আজহারের শরয়ি আদালত বন্ধ করে দেয়। নারী-স্বাধীনতার নতুন ফিতনা আমদানি করে। কিন্তু সে ছিল সমাজের দৃষ্টিতে বীর। তার এই নকল বীরত্ব ইসলামের বিরুদ্ধে তার ভয়াবহ সব অপরাধকে ঢেকে রেখেছে।

আহমদ বিন বাইলা এসেছিল ইসলামের সম্পদকে চুরি করে কমিউনিস্টদের সম্পদে পরিণত করার জন্য। সে এক উদ্ভট যুক্তিতে নারীদের হিজাব খুলে ফেলার আহ্বান করে। সে বলে, 'ফ্রান্স সরকার অতীতে নারীদেরকে হিজাব পরিধানে বাধ্য করেছিল। তাই আমি এই দেশের স্বার্থেই আল-জাজায়িরের নারীদেরকে হিজাব খুলে ফেলার আহ্বান করছি।' সে যখন এই ডাক দেয়, তখন মানুষের দৃষ্টিতে সে ছিল বীর। তাকে পরিকল্পিতভাবে ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়াগামী বিমান থেকে কিডন্যাপ করা হয়। অতঃপর যখন মানুষের দৃষ্টিতে সে নায়কে পরিণত হয়, তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যাতে সে এসে ইসলামের বিরুদ্ধে তার ভূমিকা পালন করতে পারে।

এসব ঘটনা সামনে রাখলে ১৯১৯ সালে কায়রোর ইসমাইলি ময়দানে নারীবাদীদের আন্দোলনের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক প্রতিটি কাজের ওপর বীরত্বের ট্যাগ লাগিয়ে দিতে হবে; যাতে এর পেছনে তাদের চক্রান্ত গোপন থাকে।

আর সেদিন নারীবাদীদের জন্য এ থেকে বড়ো বীরত্ব আর কী ছিল যে, তারা দখলদার শক্তির সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেবে এবং তাদের গুলির সামনে নিজেদের বুক পেতে দেবে?

তারা ধীরে ধীরে ইংরেজদের সামরিক ঘাঁটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের এই পরিকল্পিত বীরত্বের আড়ালে হিজাব ছুড়ে ফেলে।

প্রথমে রাজধানীতে এটা স্বাভাবিক দৃশ্যে পরিণত হয়, অতঃপর অন্যান্য শহরেও তা ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যেত হিজাব পরিহিত মা-মেয়ে হিজাব খুলে ফেলছে। এ বিশাল পরিবর্তন কার্যক্রমের মূল মাধ্যম ছিল, একদিকে নারী-শিক্ষা, অন্যদিকে মিডিয়া।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। প্রাথমিক সিলেবাসে, অতঃপর মাধ্যমিক এবং সর্বশেষ ভার্সিটিতে।

tauhiderdak.com

মোটকথা কলেজের মেয়েদের থেকে ক্রমান্বয়ে হিজাব হারিয়ে যায়।

এভাবে ইসলামকে ধ্বংসের জন্যই কি মিশনারি কনফারেন্স এই সিদ্ধান্ত নেয়নি যে, মুসলিম মেয়েদেরকে অবশ্যই শিক্ষিত ও স্বাধীন করতে হবে?!

প্রাথমিক অবস্থায় কলেজের মেয়েরা বেহায়া ও পর্দাহীন হয়ে চলাচল করত না; বরং স্বয়ং কলেজেই তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। এর কারণ স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট। কারণ, সে সময় সমাজ তা কোনোভাবে মেনে নিত না এবং শুরু থেকেই তাদের পূর্ণ চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যেত। ফলে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না; বরং একেবারে অঙ্কুরেই তা ধ্বংস হয়ে যেত।

যদি কলেজের মেয়েরা মুসলিম-সমাজের প্রথা থেকে প্রথমেই বের হয়ে যেত, তাহলে কোনো অভিভাবক কি তার মেয়েকে কলেজে শিক্ষার জন্য পাঠাতে রাজি হতো? কখনোই না। তাই আবশ্যক ছিল, প্রথমে অভিভাবকদেরকে পূর্ণ আশ্বস্ত করা; যাতে তাদের মেয়েদের কলেজে পাঠায়। পরবর্তী সময়ে তাদেরকে 'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী' পন্থায় পরিবর্তন করা হবে; যাতে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

শুরুর দিকে মেয়েরা তিন-কোনাবিশিষ্ট কাপড় দিয়ে মাথা-চুল ঢেকে রাখত। যা থুতনির নিচে বেঁধে রাখা হতো, তবে চেহারা খোলা থাকত। আরে ভাই, এইটুকুতে কী সমস্যা, এরা তো ছোটো মেয়ে!!

তবে এতটুকু বিষয়ও প্রথমে খুব সহজে হয়ে যায়নি। কিন্তু সর্বশেষ তা ঘটে যায়, যেভাবে তাদের পরবর্তী সবগুলো ধাপ ঘটে গেছে। সর্বশেষ তারা বুক-পিঠ, পা ও বাহু উন্মুক্ত করেছে। সমুদ্রতীরে উলঙ্গ হয়ে আর রাস্তায় নির্লজ্জের মতো চলাচল শুরু করেছে। কিন্তু কীভাবে তা ঘটেছে?

হ্যাঁ, এটা সত্য যে, পশ্চিমারা মুসলিম-সমাজগুলো ধ্বংসের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। এ জন্য মিডিয়া, সিনেমা-নাটক, পত্রিকাসহ সব মাধ্যম ব্যবহার করেছে। তাদের কাছে এসব মাধ্যম ছিল অনেক এবং এই মাধ্যমগুলোও ছিল বেশ কার্যকরী; কিন্তু এগুলো কি উম্মাহর এই বিচ্যুতির পেছনে ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট?

বিষয়টা আরেকটু স্পষ্ট করছি, ইসলাম ধ্বংসের জন্য এসব মাধ্যম তো আজকের দিনেও ব্যবহার হচ্ছে এবং পূর্বের তুলনায় আরও চূড়ান্ত পদ্ধতিতে কাজে লাগানো হচ্ছে। ফলে সমাজে আজ ইসলামবিমুখতার এক ভয়াবহ স্রোত তৈরি হয়েছে। এসব

tauhiderdak.com

সত্ত্বেও এখনো সমাজে পর্দানশিন নারী দেখা যায়। যারা শিক্ষিত হয়েও পর্দা ত্যাগ করেনি; যদিও এর জন্য জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়!

এই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য কী?

অন্যভাবে প্রশ্ন করছি, পর্দা বিলুপ্ত হয়েছে প্রথাগত নাকি আকিদাগতভাবে?

মুসলিম-সমাজ থেকে যেসব চরিত্রের পতন ঘটেছে, এগুলো কি সত্যিকার ইমানি চেতনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, না শুধু প্রথা হিসেবে ছিল? যেদিন কলেজের মেয়েরা চেহারা উন্মুক্ত করেছে, তখন যারা এর বিরোধিতা করেছে, তারা কি এটা ইমানি আকিদা-বিশ্বাসের কারণে করেছে, না সামাজিক প্রথা রক্ষার জন্য করেছে?

যেদিন মেয়েরা চাকরির জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে, সেদিন যেসব পুরুষ বিরোধিতা করেছে, এই বিরোধিতা কি সত্যিকার আকিদা ও দ্বীনি চেতনা থেকে হয়েছিল, না আকিদার সাথে সম্পর্কহীন শুধুই পুরুষদের দাম্ভিকতা এবং মুসলিম-সমাজের সামাজিক প্রথা রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিল?

কেউ যখন আকিদার ভিত্তিতে পর্দা করবে, তখন সে তা কখনো ফেলে দিতে পারবে না; তাকে বাধা দেওয়ার জন্য যতই চেষ্টা করা হোক। যখন সত্যিকারের ইমানি চেতনা থেকে আখলাক ধারণ করবে, তখন তা নষ্ট করা সহজ হবে না; এমনকি কোনো কারণে নষ্ট হলেও তা হবে তার পক্ষ থেকে কঠিন প্রতিরোধের পর।

কিন্তু ইমানি চেতনাহীন প্রথা, অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিকতা সহজে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যখন এর ওপর একটু শক্ত করে চাপ দেওয়া হবে। আর সর্বযুগেই তো ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে চাপ খুব ভালো পরিমাণেই ছিল।

কলেজ-বিদ্যালয়ের মেয়েরা চেহারা খোলা রেখে রাস্তাঘাটে চলাফেরা শুরু করে। তবে শুরুতে দীর্ঘ জামা পরিধান করে থাকত, যা তাদের হাত-পা-সহ পুরা শরীর ঢেকে রাখত এবং বাহ্যিক আদব-শিষ্টাচার বজায় থাকত।

কিন্তু এটা ছাড়া কি ভিন্ন পথ ছিল? কারণ, তখনও কোনো মেয়ে যদি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে শুধু ডানে-বামে তাকাত, তাহলেই সে মানুষের দৃষ্টিতে খারাপ হয়ে যেত। সমাজে এতটাই পরিপূর্ণ আদব ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল।

tauhiderdak.com

প্রথম দিকে মাধ্যমিক মহিলা কলেজের পরিচালকরা ছিল সব ইংরেজ নারী। তখন তাদের রক্ষণশীলতা অনেক কঠোর ছিল। আর শুরুর দিকে প্রত্যেকটা বিষয় এমনই হতে হয়; যাতে মুসলিম-সমাজে তাদের পা মাটিতে স্থির ও শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পরবর্তী সময়ে তাদের মূল কার্যক্রম শুরু করতে পারবে। অন্যথায় যদি প্রথম থেকে তাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে কোনো মেয়ে তাদের কলেজে ভর্তি হবে না এবং তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

সেখানে শিক্ষকরা ছিল সব নারী। শুধু আরবি শিক্ষার জন্য পুরুষ শিক্ষক রাখা হতো। তবে তারাও হতো বয়স্ক এবং উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতায় প্রসিদ্ধ ছিল। পুরো কলেজে সে ছাড়া আর একমাত্র পুরুষ ছিল অফিসের দায়িত্বশীল, যে মাদরাসার মূল ভবন থেকে দূরে তার অফিসে প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যস্ত থাকত। এ ছাড়া ছিল গেইটের দারোয়ান, যাকে প্রয়োজন হলে মেয়েরা চাচা বলে ডাকত।

মেয়েরা কাপড়ে ঢাকা গাড়িতে করে কলেজে আসত এবং একই গাড়ি দ্বারা বাড়িতে ফিরে যেত। আর যে সমস্ত অভিভাবক কলেজের গাড়ির ভাড়া বহন করতে সক্ষম ছিল না, তারা সকালে নিজেরা এসে দিয়ে যেত এবং বিকালে সাথে করে নিয়ে যেত; যাতে মেয়েরা একাকী রাস্তায় চলাচল না করে।

অভিভাবকরা এ থেকে বেশি আর কী প্রত্যাশা করে?!

বরং কলেজের প্রধান শিক্ষিকা ছিল অভিভাবকদের থেকেও বেশি রক্ষণশীল। ইংরেজ নারী তো কী হয়েছে, শিক্ষার জন্য ছিল কঠোর। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা বলো; কিন্তু শিক্ষা ও আদবের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই!

মেয়েদের সিলেবাস ছিল ছেলেদের মতোই; কিন্তু তা কিছু মুখোশাবৃত ছিল। কেননা, তাদেরকে মূল সিলেবাসের পাশাপাশি নারীবান্ধব কিছু বিষয়ে পড়ানো হতো। যেমন ঘর সামলানো ও বাচ্চা দেখাশোনার পদ্ধতি। যাতে তাদেরকে এই বুঝ দেওয়া যায় যে, এসব কলেজে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরবর্তী পারিবারিক জীবনের জন্য মেয়েদের প্রস্তুত করে তোলা; যদিও তখনকার সমাজে এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছিল যে, প্রাথমিক শিক্ষার পর মেয়েদেরকে মাধ্যমিকে পড়ানোর ফলে তাদের বিয়ে উপযুক্ত বয়স পার হয়ে যাবে এবং তারা সেই ঘরোয়া পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাবে, যেখানে মূলত তাদেরকে সারা জীবন কাটাতে হবে।

tauhiderdak.com

মেয়েদের বিয়ে দেরি হওয়ার বিষয়টা সমাধানের জন্য নারীবাদীরা রাষ্ট্রের কাছে ষোলো বছরের পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধের দাবি জানায়। পরে এ ধরনের আইন তৈরি হয় এবং এর পক্ষে অনেক যুক্তিও দেখানো হয়। ফলে পরবর্তী সময়ে বিয়ে দেরি হওয়া মানুষের কাছে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। শুধু ষোলোতে নয়; বরং সেটা তিরিশেও চলে যায়।

আর মেয়েদের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে দূরে রাখার জবাবে নারীবাদীরা বলে, এই শিক্ষা মূলত তাদেরকে ঘরের কাজ ও বাচ্চা প্রতিপালনে উপযুক্ত করার জন্যই। এ জন্য ছেলেদের পাঁচ বছর মেয়াদি সিলেবাসের ওপর তাদের জন্য আরও এক বছর বৃদ্ধি করে ছয় বছর বানানো হয়েছে।

অতঃপর একসময় যখন বিরোধীদের কঠিন আন্দোলনের তেজ ঠান্ডা হয়ে আসে, তখন মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্র শিথিল হতে থাকে, একসময় মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষাগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। ছেলেদের কারিকুলামই মেয়েদের কারিকুলামে পরিণত হয়। ষষ্ঠ বছর বিলুপ্ত করা হয়। ফলে মেয়েরা ছেলেদের মতোই পাঁচ বছরে পাস করে বের হয়ে আসত। যাতে মেয়েদের সামনে নতুন এক ইস্যু তৈরি হয়। তা হলো, মেয়েদের ভার্সিটিতে ভর্তির ইস্যু।

ধীরে ধীরে এসব কলেজের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সে সাথে তাদের শৃঙ্খলাব্যবস্থাও শিথিল হতে থাকে। মেয়েদের মাঝে চারিত্রিক অধঃপতন হতে থাকে।

সময়ের সাথে সাথে এসব গার্লস স্কুলের চাহিদা বাড়তে থাকে। ফলে একই কারিকুলামে আঞ্চলিক বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। তখন আর অভিভাবকরা মেয়েদের সাথে করে আনা-নেওয়ার প্রয়োজন মনে করত না। যার ফলে তারা একাকী রাস্তায় চলাচল শুরু করে।

কিন্তু এসব বিষয় কি আর এই নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে?!

প্রতিটি সমাজেই কিছু দুঃসাহসী যুবক ও যুবতি থাকে। যারা সমাজের প্রথার বাইরে বের হয়ে আসে এবং প্রতিনিয়ত তা ভঙ্গ করে। রক্ষণশীল সমাজে এমন উগ্রদের পরিণতি হয় তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ। যা এদের ছড়িয়ে পড়াকে বাধা দেয়। যাতে রোগ ছড়ানোর পূর্বেই জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সমাজে কাঙ্ক্ষিত প্রতিরোধ হয় না বা চূড়ান্ত প্রভাবশালী কিছু ঘটে না। ফলে জীবাণু অবশিষ্ট থেকে যায় এবং একসময় এটা থেকে মহামারি ঘটে।

tauhiderdak.com

তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বের হওয়া সর্বোত্তম জাতির প্রশংসা করছেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।'[২৯৮]

আর মানুষের জন্য সর্বনিকৃষ্ট জাতিকে অভিশাপ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ - كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

'বনি ইসরাইলের কাফিররা তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে দাউদ ও মারইয়ামপুত্র ইসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তারা যে নিকৃষ্ট কাজ করত, তা থেকে একে অপরকে বারণ করত না। তারা যা করত, তা অবশ্যই খারাপ।'[২৯৯]

কিন্তু যদি কোনো মুসলিম-সমাজে আদর্শ ও উত্তম চরিত্র ইমানি চেতনাশূন্য শুধু কিছু সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়, তাহলে সেখানে প্রতিবাদ ও আন্দোলন হতে পারে, তবে চূড়ান্ত প্রতিরোধ হয় না, যা জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে ধ্বংস করে দেবে। ফলে জীবাণু থেকে যায় এবং ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যা নিশ্চিত কার্যকরী।

হিজরি চোদ্দো শতকে খ্রিষ্টীয় বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের সামনে মুসলিম-সমাজে এটাই ঘটে। সমাজে তখনও কিছু দ্বীন ও আদর্শ অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু সেসব ছিল প্রাণহীন কিছু প্রথা। ফলে এগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক হামলায় টিকতে পারেনি। যখন তারা মানুষের সামনে এসব গোমরাহি ও ভ্রষ্টতাকেই আধুনিকতা, সভ্যতা এবং পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্তি হিসেবে পেশ করছে।

---

২৯৮. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১১০।

২৯৯. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৭৮-৭৯।

tauhiderdak.com

মুসলিম-সমাজে প্রথমে এক দুঃসাহসী ছেলে প্রকাশ্যে এক দুঃসাহসী মেয়েকে প্রেম নিবেদন করে, সে মেয়েও তা গ্রহণ করে নেয়। সমাজের চোখে সেই মেয়ে চরিত্রহীন হিসেবে গণ্য হয় ঠিক; কিন্তু সেই ছেলে কিংবা মেয়েকে প্রতিরোধ করা হয়নি; ফলে এখানে-সেখানে এমন ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। মানুষ এ দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কলেজের মেয়ের জন্য এটাই স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে যায় যে, তারা প্রেম-অশ্লীলতা করবে। কেউ সেখানে সৎ কাজের আদেশ বা মন্দ কাজের নিষেধের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেনি; ফলে শয়তানও খুশি হয়েছে।

ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের মেয়েদের ড্রেস পরিবর্তন হতে থাকে।

'ড্রেস' অল্প ছোটো করা হয়। এতে সমস্যা কী? ড্রেস ছোটো হওয়ার ফলে পায়ের দিকে যে অংশটুকু বের হয়ে এসেছে, তা তো মোজা দ্বারা ঢেকে যাচ্ছে!

আস্তিন কিছুটা খাটো করা হয়। এতে কী সমস্যা?! কয়েক সেন্টিমিটারের জন্য তো কিছু আসবে-যাবে না। তেমন কী আর হবে? আরে কট্টরপন্থী, জামার হাতা বা আঁচল কিছু ছোটো হলে কি দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে?

এভাবেই এই দৃশ্য দেখে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে হাতা আরেকটু বা আঁচল বা মোজা আরও কিছু সেন্টিমিটার ছোটো হয়। যার ফলে নারীর সেসব অঙ্গ বের হয়ে আসে, যা আল্লাহ তাআলা ঢেকে রাখার আদেশ দিয়েছেন।

ওহ! কট্টরপন্থীদের জন্য টেকা যাচ্ছে না! তোমরা শুধু আখলাক-চরিত্রের কথা বলছ আর সমাজ ধ্বংসের ভয় দেখাচ্ছ! পোশাক কয়েক সেন্টিমিটার ছোটো হলে চরিত্র কি নষ্ট হয়ে যাবে? আরে মূর্খ, চরিত্র কি সেন্টিমিটার দিয়ে মাপা হয়? চরিত্র ও আদর্শ তো থাকে অন্তরে। মনে পর্দা ও শালীনতা থাকলে বাহ্যিক কাজে তা নষ্ট হয় না; এমনকি রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে হাঁটলেও কিছু হবে না!

রাস্তা-ঘাটে এমন স্বল্পবসনা নারী বৃদ্ধি পেতে থাকে, যারা পড়াশুনা শেষ করে চাকরি করত এবং নিজেদের খরচ চালাতে পারত। তখন ফ্যাশন ও কসমেটিক্সের বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। পত্রিকায় আলাদা এক পাতায় শুধু এসব উপস্থাপন করা হতো।

প্রথম দিকে বিজ্ঞাপনে বলা হতো, কীভাবে স্বামীর ভালোবাসা লাভ করবে!

tauhiderdak.com

ইসলাম স্বামীর জন্য সাজুগুজু করতে নিষেধ করেছে নাকি?! আর আমরা তো শুধু ছবি-সংবলিত উপদেশ পেশ করছি, ছবির যুগে এটা স্বাভাবিক বা আবশ্যক।

মানুষের কাছে এটুকু গ্রহণযোগ্য হওয়ার পর দৃশ্য পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে যায়। সেই ধাপ হলো নারীকে দ্বীন, আখলাক ও ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে বের করার ভূমিকা। স্বামী ছিল প্রথম পদক্ষেপের বৈধতা দানকারী। এখন তার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। তাই এখন তারা আরও স্পষ্ট করে বিজ্ঞাপনে বলা শুরু করে—

কীভাবে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে?!

হ্যাঁ, এতে সমস্যা কী? শুধু কি বিবাহিত মেয়েরাই সাজবে? বিবাহের জন্য স্বামীপ্রত্যাশী মেয়েরা কি সাজবে না? তারা কি তাদের জালে কোনো 'বাপের বেটা'-কে আটকানোর জন্য সাজবে না?!

যদি অল্পতে জালে ধরা না পড়ে, তাহলে আরও সাজবে। একজন জামার বুক কিছুটা খোলা রাখবে, অন্যজন পিঠ বা পা খোলা রাখবে।

পশ্চিমা ফ্যাশন সংস্কৃতির উন্নতি হতে হতে এখন শরীরের প্রায় পুরো অংশই খুলে ফেলেছে। আর মুসলিম-বিশ্ব তাদের সম্পূর্ণ অনুকরণ করছে।

অতঃপর এল ভার্সিটির যুগ।

ওহে কট্টরপন্থীরা, তোমরা তো নারীদের প্রাথমিক শিক্ষারই বিরোধিতা করে বলেছ, তাদের মাঝে শিক্ষার কোনো সক্ষমতা নেই, তারা শুধু বাড়ির জন্য উপযুক্ত। অথচ আজ শিক্ষিত মেয়েরা তোমাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। হুবহু ছেলেদের সিলেবাস[৩০০] পড়ে শুধু তাদের ধরে ফেলেনি; বরং অনেক সময় তাদের ডিঙিয়ে গেছে।[৩০১]

তাই ভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া এখন তার অধিকার, তোমরা কেন বাধা দিচ্ছ?!

এই ইস্যুর পক্ষ-বিপক্ষের মাঝে দীর্ঘ সংঘাত চলে, যা ইউরোপে হয়েছিল।[৩০২]

.....

৩০০. একই সিলেবাসে পাঠদানের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে উভয় লিঙ্গের মাঝে সমতার দাবি সৃষ্টি হয়, সর্বশেষ যা ব্যভিচারের অধিকারে সমতার দাবি পর্যন্ত পৌঁছাবে। আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্বকে বাতিল করা বা অন্তত শিক্ষায় সমতার পর এর ভিত্তি নাড়িয়ে দেওয়া।

৩০১. কারণ, ছেলেরা খেলাধুলা ও আড্ডাবাজিতে ব্যস্ত থাকত, আর মেয়েরা বাড়িতে একনিষ্ঠভাবে পড়াশুনা করত।

৩০২. এই বিষয়ে আমি 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ে আলোচনা করেছি।

tauhiderdak.com

নারীবাদের পক্ষের ব্যক্তিরা বলত, পুরো বিশ্বের নারীদের সমস্যা একই এবং তারা একই পথে এগিয়ে যাবে; ফলে শেষ ফলাফল একই হবে। যেই ফলাফলে ইউরোপ পৌঁছে গেছে এবং তারা পুরো বিশ্ব থেকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে গেছে।

বাহ্যিকভাবে পক্ষের ব্যক্তিরা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের বাস্তব অবস্থার কথা বলছিল। তবে তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গাফিল ছিল। তারা বোঝেনি যে, বিশেষ কিছু অবস্থার ফলে পুরো বিশ্বের সর্বত্র একই রূপ ধারণ করে না। কিন্তু যেহেতু আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই ইস্যুটা নিজেদের বিশেষ স্বার্থে পরিচালনা করছে, তাই তারা ইচ্ছাকৃত এই রূপে উপস্থাপন করেছে।[৩০৩]

তারা বোঝেনি যে, মুসলিম নারীদের সমস্যা এবং তার ইউরোপীয় 'বোন'-এর সমস্যা এক নয়। কেননা, মুসলিম নারীর সাথে মুশরিক নারীর কোনো সম্পর্ক বা ভ্রাতৃত্ব নেই। তা ছাড়া ইউরোপে এটা সমস্যা হিসেবে গণ্য হয়েছে; কারণ, সেই সমাজের জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনবিধান নেই। সেখানে মানুষ নিজেরা নিজের জন্য আইন বানায়। ফলে তারা নিজের ওপর জুলুম করে এবং অন্যকেও জুলুম করে। তখন শয়তান তাদেরকে এমন পথে পরিচালিত করে, যা সর্বশেষ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। পরিবারব্যবস্থা ভেঙে যায়, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, নারী-পুরুষ উভয়ে কষ্টের সাগরে ভেসে যায়, সন্তানরা বিপথগামী হয়, অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়, সবার মাঝে একাকিত্ব এবং মানসিক ও স্নায়ুবিক রোগ ছড়িয়ে যায়। ডিপ্রেশন, উন্মাদনা, আত্মহত্যা, হতাশা, মদ-নেশা ও অপরাধের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

অন্যদিকে মুসলিম নারীর সমস্যা হলো, তাদের ওপর জুলুম হয়েছে আল্লাহর দ্বীনের বিধান অমান্য করার ফলে। যে বিধানকে সমাজ বিশ্বাসগতভাবে গ্রহণ করে নিলেও এ মতে আমল করেনি। যার ফলে তারা ভ্রষ্ট জাহিলি প্রথার দিকে ফিরে গেছে।

যদিও জুলুমের ধরন এক বা সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু রোগের কারণ ভিন্ন হওয়ায় এর ওষুধও ভিন্ন হবে। মুসলিম নারীদের জন্য তাদের সমস্যার সমাধান হলো, আল্লাহর সঠিক দ্বীনের দিকে ফিরে আসা এবং দ্বীনের আকিদা ও আমলকে আঁকড়ে ধরা। তাদের সমাধান এটা নয় যে, তারা পশ্চিমাদের পথে চলবে। যারা ধ্বংসের পর ধ্বংস হয়েছে এবং অধঃপতনের এই ধারাবাহিকতা এখনো চলমান রয়েছে।

.....

৩০৩. বিস্তারিত জানতে চাইলে 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ের 'ইউরোপ ধ্বংসে ইহুদিদের ভূমিকা' অধ্যায়টি দেখুন।

tauhiderdak.com

বাস্তবতা হলো, আল্লাহর দ্বীন মানবজাতির সব সমস্যার সমাধান। ইউরোপীয়রা যদি এই দ্বীনের প্রতি ইমান আনত, তাহলে তাদের সব সমস্যা সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু যাদের ওপর আসলে তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক ছিল অর্থাৎ মুসলিমরাই যখন এই দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তখন সংস্কারকদের দায়িত্ব হলো, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং বাস্তব জীবনে দ্বীন পালনের দাওয়াহ দেওয়া। তবেই তাদের সব সমস্যা সমাধান হয়ে তাদের অবস্থা ভালো হয়ে যেত। কিন্তু তা না করে যদি মুসলিম নারী ইউরোপের পথে চলে, তাহলে তাদের মতোই মুসলিম নারীদের সমস্যার সমাধান তো হবেই না; বরং ইউরোপের মতো তাদের সমাজও ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু নারীবাদের পক্ষের ব্যক্তিরা এসব বুঝত না। তাদের মধ্যে দুই দল ছিল, এক দল ভালো করেই জানত নারীবাদী আন্দোলনের এ পথের শেষ ফলাফল হলো সমাজের চারিত্রিক অধঃপতন এবং তা ভেঙে পড়া, যা ইউরোপে ঘটেছে। আর তারা এটাই চায় এবং এর জন্য কঠিনভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কারণ তারা হলো,

الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا

'যারা চায়, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক।'[৩০৪]

আরেকদল ধোঁকাগ্রস্ত ও গাফিল; কারণ, তারা পশ্চিমাদের গোলাম। তারা পশ্চিমাদের চোখে সবকিছু দেখে। তাদের অসচেতনতা ও গাফিলতির কারণে তারা ধারণা করে, তাদের মনিব বুঝি সর্বদাই সঠিক।

এ দুই দলই মুসলিম-সমাজে খ্রিষ্টানদের এবং আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। দুই পক্ষ নারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য মেয়েদের ভার্সিটিতে প্রবেশের দাবি তুলেছে; যাতে তারা তাদের বার্তা পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারে।

অন্যদিকে মুসলিম নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কোনো সমস্যা নয়। কেননা, ইসলাম তাকে কখনো শিক্ষা অর্জন থেকে বাধা দেয়নি। উলটো ইসলাম তাকে শুধু শিক্ষা অর্জনের দিকে আহ্বান করেনি; বরং তার ওপর তা ফরজ করে দিয়েছে। কিন্তু ইসলাম তার শিক্ষার্জন ও প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য দুটি শর্ত আবশ্যক করে দিয়েছে। তা হলো, অবশ্যই তাকে পূর্ণ দ্বীনদারি ও চরিত্র রক্ষা করতে হবে

.....

৩০৪. সুরা আন-নুর, আয়াত নং ১৯ (যারা চায় মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য দুনিয়ায় ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।)

tauhiderdak.com

এবং তাকে অবশ্যই তার মূল দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করতে হবে। যে দায়িত্বের জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টি করেছেন। তা হলো, পরিবার সামলানো ও প্রজন্ম গড়ে তোলা। এই দুই শর্তের ভেতরেই তার সকল কাজ পরিচালিত হবে। এটা তার জন্য বিশাল এক ক্ষেত্র, যেখানে মহান নারী সাহাবিগণ সর্বোচ্চ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কিন্তু পশ্চিমা ও তাদের শয়তানদের গোলামরা স্বাভাবিকভাবে এসব কিছু প্রত্যাশা করবে না; বরং তারা চায় মুসলিম মেয়েরা যেন ভার্সিটির শিক্ষার মাধ্যমে তাদের চক্রান্তের জালে ফেঁসে যায়।

আর শয়তানরা তো কখনোই সমাজের সংশোধন চাইবে না; বরং তারা এসেছেই ধ্বংস করার জন্য। আর তাদের গোলামদের সামনে শুধু একটি পথই খোলা আছে। এ ছাড়া তারা আর কিছুই দেখতে পায় না। কেননা, গোলাম তো শুধু তা-ই দেখে, যা তার মনিব তাকে দেখায়; বরং সে অন্তরে এটাও বিশ্বাস করে যে, মনিবের দেখানো পথ ছাড়া অন্যদিকে দৃষ্টি দেওয়ার চিন্তা করাও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

কিন্তু এমনটা কেন ঘটল?

উম্মাহর এই অধঃপতনের কারণ সেগুলো নয়, যা অনেকে ধারণা করে। যেমন বৈশ্বিক উন্নতি বা পশ্চিমা সভ্যতার চাপ এর একমাত্র কারণ ছিল না। তেমনই নারী অধিকারের দাবি এমন কোনো 'সত্য' নয়, যা পরাজিত ছিল, পরে বিজয়ী হয়েছে; যা নারীবাদের পক্ষের ব্যক্তিরা প্রচার করে থাকে। অথবা এ ইস্যুটা বৈশ্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিটি দেশে একই গতিতে এগিয়ে যাওয়াও এর কারণ ছিল না; এমনকি স্বয়ং পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনও উম্মাহর এই পরিণতির মূল কারণ নয়।

বরং সবকিছুর মূল কারণ হলো, মানসিক পরাজয়, যা সৃষ্টি হয়েছে তাদের শূন্যতা এবং আকিদাগত বিচ্যুতি ও পশ্চিমাদের প্রতি মুগ্ধতা থেকে। এ ধারণা থেকে, যেহেতু এই ইস্যুটা বিজয়ী পরাশক্তির পক্ষ থেকে আসছে; তাই অবশ্যই তা সঠিক।

হ্যাঁ, এটা মূল কারণ। মূলত মানসিক পরাজয় পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনকে সফল করেছে। এর ফলে তাদের সব চক্রান্ত এমনভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যেন তা নিশ্চিত বিষয়। যা থেকে বাঁচার কোনো পথ বা এর সামনে বাধা হতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই। অথচ বাস্তবতা হলো, এসব কিছু ঘটত না, যদি মুসলিমরা সঠিক ইসলামের ওপর অবিচল থাকত।

tauhiderdak.com

কারণ, অন্তরের গভীরে জীবন্ত আকিদা কখনো পরাজিত হয় না। এ আকিদার ধারকের ওপর যত চাপ ও বাধা আসুক, সে তা কখনো পরিত্যাগ করে না।[৩০৫] ইমানের কারণে শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস তাকে শত্রুর মাঝে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করে; এমনকি সামরিক যুদ্ধের শত্রুর সামনে পরাজিত হলেও।

আল্লাহ তাআলার ওপর সত্যিকার ইমানের ফলে যে মানসিক শক্তি তৈরি হয় এবং আল্লাহর বিধান সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ফলে যে বাস্তব জীবনের প্রাচুর্য তৈরি হয়; তা মুসলিমকে (ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র) এতটাই অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেয়; যার ফলে তারা অন্যদের থেকে কোনো আদর্শ ও মূল্যবোধ ভিক্ষা তো দূরে থাক, কিছু গ্রহণের কল্পনাও করে না। আর দুনিয়াবি বিষয়ে যদি কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তা মুমিনের শ্রেষ্ঠত্বের অবস্থান থেকে গ্রহণ করে এবং সেগুলো আল্লাহর দ্বীনের ছাঁচে পরিবর্তন করে নেয়। ফলে তা তাদের অনুগত হয়ে যায়, তারা সেগুলোর অনুগত নয়।

মুসলিমরা যদি সঠিক ইসলামের ওপর থাকত, তবে পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন মুসলিমদের অন্তরে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারত না, তেমনই তাদের মতবাদগুলো মুসলিমদের বুদ্ধি-চিন্তাধারা ও অনুভূতিতে প্রবেশ করতে পারত না। কিন্তু মুসলিমরা সঠিক ইসলামের ওপর না থাকায়, সেগুলো তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং স্রোতের পানির খড়কুটার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যে কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ চোদ্দোশ বছর পূর্বেই বলে গেছেন।

তেমনই মুসলিমরা যদি সঠিক ইসলামের ওপর থাকত, তবে পশ্চিমা সভ্যতার চাপে তারা তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত হতো না। কেননা, পশ্চিমারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বস্তুগত ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আদর্শিকভাবে বিকৃত ও পথভ্রষ্ট। মুসলিমদের উচিত ছিল, পশ্চিমাদের থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত বিষয়গুলো গ্রহণ করা। তবে ইসলাম ত্যাগ করা ও নিজেদের আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলা অথবা তাদের সাথে আদর্শ-বিশ্বাস গ্রহণ করা ব্যতীতই। যেভাবে মুসলিমরা প্রথম যুগে রোম ও পারস্য থেকে গ্রহণ করেছিল।

একইভাবে মুসলিমরা যদি সঠিক ইসলামের ওপর থাকত, তবে বিজ্ঞানের উন্নতিও মুসলিমদের দমাতে পারত না। কেননা, এটা আবশ্যক পরিণতি নয়, যা ইহুদিরা

.....

৩০৫. বর্তমানে সঠিক তাওহিদের ধারক জামাআতগুলোর ওপর নির্যাতন ও গণহত্যার পরেও তাদের অবস্থা থেকে এটা স্পষ্ট।

tauhiderdak.com

মানুষকে বুঝিয়েছে। যাতে তারা সমস্ত মানুষকে বিজ্ঞানের গোলামির দিকে নিতে সক্ষম হয়। যেভাবে ইউরোপ ইহুদিদের এ উন্নতির স্রোতে ভেসে গেছে; কেননা, তারা ছিল সঠিক আকিদাশূন্য এবং তাদের বিকৃত ধর্ম-বিশ্বাস ছিল জীবনের জন্য অনুপযুক্ত এবং ইহুদিদের চক্রান্তের সামনে অবিচল থাকতে অক্ষম।[৩০৬] কিন্তু মুসলিমদের কাছে এই স্রোতের সামনে টিকে থাকার শক্তি ছিল এবং তাদের সক্ষমতা ছিল এই কাল্পনিক উন্নতির সামনে পরাজিত না হওয়ার।

যে বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে মানবজাতি পুরো ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো অধঃপতনের শিকার হয়েছে, যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে তাদের আদর্শ-চরিত্র ও মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে গেছে; বরং মানুষের মানবতা হারিয়ে গেছে, এই বিজ্ঞানের সামনে মুসলিমরা টিকে থাকা এবং পরাজিত না হওয়ার সক্ষমতা ছিল। কেননা, তারাই সঠিক আকিদা-বিশ্বাস লালন করে এবং দুনিয়ার বুকে একমাত্র তারাই ইহুদিদের চক্রান্তের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাদের বিজয়ের ওয়াদা করেছেন, যদি তারা শর্তের ওপর অবিচল থাকে—

إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

> 'তোমাদের যদি ভালো কিছু হয়, তাহলে তাদের তা খারাপ লাগে। আর তোমাদের খারাপ কিছু হলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। (তবে) তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'[৩০৭]

একমাত্র মুসলিমরাই মানবজাতির সকল ভ্রান্ত চিন্তাধারা সংশোধন করতে সক্ষম। যেমন ডারউইনের বিবর্তনের মিথ্যাচার, বস্তুবাদের মিথ্যাচার, মানুষের আচরণের যৌনতা-মিশ্রিত ব্যাখ্যা, জীবনের স্বয়ংক্রিয়তার ব্যাখ্যা, সকল আদর্শ-মূল্যবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার চিন্তা, নারীকে তার নিরাপদ আশ্রয় ও মূল দায়িত্ব থেকে বের করে জীবিকা উপার্জনের পেছনে ছুটতে বাধ্য করার চিন্তাধারা; যাতে তারা নষ্ট ও ধ্বংস হয় এবং তাদের সাথে একসময় পুরো সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়।

.....

৩০৬. বিস্তারিত জানতে চাইলে 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ের 'ইউরোপ ধ্বংসে ইহুদিদের ভূমিকা' অধ্যায়টি দেখুন।

৩০৭. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১২০।

tauhiderdak.com

মুসলিমরা এ কাজে সক্ষম ছিল, যদি তারা সঠিক ইসলামের ওপর থাকত।

কিন্তু তারা সঠিক ইসলামের ওপর থাকেনি। ফলে তাদের ওপর এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। তারা মানুষের জীবন সংশোধন করা ও তাদেরকে সঠিক দ্বীনের দিকে পথপ্রদর্শন করার পরিবর্তে নিজেরাই আল্লাহর পথ ত্যাগ করে পশ্চিমা জাহিলিয়াতের পেছনে কুকুরের মতো ছুটতে শুরু করে। তারা আজ চূড়ান্ত অপদস্থ হয়ে কাফিরদের কাছে কুকুরের মতো আনুগত্য করার অনুমতি চাইছে, একেবারে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাদের অনুকরণ করছে।

এটাই হচ্ছে নারীবাদ ইস্যুতে এবং মুসলিমদের আধুনিক উন্নতির নামে অন্য সকল ইস্যুতে যা ঘটেছে, তার সঠিক বিবরণ।

মেয়েরা ভার্সিটিতে প্রবেশ করে শুধু শিক্ষার জন্য নয়; বরং স্বাধীন হওয়ার জন্য। দ্বীন-ধর্ম, আখলাক-চরিত্র ও রীতিনীতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য।

পূর্বে যেমন ইউরোপীয় নারীদের বলা হয়েছিল, তেমনই তাদেরও বলা হয়, আধুনিক শিক্ষা ও ছেলেদের সাথে অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা নারীদের অধিকার, যেগুলো ধর্মে চরিত্র ও প্রথার নামে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাই আজ এসব ট্যাবু ভেঙে ফেলা আবশ্যক; যাতে নারীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত অধিকার লাভ করতে পারে।

একসময় মেয়েরা দলে দলে ভার্সিটিতে ভর্তি হতে থাকে। সবকিছু কিন্তু একদিনে হয়ে যায়নি; এমনকি যারা চক্রান্ত করছিল, তারাও সবকিছু খুব দ্রুত হয়ে যাওয়ার কল্পনা করেনি; যদিও তাদের অন্তর সেই দৃশ্য দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। প্রথম দিকে ভার্সিটির মেয়েদের মাঝে যদিও কিছুটা শালীনতা ছিল, তবে মানসিকভাবে তারা পশ্চিমা অশ্লীলতার সংস্কৃতি গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায়।

এটাই স্বাভাবিক যে, মুসলিম-বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত এসব ভার্সিটি ইসলামি আদর্শ রক্ষা ও ছেলে-মেয়েকে ইসলামি পরিবেশে গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল; যাতে এগুলো এমন উন্মুক্ত মঞ্চে পরিণত হয়, যেখান থেকে মুক্তভাবে ইসলাম, উত্তম চরিত্র ও প্রথার ওপর সর্বমাধ্যমে আক্রমণ করা যাবে। তবে সতর্কতার সাথে; যাতে একেবারে সব প্রকাশ না হয়ে যায়। যতদিন না ভার্সিটিগুলো সমাজের মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়। কেননা, এগুলো সমাজের মূল ভিত্তি হয়ে গেলে তখন তারা কোনো বাধা-বিপদের ভয় ছাড়া প্রকাশ্যে যা ইচ্ছা করতে পারবে। কারণ, তখন তাদের শিকড় উপড়ে ফেলা অসম্ভব হয়ে যাবে।

ভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে প্রথম দিন থেকে এটা তৈরির পেছনে মূল পরিকল্পনা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলে যে, আমরা সমাজের জন্য পুরুষ ও নারী সব শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক তৈরি করব। ফলে সাধারণ মানুষ এ কথায় অনেক খুশি হয়। যুবক-যুবতিরা খুব আগ্রহের সাথে এতে ভর্তি হতে থাকে। কেননা, এই ভার্সিটিগুলো ছিল তাদের জন্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বড়ো এক অগ্রগতি, যা ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলো স্থবির হয়ে যাওয়ার পর তাদের সমাজে সৃষ্টি হওয়া এক বিশাল শূন্যতা পূরণ করেছে। তারা আরও খুশি হয়েছে এই ভেবে, এখন আমাদের কাছেও ইউরোপের মতো ভার্সিটি রয়েছে।

কিন্তু অনেকেই কল্পনা করেনি যে, ভার্সিটিগুলো ইসলামের ওপর আক্রমণের উন্মুক্ত মঞ্চে পরিণত হবে। সেখান থেকে এমন সব যুবক বের হয়ে আসবে, যারা প্রকাশ্যে ধর্মীয় আদর্শকে তাচ্ছিল্য করবে। তাদের অজ্ঞতা বা মূর্খতার অহংকারবশত এই ধারণায় যে, ভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটরা হচ্ছে সমাজের মাথা। কারোর অধিকার নেই যে, তাদের বাধা দেবে, বিতর্ক করবে বা তাদের কোনো ভুল ধরবে। অন্যথায় সে হচ্ছে পশ্চাৎপদ ও মূর্খ। কারণ এটা ভার্সিটি, আর এখানেই তো সত্যিকারের জ্ঞান পাওয়া যায়। এখানের ছাত্রদের চিন্তার দিগন্ত বিস্তৃত ও স্বাধীন, তারা দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানের মানসিকতাসম্পন্ন এবং জীবন-পরিচালনায় স্বাধীন। তাদের নিকট ভার্সিটি ছাড়া বাকি সব হচ্ছে পশ্চাৎপদতা, স্থবিরতা, পিছিয়ে পড়া, মধ্যযুগীয় মূর্খতা, যারা এখনো জীবনের ক্ষেত্রে অন্ধকারে বাস করছে।[৩০৮]

মানুষ প্রথমবার যখন ইসলামবিরোধী প্রাচ্যবিদ ও নাস্তিকদেরকে ভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে দেখতে পায়, তখন অবাক হয়ে যায়। যারা ইসলাম ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে মন্দ কথা বলত। তারা আরও অবাক হয় যখন দেখে, তহা হুসাইনের মতো কিছু ব্যক্তি জাহিলি কাব্যসাহিত্যকে ফিরিয়ে আনছে। সে দাবি করছে, জাহিলি কাব্য কুরআনের তুলনায় অধিক সাহিত্যপূর্ণ। তারা এ রকম ইসলামের ওপর বহু আক্রমণ দেখে একের পর এক অবাক হতেই থাকে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ বিরোধিতা করে। কিন্তু তাদের এই বিরোধিতা ছিল অনেক দুর্বল, যা বাস্তব জীবনের কোনো

---

৩০৮. অনেকেই জানে না, আমিও ভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছি। সেখানে ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা করেছি; তাই আমি এখানে যা বলছি, তা ভার্সিটির বিরুদ্ধে অন্ধ আবেগ থেকে বলছি না। কেননা, এটা সত্য, যারা ভার্সিটিতে পড়ে, তাদের জ্ঞানের পরিধি থাকে অনেক বিস্তৃত এবং বৈশ্বিক চিন্তাধারা সম্পর্কে তাদের জানাশোনা থাকে অনেক বেশি। কিন্তু তারা কখনোই ছাত্রদেরকে পশ্চিমা সভ্যতাকে যাচাই ও পর্যালোচনা করে তা থেকে ভালোগুলো গ্রহণ করে নিজেদেরকে উন্নত করা এবং মন্দগুলো থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা দেয় না।

tauhiderdak.com

কিছুই পরিবর্তনে সক্ষম ছিল না। চক্রান্তকারীরা পর্দার পেছন থেকে ইন্ধন জোগাতে থাকে: যার ফলে একসময় মানুষের দ্বীনি আবেগ-অনুভূতি ভোঁতা হয়ে আসে এবং স্বয়ং জনগণ ভার্সিটি থেকে পাস করে এসে তাদের ভাষায় কথা বলতে থাকে।

সাহিত্য-দর্শন ও শিল্পকলা অনুষদকে বিশেষভাবে ভ্রান্ত চিন্তা ও দর্শন তৈরির জন্য গঠন করা হয়। যাতে সেখান থেকে এমন মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী বের হতে পারে, যারা প্রাচীন চিন্তাধারা থেকে বের হয়ে আসবে। দ্বীন, আখলাক ও ঐতিহ্যের স্থানে পশ্চিমা বুঝকে গ্রহণ করে নেবে। যাতে চক্রান্তকারীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন সমাজ গঠন হয়, যাদের সন্তানরা মুক্ত-স্বাধীন হয়ে দ্বীনের সাথে যা ইচ্ছা আচরণ করবে। তেমনই আইন ও মানবাধিকার অনুষদ থেকে এমন ছাত্ররা বের হয়, যারা মানবরচিত আইনের দিকে আহ্বান করে। আর যেহেতু তারা এ ছাড়া অন্য কিছু শিখেনি, তাই তাদের এর প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকাই স্বাভাবিক। এ জন্য তারা অন্য সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করত এবং আল্লাহর শরিয়াহ দ্বারা শাসন করা তাদের কাছে কল্পনাতীত ছিল। এটা তাদের কাছে অদ্ভুত বিষয় ছিল যে, ধার্মিক ব্যক্তিদের থেকে রাজনৈতিক ও শাসক বের হয়ে আসবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞান অনুষদ থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাইন্টিস্ট ইত্যাদি বের হয়ে আসত। কিন্তু তারা শিক্ষা অর্জন করত পশ্চিমা পদ্ধতিতে অর্থাৎ তারা ছিল সেক্যুলার, যারা নিজেরা ধার্মিক হওয়া তো দূরে থাক, দ্বীন-ধর্মের বিষয়ে কোনো কথা শুনতে পারত না। কেননা, তারা ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র আর তাদের কাছে ধর্ম হচ্ছে কুসংস্কার। তারা হচ্ছে বাস্তববাদী আর ধর্ম হচ্ছে রূপকথা। তারা হচ্ছে চিন্তাশীল বুদ্ধির অধিকারী, যাদেরকে অবশ্যই সাধারণের স্তরে নেমে আসা উচিত নয়, যারা বিজ্ঞানের বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না। এ ছাড়াও তারা পশ্চিমা সেক্যুলারদের থেকে একটু ভিন্ন ছিল। কারণ, তারা নিজেদের ভাষাকে অবজ্ঞা করত, যা বিজ্ঞানের জন্য উপযুক্ত নয়। তারা তাদের মনিবের ভাষায় কথা বলত; এমনকি আরবি ভাষায় লিখিত কোনো কাগজের দিকে মুখ ফিরিয়েও তাকাত না। কেননা, আরবি হচ্ছে পশ্চাৎপদতার ভাষা। আর আরবি দ্বারা যেই কুরআন লেখা হয়েছে, তার প্রতি তো তাদের রয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ।

এভাবে একে একে বহু অনুষদ ও ফ্যাকাল্টি তৈরি হতে থাকে; যেন এমন প্রজন্ম তৈরি হয়, যারা হবে ইসলামের শত্রু এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিমাপন্থী।

tauhiderdak.com

ভার্সিটিগুলো থেকে যেমন মুক্তচিন্তাধারী পুরুষ বের হয়েছে, যারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে পশ্চিমা সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরেছে, তেমনই স্বাধীন নারীদের এক প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা দ্বীন-ধর্ম, চরিত্র ও সামাজিক নীতি ত্যাগ করে শিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। এখনো যার লেলিহান শিখা সবকিছু জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছে। একদিকে এই আগুন কিছু আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে। অন্যদিকে মিডিয়া এসে একে সর্বদা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সাংবাদিকের ক্যামেরাগুলো ভার্সিটির মেয়েদের পেছনে ঘুরত। তাদের সমস্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করত। তাদের সুন্দর চেহারাগুলো এ ঘটনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হতো। মিডিয়াগুলো প্রতিনিয়ত সেসব মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকত, যারা সামাজিক সমস্ত রীতিনীতির ট্যাবু ভেঙে মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে মুক্তভাবে এগিয়ে গেছে।

তারা সর্বদা এসব কথা বলে সেই প্রথার ওপর আক্রমণ করত যে, এগুলো নারীকে ঘরে বন্দী করে রাখে। পুরুষের গোলাম বানিয়ে রাখে। অপূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়ে রাখে। অধিকারহীন করে রাখে, যার কাজ শুধুই সন্তানধারণ, জন্মদান ও লালনপালন এবং পুরুষের সেবা করা। এখানে আমাদেরকে একটা বিষয় স্পষ্ট থাকতে হবে, যেদিকে আমরা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি; কিন্তু তা একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

নারীরা বাস্তবেই কিছু ক্ষেত্রে নির্যাতিত ছিল এবং তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা হতো। এর কারণ ছিল জাহিলি দৃষ্টিভঙ্গি, যা মুসলিম-সমাজে তাদের আকিদাগত বিচ্যুতির সময় ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু ইসলামি বুঝ-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। সব জাহিলিয়াত সাধারণত নারীকে অবজ্ঞা ও লাঞ্ছিত করে। কিন্তু গ্রিক রোমান ও এর উত্তরাধিকারী বর্তমান জাহিলিয়াত নারীকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করেছে; যাতে তারা পুরুষের ভোগ্যপণ্য হতে পারে।

তাই মুসলিম-বিশ্বের সর্বত্রই নারীকে মানবিক সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মর্যাদার স্থানে বসানো আবশ্যক ছিল। যা আল্লাহ তাআলা মানবজাতির পুরুষ-নারীকে সমানভাবে দিয়েছেন, (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) 'আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি...।'[৩০৯] অতঃপর নারীকে মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের সমান

৩০৯. সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং ৭০।

tauhiderdak.com

মর্যাদা দিয়ে বলেছেন, (بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) 'তোমরা পরস্পর এক।'[৩১০] সন্তানধারণ ও দুগ্ধপানের কষ্টের বিনিময়ে তার জন্য বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদান করে বলেছেন, (حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا) 'তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে।'[৩১১] রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষ্যমতে সন্তানের বেহেশত রেখেছেন মায়ের পায়ের নিচে।

মুসলিম-সমাজে ইসলামের এই বিধান থেকে বিচ্যুতি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের রাস্তা খুলে দিয়েছে। শয়তানরা এ ফাটল ব্যবহার করে বিশ্বের সব মুসলিম-সমাজে প্রবেশ করে তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নে কাজ করেছে। যদি মুসলিম-সমাজগুলো সঠিকভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করত, তাহলে শয়তানের পক্ষে কীভাবে তার চক্রান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল?

ইউরোপ তাদের জাহিলিয়াতের যুগে নারী আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। তাদের নারীরা দ্বীন-ধর্ম, আখলাক ও ঐতিহ্য ত্যাগ করে নির্লজ্জ-উলঙ্গ ও অশ্লীলভাবে বের হয়ে এসে রাস্তাঘাট, কলকারখানা, অফিস-আদালত সব ভরে ফেলেছে। নারী ও পুরুষরা অশ্লীল সম্পর্কে জড়িয়ে শরীর ও মন নষ্ট করে ফেলেছে। পরিবার ধ্বংস ও শিশুরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে। সেখানে অপরাধ, মদ, নেশাদ্রব্য, ডিপ্রেশন, স্নায়ু ও মানসিক সমস্যা, হত্যা ও পাগলামি ব্যাপক হয়ে গেছে। অন্যদিকে মুসলিম-সমাজ তখনও রক্ষণশীলতা, উৎকৃষ্টতা, পবিত্রতা ধরে রেখেছিল। তাদের পুরুষ ও নারীরা পশ্চিমা জাহিলিয়াতের দিকে ঘৃণা ও নিজেদের দিকে শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টিতে তাকাত।

কেউ বলতে পারে, মুসলিম-বিশ্বে যখন নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়, তখন তাদের সামনে আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের দোষ-ত্রুটি এতটা স্পষ্ট ছিল না; যার ফলে মুসলিম-বিশ্ব ধারণা করেছে যে, নারী-ইস্যুতে তাদের সমাজে ইউরোপের মতো অভ্যন্তরীণ ধ্বংসাত্মক পরিণতি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে সংশোধনের চেহারা ফুটে উঠবে।

অথচ এটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

কারণ, বহু পূর্বেই ১৯২৯ সালে মার্কিন লেখক উইল ডুরান্ট তার লিখিত 'দর্শনের সৌন্দর্য' বইয়ে এ কথাগুলো লিখেছে,

.....

৩১০. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৯৫।

৩১১. সুরা আল-আহকাফ, আয়াত নং ১৫।

tauhiderdak.com

'আধুনিক শহুরে জীবন বিয়ে থেকে হতাশা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে মানুষের সামনে অবাধ যৌনতার সকল প্রেরণা উপস্থিত করে এবং এর রাস্তা সহজ করে দেয়। যার ফলে সেখানে তুলনামূলক দ্রুত যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য অর্জনে বিলম্ব হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে শরীর বিদ্রোহ করে বসে এবং প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। পূর্বের সমাজে যে চারিত্রিক পবিত্রতা ছিল মর্যাদার বস্তু, তা এখন তাচ্ছিল্যের বস্তুতে পরিণত হয়। সেই জীবন হারিয়ে যায়, যেখানে লজ্জা ছিল সৌন্দর্যের ভূষণ। এখনো পুরুষরা তাদের অপরাধের সংখ্যায় গর্ব করে, মেয়েরা পুরুষের মতো অবাধ যৌনাচারের অধিকার প্রত্যাশা করে। বিয়ের পূর্বে যৌনসম্পর্ক স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অশ্লীলতায় আসক্ত নারীদের আধিক্যের ফলে এখানে রাস্তা থেকে পতিতারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বিয়ে বহির্ভূত অশ্লীলতাগুলো মূলত আধুনিক শিল্প-সভ্যতার[৩১২] সামাজিক ও জৈবিক ত্রুটির ফসল। আমরা হয়তো এ বলে তা এড়িয়ে যাব যে, এতটুকু সামাজিক অবক্ষয় আধুনিক শিল্পের উন্নতির জন্য আবশ্যক, যা থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। এটাই বর্তমান অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীদের মত। তবে এটাও অবশ্যই লজ্জাজনক যে, আমরা খুশিমনে আমেরিকার পাঁচ লক্ষাধিক নারীর স্বেচ্ছায় পতিতাবৃত্তিতে বলি হওয়া মেনে নেব। তারা নিজেকে নাট্যমঞ্চে সাহিত্যের বইয়ে উলঙ্গভাবে মেলে ধরছে। নারী-পুরুষের অবৈধ শারীরিক উত্তেজনা জাগ্রত করে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছে। যার ফলে তারা বিয়ে ও সুস্বাস্থ্যের পরিবেশ থেকে শিল্প-সভ্যতার বিশৃঙ্খল পরিবেশে গিয়ে পড়ছে।

যখন শহুরে মেয়েরা বিয়ের অপেক্ষায় হতাশ হয়ে যায়, তখন এ পরিবেশের ভয়াবহ উত্তেজনার প্রভাবে ক্লাব, নাট্যমঞ্চ, ভার্সিটি সর্বত্র অবাধ যৌনতার দিকে ধাবিত হয়। যার পেছনে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতারও অনেক প্রভাব থাকে। কারণ, এখন সে পুরুষের ওপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল নয়। আর পুরুষরাও স্বাভাবিকভাবে এমন নারীকে বিয়ের প্রতি আগ্রহ দেখায় না। তবে যেখানে নারীরা ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের মতো আয় করতে পারলেই স্বামী গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে যায়, সেখানে যদি এত বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারে, যা দ্বারা দুজন মানুষকে চালানো যাবে, তাহলে অবস্থা কী হবে?[৩১৩]

.....

৩১২. উদ্দেশ্য হলো, যৌনতার শিল্প। এখনে সে মার্কিন নারীদের মন্দ অবস্থায় দুঃখ করা সত্ত্বেও তাদের কাজের পেছনে যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে।

৩১৩. উদ্দেশ্য হলো, পুরুষরা হয়তো বেশ্যা নারীকে বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু আর্থিক সমস্যার ফলে সর্বশেষ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

tauhiderdak.com

যারা আমাদের এই অবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে, তাদের ব্যাপারে ধারণা করি যে, তারা কখনোই এ রকম কিছুর প্রতি আগ্রহী হবে না। কেননা, আমরা এই পরিবর্তনের স্রোতে ডুবে গেছি। এটি আমাদের নিশ্চিতভাবে এমন পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে, যা থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। এই প্রবল স্রোতে আমাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও রীতিনীতি বিনাশ হয়ে যেতে পারে।'[৩১৪]

যদি সেই যুগে এ বিষয়গুলো উইল্ড ডোরান্টের মতো একজন অমুসলিম বরং নাস্তিক ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট থাকে, যে দ্বীন ও চরিত্রের সব আদর্শ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, তাহলে এটা নিশ্চিত যে, সেই যুগের মুসলিম-সমাজের কাছেও এটা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ছিল। যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত ইমানের নুরে সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিল। যারা মানুষের জীবনে ধ্বংসকারী সব উপাদান গ্রহণের ফলে তাদের ওপর আল্লাহর সুন্নাহ প্রয়োগের আবশ্যকীয়তা অনুধাবন করত।

কিন্তু সমস্যা হলো, মুসলিম-সমাজ সঠিক ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিল; ফলে শয়তানরা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে যায়।

তারা যখন তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছিল, তখন তারা এ কথা বলেনি যে, মুসলিম-সমাজ সঠিক ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। তাই তাদেরকে পুনরায় সেদিকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ, তারা তো সংশোধনের উদ্দেশ্যে আসেনি বা এই জন্য তাদের নারীবাদী আন্দোলনের ডাক দেয়নি; বরং তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছে এই উম্মাহকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং ইসলামের দিকে ফিরে আসার সকল পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।

যদিও তারা তাদের আন্দোলনের শুরুতে ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে; যাতে বিরোধীদের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু খুব দ্রুতই তাদের এই লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়। ফলে তারা ইসলামের ব্যাপারে তাদের আসল চেহারা উন্মুক্ত করে। তা হলো ইসলামকে ঘৃণা, বিরোধিতা ও আক্রমণের এজেন্ডা।

তারা দুই ধাপে এই কাজটি বাস্তবায়ন করে। প্রথমে সামাজিক প্রথার ওপর আক্রমণ করে, অতঃপর সরাসরি দ্বীনের ওপর আক্রমণ করে।

প্রাথমিক ধাপে তারা সেই প্রথাগুলোর ওপর আক্রমণ করে, যেগুলো ছিল আসলেই সমস্যাযুক্ত, যেগুলো মুসলিমরা তাদের আকিদাগত বিচ্যুতি ও ইসলাম সঠিকভাবে

.....

৩১৪. উইল্ড ডোরান্টের লিখিত 'দর্শনের সৌন্দর্য' বই থেকে কিছু পরিমার্জিত।

tauhiderdak.com

বাস্তবায়ন না করার ফলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু তারা সতর্কতার সাথে এই মন্দ প্রথাগুলোর ওপর আক্রমণের সময় ইসলামের সঠিক কিছু রীতিকে মন্দ প্রথার সাথে অন্তর্ভুক্ত করে। অতঃপর সবগুলোকে পশ্চাৎপদতা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগীয় প্রথা হিসেবে উপস্থাপন করে বলে, এগুলো সব ধ্বংস করা আবশ্যক; যাতে মানুষ আধুনিক যুগের মুক্ত স্বাধীন প্রথাগুলো গ্রহণ করে নিতে পারে।

তাদের আক্রমণ ছিল অনেক ধোঁকাপূর্ণ ও নিকৃষ্ট। কেননা, এটা সত্য যে, মুসলিমদের জীবনে ভালো-মন্দ দুই ধরনের প্রথা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তারা যদি নারী-ইস্যুতে সত্যিকার ইসলামি প্রথাগুলো বিদ্যমান রেখে মন্দ প্রথাগুলো সংশোধন করে নিত—এমনকি এ জন্য এসব প্রথার ধারকদের সাথে লড়াই করে হলেও—তাহলে এসব মন্দ প্রথা থেকে মুক্ত হওয়া একেবারে সহজ ছিল। আর উম্মাহর জীবনে সর্বদাই এমন কিছু আলিম ছিলেন, যারা সব মন্দ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু নারীবাদী চক্রান্তকারীরা ভালো-মন্দ মিশ্রিত করে ফেলে। তারা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতাকে পুঁজি করে আল্লাহর দ্বীন বিরোধী জুলুমের প্রথাকে আক্রমণের পাশাপাশি সঠিক ইসলামিক প্রথাকেও এমনভাবে আক্রমণ করে, যেন সেটাও জুলুম, যা প্রতিরোধ করা আবশ্যক। তারা প্রচার করে, এগুলো আসলে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ধার্মিক ব্যক্তিদের নব আবিষ্কৃত বিষয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে তাদের অবস্থান শক্তিশালী হওয়ার পর তারা স্পষ্ট স্বীকার করে যে, এটা সত্যিকার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত প্রথা। তখন তারা প্রকাশ্যে তাদের বলে যে, স্বয়ং দ্বীনই হচ্ছে একটি সমস্যা, যা থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

তারা নারীদের শিক্ষা বঞ্চিত করার প্রথাকে আক্রমণ করে, যা আসলেই ভুল কাজ ছিল। তারা নারীকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করার প্রথার ওপর আক্রমণ করে। একইভাবে তারা নারীকে তার অনুমতি ও আগ্রহ ব্যতীত বিয়ে দেওয়ার রীতির ওপর আক্রমণ করে, যা আসলেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্পষ্ট হাদিসের ভিত্তিতে ভুল কাজ ছিল।

কিন্তু তারা এসবের সাথে নারীর পর্দা করা, বাড়িতে বসে থাকা ও বিনা প্রয়োজনে বের না হওয়ার প্রথাকে আক্রমণ করে। এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন বাড়ি তার জন্য বন্দিশালা। যেখানে পুরুষরা অহংকার ও জুলুমবশত তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছে। অথচ মুমিন নারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশ হচ্ছে, তারা স্বাধীনভাবে সমাজে বের হয়ে আসবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা তোমাদের ঘরে থাকবে এবং পূর্বের জাহিলি যুগের মতো নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না।'[৩১৫]

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

'হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের ওপর আবরণ টেনে দেয় (শরীর ঢেকে রাখে)।'[৩১৬]

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

'মুমিন নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে; তাদের গুপ্তাঙ্গের হিফাজত করে; (সাধারণত) যেটুকু প্রকাশিত হয়, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে; বুকের ওপর ওড়না দিয়ে রাখে।'[৩১৭]

কিন্তু নারীবাদীরা তাদের আক্রমণের প্রথম ধাপে ভালোকে মন্দের সাথে মিশিয়ে ফেলে এবং সবগুলোকেই প্রাচীন যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রথা বানিয়ে বলে, এর কোনো প্রয়োজনীয়তা আধুনিক উন্নতির যুগে অবশিষ্ট নেই।

তাদের আক্রমণের দ্বিতীয় ধাপে এসে তারা স্বয়ং দ্বীনকেই পশ্চাৎপদ হিসেবে বিলুপ্ত করতে চেষ্টা করেছে। যে ব্যাপারে সামনে আলোচনা হবে।

নারীবাদ ইস্যু তাদের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল না, যেগুলো দ্বারা সমাজ থেকে ইসলামকে সমূলে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে; বরং বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনে অন্যসব ক্ষেত্রেও তারা সমানভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছে। যার মধ্যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো, চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র এবং রাজনীতির ক্ষেত্র।

.....

৩১৫. সুরা আল-আহজাব, আয়াত নং ৩৩।

৩১৬. সুরা আল-আহজাব, আয়াত নং ৫৯।

৩১৭. সুরা আন-নুর, আয়াত নং ৩১।

tauhiderdak.com

চার. চিন্তা ও সাহিত্যের ক্ষেত্র

চিন্তা ও সাহিত্যের ময়দানে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, বর্তমান প্রজন্মের সাথে তাদের অতীতের সাহিত্য ও চিন্তাধারার সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে সাহিত্য ও জ্ঞান ছিল ইসলাম থেকে উৎসারিত।

এ লক্ষ্যে আরবে আব্দুল আজিজ ফাহমির মতো কিছু ব্যক্তি আরবি ভাষাকে ল্যাটিন অক্ষরে লেখার দাবি তোলে, যা তুরস্কে আতাতুর্ক তুর্কি ভাষার ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু আরববিশ্বে তাদের প্রচেষ্টা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। আর কিছু লোক আরবি সাহিত্যকে গ্রাম্য ভাষায় লেখার আহ্বান জানায়; যাতে গ্রাম্য ভাষা একসময় বিস্তৃত হয়ে মূল আরবি ভাষাকে ধ্বংস করে ফেলে। যেভাবে ফ্রান্স, ইতালিসহ অন্যান্য ভাষা ল্যাটিন ভাষাকে ধ্বংস করেছে। যেগুলো মূলত শুরুতে ল্যাটিন ভাষার শাখা হিসেবে গ্রাম্য ভাষার রূপে ছিল। পরবর্তী সময়ে তা শক্তিশালী ভাষার রূপ ধারণ করে মূল ভাষাটাই নষ্ট করে ফেলে।

কিন্তু আরবে তাদের সব প্রচেষ্টা পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এর মূল কারণ ছিল কুরআন। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর নাজিলকৃত কুরআন রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তা সংরক্ষণ করব।'[৩১৮]

আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের অসিলায় এই ভাষাটিও রক্ষার ফায়সালা করেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'আমি একে আরবি কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি; যাতে তোমরা বুঝতে পারো।'[৩১৯]

আধুনিক প্রজন্মের কাছে আরবি ভাষাকে মন্দরূপে উপস্থাপনের সর্বোচ্চ চেষ্টার পরেও ব্যর্থ হয়ে তারা আরও বহু মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের সাথে তাদের ইসলামি ঐতিহ্যের সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করে।

.....

৩১৮. সুরা আল-হিজর, আয়াত নং ৯।

৩১৯. সুরা ইউসুফ, আয়াত নং ২।

tauhiderdak.com

এসব চেষ্টার মধ্যে ছিল বিবর্তন বা আধুনিকায়নের চিন্তা। যা বৈশ্বিক ইহুদিবাদের চক্রান্তে ইউরোপের পরিবেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে সামাজিক, চারিত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

বিবর্তনের চিন্তার মূল বিষয় হচ্ছে, সব নতুন জিনিস পুরাতন থেকে উত্তম। কোনোটা নতুন এবং অন্যটা পুরাতন হওয়া নতুনটা উত্তম হওয়ার জন্য যথেষ্ট, সেখানে আর কোনো কারণ দেখা হবে না। আর যেহেতু ইসলাম বহু প্রাচীন, যার বয়স ১৪০০ বছর পার হয়ে গেছে। তাই বিবর্তনের দাবি হচ্ছে, একে ছুড়ে ফেলে নতুন বিষয়গুলো গ্রহণ করা। আর নতুন বিষয় হচ্ছে, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা। তাই ইসলামকে ফেলে দিয়ে সেই সভ্যতাকে গ্রহণ করা আবশ্যক।

কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় শুধু এই যুক্তিটা যথেষ্ট ছিল না। কেননা, কট্টরপন্থী ব্যক্তিরা তো এই বিবর্তন ও মডারেশনে বিশ্বাস করে না, যেমনটা আধুনিক ব্যক্তিরা করে। তাই সেখানে আরও অনেক কারণ যুক্ত করা আবশ্যক; যাতে মুসলিমদের ইসলাম আঁকড়ে ধরা শিথিল হয়ে আসে এবং অন্যদিকে বিবর্তনের চিন্তা আরও শক্তিশালী হয়ে মুসলিমদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। এই লক্ষ্যে তাদের আরও কিছু যুক্তি ছিল এমন—

- ইসলাম প্রথম যুগের বেদুইন পরিবেশের জন্য উপযুক্ত, যা বর্তমান আধুনিক সভ্য সমাজের জন্য উপযুক্ত নয়।
- ইসলাম নারীকে নির্যাতন করে, তাকে বাড়িতে বন্দী করে রাখে, পুরুষের গোলাম বানিয়ে রাখে, তার মনুষ্যত্ব এবং অধিকার ছিনিয়ে নেয়।
- ইসলামে কোনো মানবাধিকার নেই।
- ইসলাম কোনো শাসনব্যবস্থা নয়; বরং এটা কিছু আখলাক-চরিত্রবিষয়ক নির্দেশনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়।
- ইসলাম পশ্চাৎপদ। কেননা, এটা সুদ হারাম করে; অথচ সুদ হচ্ছে আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির মূল কেন্দ্র, যা ছাড়া কিছুই চলতে পারে না।
- ইসলাম এই... ইসলাম সেই... ইত্যাদি।[৩২০]

তাদের আরেকটি কার্যকরী পন্থা ছিল, ইসলামি ইতিহাসকে বিকৃত করা।

.....

৩২০. 'ইসলামের ব্যাপারে সংশয়সমূহ' বইয়ে আমি এগুলো খণ্ডন করেছি।

tauhiderdak.com

তারা ইসলামি ইতিহাসের শুধু বিতর্কিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকেই উপস্থাপন করত এবং ইসলামের অন্যান্য দিকগুলো গোপন রাখত। অর্থাৎ তারা মন্দ দিক প্রকাশ করত এবং সুন্দর চিত্রগুলোকে গোপন রাখত। যার ফলে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম নববি ও খিলাফতে রাশিদার যুগে অল্প কিছু সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তী সময়ে এর মাঝে এমন কোনো উপাদান ছিল না, যা ইসলামের অস্তিত্ব বিদ্যমান রাখতে পারে। তাই এর মাঝে এমন কিছু নেই, যার প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত। বরং একে ছুড়ে ফেলা ও এটা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

এর পাশাপাশি প্রাচ্যবিদরা ইসলামের ব্যাপারে অনেক সংশয় ছড়াতে থাকে। তাদের শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে আরবি ভাষায় তা প্রচার করে। কিছু ক্ষেত্রে তারা মূল লেখকের দিকে সম্পৃক্ত করত, বাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্ররা নিজেদের দিকেই এসব কথা সম্পৃক্ত করত। এ ছাড়াও তারা ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে কটাক্ষ করত। যা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সাহাবায়ে কিরামসহ উসমানি খিলাফত ও সুলতান আব্দুল হামিদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

তারা বিশেষভাবে ইসলামের দুটি যুগকে আক্রমণ করেছে, ইসলামের সূচনাকাল ও উসমানি খিলাফত। এর পেছনে দুটি ভিন্ন কারণ ছিল। তবে তাদের এ প্রচেষ্টাগুলোর মূল উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম উম্মাহকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করা।

ইসলামের সূচনাকালকে আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, এটা প্রত্যেক মুসলিমের নিকট সর্বোচ্চ গর্ব ও মর্যাদার বিষয়। যা এখনো সেই মর্যাদাসহ বিদ্যমান রয়েছে। যার সুউচ্চ অবস্থান ও অতুলনীয় আদর্শ সব প্রজন্মের মুসলিমদের কঠিনভাবে আকর্ষণ করেছে। সব মুসলিমই এই প্রজন্ম দ্বারা কঠিনভাবে প্রভাবিত এবং অন্তরের গভীরে সেই সোনালি যুগ আবার দুনিয়াতে বাস্তবায়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

ইসলামের শত্রুরা ভালো করেই জানে যে, সেই সোনালি যুগের আদর্শের প্রেরণা ইসলামের চেতনাকে হাজার বছর ধরে সংরক্ষিত রেখেছে ইসলামের ওপর ভেতর ও বাইর থেকে বহু ঝড়ঝাপটা আসা সত্ত্বেও। মুসলিমদের প্রতি প্রজন্মেই এমন কিছু মানুষ ছিল, যারা সেই উঁচু স্তরে পৌঁছার জন্য আগ্রহী ছিল। ফলে তারা নিজেদের মাঝে বা নিজ পরিবেশে সেই প্রজন্মের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে। ফলশ্রুতিতে ইসলামের সীমা বৃদ্ধি হয়েছে, কখনো থেমে থাকেনি; বরং প্রতিবার স্তমিত হওয়ার পর আবারও প্রজ্বলিত হয়েছে।

tauhiderdak.com

তাই তারা চূড়ান্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষের সাথে সেই যুগকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে; যাতে তারা এর মাধ্যমে মুসলিমদের অন্তর থেকে সেই প্রজন্মের প্রতি সম্মানবোধ নষ্ট করে দিতে পারে। কারণ, তখন আর সেই প্রজন্ম মুসলিমদের নব উত্থানের কারণ হিসেবে তাদের ভয়ের বস্তু হয়ে থাকবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-সহ ইসলামের প্রতি যুগের বড়ো ব্যক্তিরা তাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে বিশেষভাবে চক্রান্ত করেছিল, এই প্রত্যাশায় যেন উনার অবস্থান মুসলিমদের কাছে নষ্ট হওয়ার পর মুসলিমদের থেকে ইসলামের চেতনা হারিয়ে যায়। প্রাচ্যবিদ ও তাদের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানসাধনা ও মুক্তচিন্তা ইত্যাদি নামে অনেক ভ্রান্ত ও মিথ্যা কথা বলত, যা ছিল বাস্তব জ্ঞানসাধনা থেকে বহু দূরে।[৩২১]

প্রাচ্যবিদদের দোসররা তাদের পশ্চিমা মনিবদের থেকে যা পায়, তা-ই গিলে ফেলে এবং পরে তা গবেষণালব্ধ বই-প্রবন্ধ ইত্যাদি নামে বমি করে। এভাবে বারবার মিথ্যাকে পুনরাবৃত্তি, বিশেষত বিজ্ঞান-গবেষণার নামে করার ফলে মানুষ ধোঁকা খায়। তাদের কথায় প্রভাবিত হয় এবং এসব সত্য মনে করে তারাও স্রোতে ভেসে যায়।

আর উসমানি খিলাফত এবং বিশেষ করে আব্দুল হামিদের ওপর তাদের বিদ্বেষের কারণ ছিল একটু ভিন্ন।

ইউরোপের খ্রিষ্টজগৎ সামগ্রিকভাবে ইসলামকে অপছন্দ করে। কিন্তু তারা উসমানি খিলাফতকে বিশেষভাবে ঘৃণা করে। কারণ, একমাত্র তারাই ইউরোপের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা ইউরোপের বিশাল অংশ উসমানি শাসনের অধীনস্থ করতে সক্ষম হয় এবং সেখানে লক্ষ-কোটি জনগণ ইসলামে প্রবেশ করে। খ্রিষ্টান ইউরোপ ও বৈশ্বিক ইহুদিরা স্বয়ং আব্দুল হামিদকে আরও বিশেষভাবে ঘৃণা করে। কেননা, খিলাফতকে ধ্বংসের লক্ষ্যে সমগ্র ইউরোপের সব প্রচেষ্টা তিনি প্রতিরোধ করেছেন। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান দিতে অস্বীকার করেছেন; যদিও তারা এ জন্য বহু চেষ্টা করেছে।

উসমানি শাসন ছিল সর্বশেষ খিলাফত, যারা মুসলিম-বিশ্বকে শাসন করেছে। পুরো দুনিয়ার মুসলিমরা তাদের আনুগত্য করত, হোক সরাসরি তাদের শাসনাধীন ভূমিতে অবস্থান করে বা স্বতন্ত্র শাসনের অধীনস্থ হওয়ার মাধ্যমে; এমনকি শত্রুর ভূমিতে

.....

৩২১. আমি 'প্রাচ্যবিদরা ও ইসলাম' বইয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

tauhiderdak.com

অবস্থানকারীরাও তাদের আনুগত্য করেছে।

খ্রিষ্টানজগৎ ২০০ বছরের অধিক সময়ের দীর্ঘ চক্রান্তের মাধ্যমে সর্বশেষ খিলাফত ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এবং পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা—যারা ইসলামকে তাদের সন্তানের মতো চিনে—তারা কখনোই ইসলামের প্রতি আশ্বস্ত হতে পারেনি; বরং তারা সর্বদাই ইসলামের পুনর্জাগরণের ভয় করে। তারা ভয় করে, কোনো একদিন হয়তো আবারও ইসলামি খিলাফত ও ইমারাত প্রতিষ্ঠা হবে।

মার্কিন প্রাচ্যবিদ টমাস বেন 'পবিত্র তরবারি' বইয়ের ভূমিকায় ইসলামের ইতিহাস ও দীর্ঘ বিজয়ের সারসংক্ষেপ বর্ণনার পর বলেছে, 'বর্তমানে এই অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং মুসলিমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। কিন্তু যা একবার পূর্বে ঘটেছে, তা আবারও ঘটতে পারে। মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর অনুসারীদের অন্তরে যে আগুন প্রজ্বলিত করেছেন, তা কখনোই নিভে যাবে না।'

ইংরেজ ঐতিহাসিক টয়েনবি 'ইসলাম ও পশ্চিম' নামক বক্তব্যে বলেছে, 'যদি অবস্থা অনুকূল হয়, তাহলে ইসলাম আবার তৃতীয় বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে পারে।'

তাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বশেষ উসমানি শাসনের চিত্রকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে থাকে। যাতে কেউ পুনরায় আবার ইসলামি শাসন ফিরে আনার চিন্তা না করে; বরং আল্লাহর (নাকি শয়তানের) শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এটা ভেবে যে, রাষ্ট্রটি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এ জন্য শত্রুরা উসমানি খিলাফতের ভুলগুলো খুব বড়ো আকারে ফুটিয়ে তোলে; যাতে ভুলের আলোচনা দ্বারাই ইতিহাসের সব পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে উসমানি খিলাফতে অনেক বড়ো কিছু ভুল হয়েছে। কিন্তু শত্রুরা যে রূপে একে উপস্থাপন করছে, তা এর সঠিক চিত্র নয়; বরং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ভুলগুলো বহুগুণ বড়ো আকারে উপস্থাপন করেছে এবং ভালো বিষয়গুলো গোপন করেছে; যাতে মানুষের কাছে পুরোটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয়।

বিশেষ করে সুলতান আব্দুল হামিদ—শত্রুদের দৃষ্টিতে তার সবচেয়ে বড়ো অপরাধ ছিল, ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে বারবার বাধা দেওয়া—তাই অবশ্যই তাকে সবচেয়ে খারাপভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে যারা বৈশ্বিক ও

tauhiderdak.com

ইহুদি জোটের সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, তাদের জন্য শিক্ষা হতে পারে।

মুসলিমদের ফিতনায় ফেলা ও ইসলাম থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে কঠিন যে আঘাতটি করে, তা ছিল উসমানি খিলাফতের শেষ যুগের ঐতিহাসিক অবস্থাকে এমনভাবে উপস্থাপন, যেন তখন তাদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল। হয়তো এই ইসলামি রাষ্ট্র ও শাসনকে সমস্ত অধঃপতন, স্থবিরতা ও নির্যাতনসহ টিকিয়ে রাখবে বা এই শাসন বিলুপ্ত করে আধুনিকতা, সভ্যতা ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে: যাতে সকল জুলুম ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে পারে।

তারা মুসলিমদের সামনে তৃতীয় পথটি গোপন রাখে। যা হলো, সঠিক ইসলামি কার্যক্রমের মাধ্যমে উসমানি শাসনের ভুলগুলো সংশোধন করা। যা মূল ইসলামি রাষ্ট্র ও শাসন টিকিয়ে রাখবে; চাই তা তুর্কিতে হোক বা অন্য কোথাও। এবং মুসলিম-সমাজের সব বিচ্যুতি সংশোধন করে সঠিক ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনবে।

কিন্তু এই পথটিই ইসলামের শত্রুরা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা ও ভয় করে। তাই কখনোই তারা এই পথটি মানুষের সামনে উপস্থাপন করেনি; বরং তাদের সামনে দুটি পথ খোলা রেখেছে, যে দুটিই সর্বশেষ তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেবে।

তারা সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর জন্য তৃতীয় আরেকটি মাধ্যম ব্যবহার করে।

যেসব সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী বিদেশি ভাষা শিখেছিল, তারা নিঃসন্দেহে সেই ভাষার সাহিত্য ও চিন্তাধারায় ব্যাপক প্রভাবিত হয়। কারণ, এটা তাদের জন্য নতুন বিষয় ছিল। আর সেই ভাষায় এমন অনেক কিছু ছিল, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব। আর মুসলিমদের সে সময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতার ফলে এটা তাদের জন্য ছিল অমূল্য সম্পদ ও এমন পাথেয়, যা তাদের উত্তম জীবনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

তাই এসব সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমা ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনে কঠিনভাবে মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা এটা বলছি না যে, পশ্চিমা সাহিত্য দর্শন একেবারে তুচ্ছ বিষয় ছিল, যা নিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়; বরং উলটো সেখানে অনেক বিষয় ছিল, যা জানা উচিত। কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছি,

tauhiderdak.com

প্রথমত, তাদের দর্শন ও সাহিত্যে মূল গোড়া ছিল নষ্ট ও বিকৃত। কারণ, ইউরোপের বিদ্যমান পরিস্থিতির ফলে তারা ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়। আর এই দূরত্ব ইউরোপের চিন্তাজগতের সর্বত্র প্রবেশ করে এবং সর্বদিককে বেষ্টন করে নেয়; চাই তা হোক সাহিত্য বা বিজ্ঞান-গবেষণা বা রাজনীতি বা সামাজিকতা বা অর্থনীতি... ইত্যাদি। আল্লাহ থেকে বিমুখতা ও আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত সবকিছুর বিরোধিতার মানসিকতা এই চিন্তাধারার মাঝে প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যা তাদেরকে মানুষের জীবনের মৌলিক অস্তিত্বের বাস্তবতার সঠিক জ্ঞান থেকে দূরে রাখে। ফলে তাদের সামনে জীবনের অস্তিত্বের ব্যাপারে এমন চিত্র তৈরি হয়, যা কোনোভাবেই সঠিক চিত্র ছিল না। কেননা, সেই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন, স্রষ্টার পরিকল্পনাহীন ও স্রষ্টার প্রণীত নীতির বিরোধী।

মানুষ যখন এই মহা বাস্তবতা দেখতে পায় না, তখন অবশ্যই জীবনের অস্তিত্বের ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত হয়। তেমনই সে এ অস্তিত্বের সামগ্রিক ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হয়। অতঃপর সে জীবনের ভুল উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর তা বাস্তবায়নের জন্য যে পথ অনুসরণ করে, সেটা পুরোটাই হয় বাস্তবতার পরিবর্তে শুধু তার প্রবৃত্তির চাহিদা। তার কার্যক্রমগুলো হয় বিক্ষিপ্ত, যেখানে নিশ্চয়তা থাকে না।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

> ‘আর সত্য যদি তাদের ইচ্ছার অনুগামী হতো, তাহলে আসমান-জমিন ও তার মাঝের সবকিছু নষ্ট হয়ে যেত।’[৩২২]

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

> ‘আসমান ও জমিন এবং তার মধ্যবর্তী কোনো কিছু আমি অহেতুক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা।’[৩২৩]

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় চিন্তাধারায় অবশ্যই ভালো কিছু রয়েছে। যেমন, একাডেমিক গবেষণা, এই গবেষণা-কর্মে কঠোর চেষ্টা করা, সাংগঠনিক দক্ষতা, অভিজ্ঞতাকে গবেষণার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা। যার ফলে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু

.....

৩২২. সুরা আল-মুমিনুন, আয়াত নং ৭১।

৩২৩. সুরা সদ, আয়াত নং ২৭।

tauhiderdak.com

এ শাখাগত ক্ষেত্রে তাদের বহু অবদান থাকা মূল ভিত্তি নষ্ট-বিকৃত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারেনি, যার ওপর এই শাখাগত বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত। তাই মূল ভিত্তি নষ্ট হওয়ার ফলে এসব শাখাগত ভালো বিষয়ও সর্বশেষ খারাপ পরিণতির দিকেই নিয়ে যায়। অথচ এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যদি সঠিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো, তাহলে এগুলোর ফলাফল হতো অনেক চমৎকার, গভীর কার্যকরী। যেখানে শাখাগত বিষয়ের সাথে তার সঠিক সম্পর্ক ফুটে উঠত। তখন তারা এ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরো বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুধাবন করতে সক্ষম হতো।

কিন্তু তাদের কুফরি চিন্তার ভিত্তিতে গবেষণা থেকে কিছু শাখাগত বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা লাভ করলেও মূল ভিত্তিতে সমস্যা থাকায় পূর্ণ সফলতা ও মূল ফায়দা অর্জন করতে সক্ষম হয় না।

সামগ্রিকভাবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সেই ব্যক্তি লাভ করে, যার কাছে রয়েছে সঠিক ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি। যা কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে সঠিক সামগ্রিক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি সেই ব্যক্তির মাঝে এমন দূরদৃষ্টি তৈরি করে, যার মাধ্যমে সে এই চিন্তার ভিত্তিতে যাচাই ও পর্যালোচনা করতে পারে। ফলে সে জেনে যায়, কী গ্রহণ করবে এবং কী ছেড়ে দেবে।

কিন্তু এসব সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের মাঝে পশ্চিমা সাহিত্যের প্রতি যে মুগ্ধতা জন্ম নিয়েছিল, তা তাদের ইসলামের চেতনার সাথে সম্পর্কহীনতা এবং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত অন্তর নিয়ে একজন মুসলিমের দূরদৃষ্টির দ্বারা ইসলামের বাস্তবতায় গভীর ডুব দিতে অক্ষমতা ও জীবন অস্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই মুগ্ধতা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে পারত; ফলে এর শাস্তি শুধু তারাই ততদিন ভোগ করে যাবে, যতদিন না আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেন। যা কোনো মানুষের প্রস্ফুটিত অন্তরে জন্ম নেয়, যখন সে তার পূর্ণ সত্তা দিয়ে ইসলাম পালন করে। ফলে—তার প্রতিভা অনুযায়ী—ইসলাম তার সামনে নিজ গুপ্তধনের ভান্ডার খুলে দেয় এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতের সততার পরিমাণ অনুযায়ী তার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়।

কিন্তু পুরো উম্মাহর মাঝে পশ্চিমা মুগ্ধতা ছড়ানোর কারণ হলো, প্রচার মিডিয়াগুলো এসে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের চিন্তা পুরো উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে দেয়। সেটাকে অনেক বড়ো করে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। যতটা সম্ভব বিস্তৃত পরিসরে প্রচার

tauhiderdak.com

করে। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। তারা তাদেরকে শুধু উপযুক্ত স্থানে পৌঁছায়নি; বরং কয়েক ধাপ ওপরে উঠিয়ে দেয়। তাদের কথাগুলো এমনভাবে প্রতিধ্বনিত করে, যা মানুষের কানে কানে পৌঁছে যায় এবং অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়।

সমাজে সঠিক উৎস থেকে আহরিত জীবনের সর্বক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্তকারী সত্যিকার ইসলামি চিন্তাধারার অনুপস্থিতির ফলে এসব সেক্যুলার সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা সমাজের চিন্তা ও সাহিত্যজগতের নেতৃত্বের আসনে বসে যায় এবং প্রজন্মের শিক্ষক হয়ে যায়। ফলে তারা পুরো উম্মাহকে তাদের সাথে পশ্চিমা চিন্তাধারার দিকে ধাবিত করে। তাদেরকে বোঝায় যে, এটাই হচ্ছে ওহি এবং জীবনের পাথেয়। ফলে তাদের হাতে শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্ররা এই পশ্চিমা চিন্তাধারাকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে। তাদের চিন্তা থেকে নিজ চিন্তা গ্রহণ করে। তাদের জীবনের লক্ষ্য সেটা হয়ে যায়, যা পশ্চিমাদের কাছে লক্ষ্য। আর তাদের লক্ষ্য তো ছিল ইসলাম থেকে বহু দূরে; বরং চূড়ান্তভাবে দ্বীন থেকে বিচ্যুত।

কাফির ও পশ্চিমা কবি-সাহিত্যিকরা তাদের কাছে আদর্শে পরিণত হয়। তাদের নাম উচ্চারণ করে তারা নিজের মধ্যে গর্ব অনুভব করত এবং সমাজের মানুষের কাছে শিক্ষিত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতো; যদিও এসব কবি-সাহিত্যিকদের ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের সীমা ছিল শুধুই তাদের কিছু নাম মুখস্থ করা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে তাদের মুখে মুখে 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল বলেছেন' এর পরিবর্তে 'অমুক তমুক দার্শনিক বলেছেন' এমনটা প্রচারিত হতে থাকে; বরং 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল বলেছেন' এই কথাগুলো তাদের কাছে পিছিয়ে থাকা ও স্থবিরতার নিদর্শন হয়ে যায়। কেননা, তা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।

tauhiderdak.com

পাঁচ. রাজনৈতিক ক্ষেত্র

রাজনৈতিক ময়দানের অবস্থা অন্যগুলো থেকে কম মন্দ ছিল না; বরং আরও ভয়াবহ ছিল। যেমন মিশরে নেপোলিয়ন ইসলামি শরিয়াহ বিলুপ্ত করে নেপোলিয়নের আইন চালু করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তখন মিশরের মুসলিমরা তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্রুসেডার ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বিতাড়িত করে। যেখানে মুসলিম উম্মাহর সাথে তাদের কঠিন লড়াই হয়।

কিন্তু ১৮৮২ সালে ইংরেজরা এসে মিশরে ইসলামি শরিয়াহ-শাসন বিলুপ্ত করে সেখানে নেপোলিয়নের আইন চালু করে। কিন্তু তখন জনগণের পক্ষ থেকে কোনো বিদ্রোহ বা আন্দোলন হয়নি।

আজ কেউ যখন ১৭৯৮ থেকে ১৮৮২ সালের মাঝে একটি জাতি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তা দেখতে পাবে, তখন হয়তো আশ্চর্য হবে। কিন্তু সেখানে অনেক উপকরণ ছিল, যা মানুষের অন্তর ও বিশ্বাস পরিবর্তন করে ফেলেছিল।

নিঃসন্দেহে এই ৮০ বছরের দীর্ঘ সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যে কার্যক্রম চালানো হয়েছে, তার বিশাল প্রভাব ছিল। যেমন মুহাম্মাদ আলি ও তার সন্তানরা পশ্চিমাকরণের যেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছিল, যেখানে তাদের প্রধান কর্মপন্থা ছিল মিশরের যুবকদের পড়াশোনার জন্য পশ্চিমা বিশ্বে পাঠানো। এটা জনগণের চিন্তাকে ধারাবাহিকভাবে পশ্চিমাকরণ এবং তাদের জীবনকে পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে তুলতে মূল ভূমিকা রেখেছিল। তখন সময়ের সাথে সাথে মানুষের মাঝে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা নিঃশেষ হয়ে যায়।

এ ছাড়াও মিশনারি স্কুল বৃদ্ধি পাওয়া এবং সেখানে মুসলিম সন্তানদের ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করার ফলে সমাজের চিন্তাধারা, পোশাক ও আচার-আচরণে ধারাবাহিক বিশাল পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। মুসলিমরা তাদের মূলকেন্দ্র—ইসলাম—থেকে বিচ্যুত হয়ে ধীরে ধীরে অন্যদিকে সরে যায়।

মিশরে শরিয়াহর শাসন বিলুপ্ত হওয়ার সরাসরি কারণ ছিল হয়তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে আরাবির বিপ্লব ব্যর্থ হওয়া। কেননা, এরপরেই ইংরেজরা বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করে এবং মিশরি বাহিনীকে ধ্বংস করে পুরো রাষ্ট্র দখল করে নেয়। কিন্তু শুধু এই ঘটনাটি মুসলিম উম্মাহকে এই ভয়াবহ অবস্থা চুপ থেকে মেনে নিতে বাধ্য

tauhiderdak.com

করতে পারত না, যদি না তাদের পুরো জীবনের সর্বক্ষেত্র আকিদা থেকে বিচ্যুত না হতো। কারণ, হিন্দুস্তানের মুসলিম মুজাহিদরাও ইংরেজদের সামনে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ইসলামি শাসন বিলুপ্ত করে ইংরেজ শাসন চালু করার ফলে মুজাহিদরা পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও আবার উঠে দাঁড়ায় এবং পরবর্তী সময়ে একের পর এক বিদ্রোহ করতে থাকে। যেমন ১৮২৬ ও ১৮৫৭ সালের আন্দোলন। যেখানে ইংরেজদের বহু প্রাণহানি হয়। ফলে সেখানে চূড়ান্ত হিংস্রভাবে মুসলিমদেরকে দমন করার পূর্বে তারা স্থির হতে সক্ষম হয়নি।

নিশ্চয় মিশরের ধার্মিক ব্যক্তিরাও একে কুফর হিসেবেই দেখেছে, যা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারা মানসিকভাবে পরাজিত ছিল; তাই অপদস্থ হয়ে চুপ হয়ে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ ক্রুসেডার সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চিন্ত হয়নি; কেননা, মানুষ চুপ হয়ে গেলেও তারা তো ইসলামকে নিজ সন্তানের মতোই চিনে। তা ছাড়া হিন্দুস্তানের অভিজ্ঞতা তাদের এই শিক্ষা দিয়েছে, মুসলিমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম থেকে বিচ্যুত না হবে, বারবার বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ আন্দোলন করে যাবে।

তাই তারা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের যে কার্যকর পথ বেছে নিয়েছিল, সেখানে তারা ইসলামি জীবনের প্রতিটি ভিত্তিতে আঘাত করে; যাতে এই উম্মাহকে পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করা যায়। তবে ইসলামের বাহ্যিক অবয়ব রক্ষা করে; যাতে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়। এই আগ্রাসনে তাদের সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্র, অর্থাৎ আইন ও শাসনের ক্ষেত্র।

ইতিপূর্বে এ উম্মাহ তেরোশ বছর যাবৎ ইসলামি শাসনের অধীনে বাস করেছে। তখন তারা নিজেদের জীবনের জন্য এটা ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করত না। তারা নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি ইসলামি শরিয়াহর শাসনকে তাদের জীবনে ইসলামের সত্যিকার বাস্তবায়ন হিসেবে গণ্য করত। এই দুটো ছিল একজন মুসলিমের সাথে কাফিরের পার্থক্যের নিদর্শন—শরিয়াহভিত্তিক শাসন ও নামাজ প্রতিষ্ঠা। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কিছু শিথিলতা বা ত্রুটি ছিল; কিন্তু এ দুটো বিষয়ে কোনো ছাড় বা শিথিলতা ছিল না।

এটাই উম্মাহকে তার পুরো ইতিহাসে শত গাফিলতি, বিদআত ও ভ্রষ্টতা সত্ত্বেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। অতঃপর সর্বশেষ ক্রুসেড বাহিনী এসে উম্মাহকে পরাজিত করে তাদের ইসলামি শাসন ধ্বংস করেছে। কঠোরহস্তে তাদের ওপর কুফরি শাসন চাপিয়ে দিয়েছে; কিন্তু কখনোই তারা পালটা প্রতিরোধের ব্যাপারে নিরাপদ ছিল না।

tauhiderdak.com

তারা ভয় করত যে, নিকট বা দূর ভবিষ্যতে কোনো সময় এই উম্মাহ বিদ্রোহ করে বসতে পারে। তাই অবশ্যই এমন পন্থা বেছে নিতে হবে; যাতে এমন ভয়াবহ কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত না হয়।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম-বিশ্বে তাদের গোলামরা এসে তাদের সাহায্য করে। তারা শিক্ষা-সংস্কৃতি, নারী ও আখলাক চরিত্রের মতো রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদেরকে ইসলামের সাথে যুদ্ধে সাহায্য করে।

মুসলিম-বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে এমন কিছু ব্যক্তি দাঁড় করায়, যারা ইসলামের ব্যাপারে ভুল ও বিকৃত কথা বলতে শুরু করে। যেমন তারা মানুষকে বলে, ইংরেজরাই হচ্ছে বর্তমান সময়ের 'উলুল আমর' বা শাসক। তাই আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বা বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে; বরং আমাদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে, তাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া। অতঃপর তাদের সাথে বোঝাপড়া করা; যাতে আমাদের ও তাদের মধ্যকার বিরোধগুলো নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

একটু কল্পনা করে দেখুন, তারা কত ভয়াবহ অপরাধ করছে!

তাদের প্রথম অপরাধ হচ্ছে, এটা বলা যে, কাফিররা আমাদের বর্তমান শাসক। অথচ মুসলিমদের পুরো ইতিহাসে কখনোই এমন কোনো শাসক আসেনি—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

> 'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যকার (উলুল আমর) শাসকদের কথা মেনে চলো।'[৩২৪]

পরবর্তী সময়ে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিকৃতি ঘটিয়ে একে যে, জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, ইসলাম তা প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, এর সঠিক অর্থ হলো, এমন শাসক, যারা ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী শাসন করবে, যা আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকেই স্পষ্ট। কেননা, এখানে উলুল আমরকে আল্লাহ ও রাসুলের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আলাদা উল্লেখ করা হয়নি। এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বলেছেন,

.....

৩২৪. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ৫৯।

tauhiderdak.com

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ ও রাসুলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান এনে থাকো।'[৩২৫]

তা ছাড়া হাদিসে এসেছে,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই।'[৩২৬]

এসব বাদ দিলেও এটা ছিল প্রথমবার, যখন মুসলিমরা কাফির খ্রিষ্টান ও মুরতাদকে তাদের শাসক হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

কারণ, ইতিপূর্বেও প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধে খ্রিষ্টানরা শাম ও মিশরসহ কিছু ইসলামি রাষ্ট্র প্রায় ২০০ বছর দখল করে রেখেছিল। কিন্তু তখন মুসলিমরা কখনোই তাদেরকে শাসক হিসেবে গণ্য করেনি; বরং তাদেরকে কাফির হিসেবে গণ্য করেছে, যারা তাদের ইসলামি ভূখণ্ডকে জোর করে দখল করে রেখেছে। যাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদের বিতাড়িত করা আবশ্যক।

কিন্তু এই উম্মাহর মধ্যে থাকা পশ্চিমাদের দোসর মুনাফিকরা এই অর্থগুলো বিকৃত উম্মাহকে স্বয়ং কাফিরকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে।

তাদের দ্বিতীয় অপরাধ ছিল, উম্মাহকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা থেকে বাধা দেওয়া; বরং এর পরিবর্তে কাফিরদের থেকে শিক্ষা নিতে বলা।

অথচ এই উম্মাহ কাফিরদের থেকে কী শিখবে?

যদি তারা উম্মাহকে বলত যে, তারা যেন তাদের থেকে শক্তির উপকরণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি, কঠোর শ্রম ব্যয় করা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা-বিন্যাসপদ্ধতি

৩২৫. সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ৫৯।
৩২৬. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি, হাদিস নং ৩৮১।

tauhiderdak.com

শিক্ষা করে। অপরদিকে যেন তাদের আকিদা-বিশ্বাসের ভ্রষ্টতা থেকে সতর্ক থাকে। যে ভ্রষ্টতার ফলে তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে দ্বীন বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের সমাজব্যবস্থা ভেঙে গেছে, নারীকে ঘরে তার মূল দায়িত্ব থেকে বের করে এনেছে। ফলে সমাজে চারিত্রিক অধঃপতন ও ব্যাপক অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া স্রষ্টাশূন্য জগতের কল্পনা থেকে মানুষকে পশু হিসেবে গণ্য করা এবং দুনিয়াকেই শুরু ও শেষ ভাবা, যার পরে কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। এমন মনে করার ফলে তাদের যে চিন্তাগত ভ্রষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বেঁচে থাকতে বলত।

যদি তারা মানুষকে এভাবে ভালো-মন্দ বাছাই করে গ্রহণ করতে বলত, তাহলে তারা হতো এই উম্মাহর জন্য উত্তম শিক্ষক। যারা উম্মাহকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করেছে। কিন্তু তারা মানুষকে এসব কিছু বলেনি; এমনকি তাদের থেকে এমন কথা বের হওয়ার কোনো আশা নেই। কেননা, তারা যদি এমন কথা বলত, তাহলে তো তারা প্রজন্মের শিক্ষক হিসেবে গণ্য হতো না; বরং তারা গণ্য হতো পশ্চাৎপদ হিসেবে।

তাদের তৃতীয় অপরাধ ছিল, এত সব কিছুর পর ক্রুসেডার শত্রুর সাথে বোঝাপড়া ও সম্প্রীতির আহ্বান করা। তাদেরকে বিতাড়িত করার জন্য ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং শক্তি অর্জনের দিকে আহ্বান না করা।

এসবই ছিল পশ্চিমাদের এ দেশীয় দোসরদের গোলামির নমুনা। তবে তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ ছিল এই উম্মাহর যুবকদেরকে এসব চিন্তায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কারণ, শুধু কথার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে ইংরেজদের প্রতি তাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেবা ছিল মুসলিমদের ভেতর থেকেই মুহাম্মাদ আব্দুহু, কাসিম আমিন, সাদ জাগলুলের মতো কিছু উস্তাদ ও বুদ্ধিজীবী তৈরি করা।

tauhiderdak.com

সেক্যুলার নেতৃত্বের উত্থান ও ধর্মীয় নেতৃত্ব-শূন্যতা

এই পরিবর্তনটা ছিল অনেক বড়ো ও ভয়াবহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এটি খুব সহজেই ঘটে যায়। এর জন্য পশ্চিমারা মিশরসহ মুসলিম-বিশ্বের বহু দেশে যে নীতি ফলো করেছে, তা হলো, প্রথমে সেখানের শাসনের জন্য তাদের পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিকে বন্দী বা গুম করা। পরে কিছুদিন পর এমনভাবে ফিরিয়ে দেওয়া; যাতে সে মানুষের দৃষ্টিতে বীর ও পূজনীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। অতঃপর যেন সে দেশের দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ইসলামি ধারা থেকে অন্য স্রোতে প্রবাহিত করতে পারে। কারণ, অন্য ধারার আন্দোলন যত কঠিনই হোক, ইসলামের শত্রুদের জন্য তা দমন করা তাওহিদের পতাকাতলে জিহাদকে দমনের পরিবর্তে অনেক সহজ।

যেমন মিশরে সাদ জগলুলকে ব্রিটিশরা এভাবে পরিকল্পিতভাবে গুম করে আবার জনতার কাছে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর সে তার জাদুকরি ভাষণের দক্ষতার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিতে জাতির বীর ও মহানায়কে পরিণত হয়; ফলে তখন তার সব কথাই তাদের কাছে ওহির সমপর্যায়ে চলে যায়; যদিও তা সত্যের বিপরীত হোক। তার সমস্ত কাজ সঠিক বিবেচিত হতে থাকে; যদিও তা সর্বনিকৃষ্ট কাজ হোক।

ধীরে ধীরে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, মিশরের দখলদার-বিরোধী সংগ্রাম মানুষের দৃষ্টিতে দেশাত্মবোধক বিষয়ও থাকেনি; যদিও এটি পূর্বে ইসলামি আন্দোলন থেকে পরিবর্তিত হয়ে দেশপ্রেমী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল; বরং তা এখন শুধু সাদ জাগলুলের চেতনার আন্দোলনে পরিণত হয়। সে যে বিষয়ে থাকে, জনগণ তা গ্রহণ করে নেয়, সত্য-মিথ্যা যাচাই করা ছাড়াই। সে যেই বিষয়ে রাগান্বিত হয়, জনগণ অন্য কিছু দেখা ব্যতীত তাতে রাগান্বিত হয়। শিক্ষিত-মূর্খ, ধনী-গরিব, চাকরিজীবী, কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক সবার অবস্থা এমন হয়ে যায়। সেই জাতির শুধু স্বল্প কিছু ব্যক্তি এমন ছিল, যারা জনগণের স্রোতের বাইরে গিয়ে তাকে গাদ্দার হিসেবে চিহ্নিত করত। তবে তারাও সাদ ও তার অনুসারীদের তুলনায় উত্তম ছিল না; বরং তারা শুধুই তার প্রতি হিংসাবশত এমন বলত।

tauhiderdak.com

তবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এসব নেতৃত্বের জাদুকরি ভাষণের ক্ষমতা বা তাদেরকে গুম করে বীর বানিয়ে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া অথবা বহু বছর যাবৎ মানুষ জীবনের সঠিক লক্ষ্য ভুলে গিয়ে এসব সেলেব্রেটি ও নেতাকে নিজ জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়াই মুসলিমদের এই অধঃপতনের মূল কারণ নয়।

বরং এখানে ভিন্ন দুটি বড়ো বাস্তবতা রয়েছে, যেগুলোর প্রভাব পূর্বের সমস্ত উপাদানের তুলনায় গভীর ও সুদূরপ্রসারী ছিল।

প্রথম বাস্তবতা হলো, মুসলিমদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্ট শূন্যতা; যদিও ইসলামি আবেগ তাদের অন্তরে জাগ্রত ছিল।

মুসলিম-বিশ্বের প্রায় সমস্ত বিপ্লবে ইসলামি আবেগ ছিল, যা ইসলামি শাসনের দিকে অভিমুখী ছিল। যারা ইসলামের জন্য আন্দোলনে নেমে আসত, দখলদার কাফিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত, এটাই ছিল প্রতিটি বিপ্লবের শুরুর অবস্থা।

কিন্তু...

ইসলামের ব্যাপারে মুসলিমদের সচেতনতা কতটুকু ছিল? তাদের চিন্তায় ইসলামের বাস্তবতার বুঝ কেমন ছিল? বিশেষ করে তাদের চিন্তায় আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধানের শাসনের মর্ম কী ছিল? তারা জানত যে, এটা ইসলামের সত্যিকারের শাসন ও আদেশ? নাকি তাদের কাছে এগুলো কিছু 'প্রাণহীন বাক্য' ছিল, যা বাস্তবায়নের আশা তারা করত ঠিক; কিন্তু তা সমাজ-রাষ্ট্রে বাস্তবায়িত না থাকা তাদের ইসলামপালনে কোনো প্রভাব ফেলত না?

এটাই ছিল মুসলিমদের এই বিশাল অধঃপতনের প্রধান কারণ।

যদি তাদের মাঝে সত্যিকার ইসলামি বুঝ থাকত, যদি তাদের মাঝে এই চূড়ান্ত বিশ্বাস ও চেতনা থাকত যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যদানের প্রধান কর্তব্য ও স্বাভাবিক দাবি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করা। কারণ, কোনো মানুষ মুসলিমই হতে পারবে না, যদি আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো শাসন মেনে নেয়। যদি তারা এটা বুঝত, তবে কখনো তাদেরকে দেশাত্মবোধের চেতনার দিকে নেওয়া যেত না। যার স্লোগান হচ্ছে, দ্বীন আল্লাহর জন্য ও দেশ সকলের জন্য। যাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে ধর্মীয় বিষয়ে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

tauhiderdak.com

দ্বিতীয় বাস্তবতা হলো, এই উম্মাহর মাঝা থেকে তাদের মূল নেতৃত্বের শূন্যতা। যারা হলেন দ্বীনের আলিমগণ।

উম্মাহর ইতিহাসে সর্বযুগেই আলিমগণ ছিলেন তাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক। তেমনই তাদের যেকোনো বাধা-বিপদের আশ্রয়স্থল। মানুষ তাদের দিকে ছুটে যেত দ্বীন-শিক্ষা ও যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য। তেমনই মানুষ যদি শাসকদের থেকে কোনো জুলুমের শিকার হতো, তখন তাদের কাছে যেত; যাতে তারা শাসক ও নেতাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের মাধ্যমে এ জুলুম প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। এতে আলিমরা কখনো শাসকদের পক্ষ থেকে চাপে পড়তেন। কখনো জেলে বন্দী হতেন এবং শারীরিক, আর্থিক ও সম্মানহানির শিকার হতেন।

কিন্তু তারা এসব চাপের মুখেও দৃঢ় থাকতেন; যাতে আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্বে অবিচল থাকতে পারেন। কারণ, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দান করে সম্মানিত করেছেন। তাই যখন কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাসক ও প্রজাদের হিদায়াতের চেষ্টা এবং বিশেষভাবে শাসককে নসিহত করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার আমানতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন যেন তারা জবাব দিতে পারেন। এই বিপদসংকুল পথে তাদের প্রেরণা দানকারী হিসেবে ছিল এই হাদিসটি—'সর্বোত্তম শহিদ হচ্ছে হামজা এবং সেই ব্যক্তি, যে জালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ ও নিষেধ করেছে; ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছে।'[৩২৭]

এই উম্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, চিন্তাগত ও আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে আলিমগণ ছিলেন নেতা ও পথপ্রদর্শক। তেমনই তারা ছিলেন উম্মাহর ওপর আপতিত যেকোনো আক্রমণের মোকাবিলায় জিহাদের আহ্বানকারী। তারা মানুষকে আল্লাহ ও আখিরাতের কথা এবং সত্যবাদী মুজাহিদদের জন্য জান্নাতে যে নিয়ামত অপেক্ষা করছে, তা স্মরণ করিয়ে দিতেন। কখনো তারা নিজেরা জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন আবার কখনো তারা নিজেরাই বাহিনী পরিচালনা করতেন।

এটাই ছিল আলিমদের মূল দায়িত্ব, যাদের অন্তরে এই দ্বীন ছিল জীবন্ত। ইতিহাসে অগণিত আলিমের দৃষ্টান্ত রয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে তাদের রবকে সন্তুষ্ট করেছেন। উত্তমভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। এই পথে সকল বিপদে ধৈর্যধারণ করেছেন। তারা কখনোই দুর্বল বা হীনম্মন্য হননি।

৩২৭. মুসতাদরাকুল হাকিম, হাদিস নং ৪৮৮৪; আশ-শারিআতু লিল আজিরি, হাদিস নং ১৭২৭।

tauhiderdak.com

কিন্তু আমরা যে যুগের আলোচনা করছি, তখন আলিমদের অবস্থা কী ছিল?

তারা কি তখন নিকট অতীতেও উম্মাহর জীবনে যে নেতৃত্বের অবস্থানে ছিলেন এবং ক্রুসেডার হামলার বিরুদ্ধে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, সেই অবস্থানে ছিলেন? তারা কি উম্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি তুলেছিলেন?

তারা কি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছেন? জালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আদেশ-নিষেধ করেছিলেন; চাই এর ফলে তাকে হত্যা করা হোক বা না হোক?

নাকি অধিকাংশ আলিম তখন শাসকের দোসরে পরিণত হয়েছিল! তাদের পিছে পিছে চলা এবং তাদের সব জুলুম ও অপরাধের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করত। অন্যদিকে অবশিষ্ট সব আলিম নিজেকে ঘরে বা মাদরাসায় চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। তারা ভাবতে শুরু করে যে, মানুষকে ইলম শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সমস্ত দায়িত্ব পূর্ণ হয়ে গেছে।

কিন্তু তারা ভুলে গেছে, ইলম যদিও নিজেই একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কিন্তু তাদের এই অবস্থানের ফলে ইলমের অসংখ্য ফায়দা নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা, তা অতীতের মধ্যে আটকে গেছে, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দূরে থাক, বর্তমানের দিকেও দৃষ্টি দিচ্ছে না।

দ্বীনি কিতাবে যে ইলম রয়েছে, তা প্রত্যেক আলিমের জন্য আবশ্যকীয় পাথেয়। তবে তা শুধু শিক্ষার মধ্যেই থেমে থাকার জন্য নয়; বরং একে মূল উৎস বানিয়ে বর্তমান অবস্থাকে ইসলামিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই ও পর্যালোচনা করার জন্য। যেমন বর্তমান সমাজব্যবস্থা কি ইসলামি আকিদা ও শরিয়তের নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত, না তা থেকে বিচ্যুত, না কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে? অতঃপর যেসব বিষয়ে ঘাটতি বা বিচ্যুতি রয়েছে, সেগুলোর ইসলামি সমাধান পেশ করা।

মোটকথা, আলিমগণের দায়িত্ব ছিল, এ দ্বীনকে নিয়ে কাজে নেমে যাওয়া। এই দ্বীনের ইলমের আলোকে সমাজকে সঠিক ইসলামি ধাঁচে গড়ে তোলা। শাসক ও শাসিত সবাইকে সঠিক অবস্থায় অবিচল রাখা। শাসককে আল্লাহর শরিয়াহর শাসনের দিকে ফিরিয়ে আনা; ফলে সমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতের সব জুলুম দূর হয়ে যাবে। জনগণকে ইসলামের আদেশ ও নিষেধ মান্য করার আদেশ দেবে। ফলে সমাজ থেকে চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক কার্যক্রমের সব অনিষ্টতা দূর হয়ে যাবে। অথবা আলিমগণ অন্তত এই দ্বীনের পথে জিহাদ করবে। ফলে মানুষের মাঝে

tauhiderdak.com

আল্লাহর জন্য নিয়তের শুদ্ধতা ও সংস্কারের জন্য প্রচেষ্টার পরিমাণ অনুযায়ী সমাজ সংশোধন হবে।

কিন্তু সে যুগের আলিমরা কি এই বিশাল দায়িত্বের উপযুক্ত অবস্থানে ছিল?

আমরা তাদের ওপর জুলুম করতে চাই না। নিঃসন্দেহে তাদের মাঝে কতক আলিম ছিলেন, যারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে সত্য বলেছেন। পদ-পদবি পায়ের নিচে ছুড়ে ফেলেছেন, যখন বুঝতে পেরেছেন যে, এটা তাদেরকে শাসকের গোলাম বানিয়ে ফেলবে বা সত্য বলা থেকে বাধা দেবে। তাদের মধ্যে অনেকে ফিকির ও ইজতিহাদ করেছেন। কিন্তু তাদের পরিমাণ ছিল অনেক স্বল্প। বাকি অধিকাংশরা হয়তো দুনিয়ার লোভে শাসকের আনুগত্য করেছে, বা চার দেয়ালের মাঝে কিতাব ও দরস নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন।[৩২৮]

যখন আলিমদের অবস্থা এমন ছিল, তখন ময়দানে কিছু সেক্যুলার নেতৃত্ব উঠে আসে। যাদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। যারা এসে জনগণের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তোলে। জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বানানো ও শাসকের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার দাবি তোলে। এমন সংবিধান প্রণয়নের আহ্বান করে, যেখানে আইন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও আদালতের অধিকার নির্দিষ্ট থাকবে। পার্লামেন্টে জনগণের প্রতিনিধিরা একত্রিত হবে এবং একমাত্র তাদেরই আইন প্রণয়নের অধিকার রাখবে। একই সাথে তারা এ জাতির শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যসেবাসহ সর্বখাতে সংস্কারের দাবি তোলে। এই জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, চিন্তা ও বস্তুগত ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা দূর করার ডাক দিতে থাকে।

মোটকথা, তারা নেতৃত্বের সেই দায়িত্ব পালন করতে শুরু করে, যা আলিমগণ ত্যাগ করেছেন। সেই সাথে আলিমদের মাঝে আরেকটি মূল উপাদানের ঘাটতি ছিল। তা হলো, বিশ্বের বর্তমান অবস্থা, আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহের ব্যাপারে জ্ঞান না থাকা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যূনতম অভিজ্ঞতার ঘাটতি।

অবস্থা যখন এমন দাঁড়িয়েছে, তখন জনগণ কোন দিকে যাবে?

.....

৩২৮. লেখকের এই বক্তব্য তৎকালীন মিশরের ক্ষেত্রে বাস্তব হতে পারে। তবে এটা পুরো বিশ্বের বাস্তবতা নয়। বিশেষত উপমহাদেশে উলামায়ে কিরাম উপনিবেশ আমল থেকে সমাজে ইসলাম ফিরিয়ে আনার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। হাজার হাজার উলামায়ে কিরাম ইংরেজদের হাতে শহিদ হয়েছেন। অল্প কিছু আলিম হয়তো ইংরেজদের দালাল ছিল। তারাও ছিল বিভিন্ন বাতিল ফিরকার লোক।

tauhiderdak.com

এটা সত্য যে, জনগণের কাছে পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট হয়েছে, এগুলো সব ছিল বিশাল এক ধোঁকা। তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, যদিও দেশে ধোঁকাপূর্ণ গণতন্ত্রের কিছু বাস্তব চর্চা রয়েছে; কিন্তু মুসলিম-বিশ্বে এটা শুধুই হাস্যকর কিছু অভিনয়। যেখানে শাসকের ওপর জনগণের সত্যিকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জনগণের প্রতিনিধিরা বাস্তব কিছুরই প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। আর তাদের স্বার্থ হচ্ছে সেটাই, যা পূর্বে অত্যাচারী জমিদার ও বর্তমানে পুঁজিবাদের স্বার্থ। যা প্রাচীন সামন্তবাদের ক্ষমতা ও জুলুমের স্থান দখল করেছে।[৩২৯]

তা ছাড়া গণতন্ত্রে নির্বাচনি দলাদলির মাধ্যমে পরিবার-সমাজে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে, শত্রুতা ও ঘৃণার ধারাবাহিকতা চলছে। এটা প্রত্যেক দলের পক্ষপাতিত্বের চর্চা থেকে জন্ম নিয়েছে। ফলে মানুষ এখন সত্যের ধার ধারছে না; বরং শাসকপার্টির নৈকট্য ও নির্বাচনে সফলতা মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র থেকে উম্মাহর ওপর আপতিত সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদ ও অনিষ্টতা।

সর্বোপরি প্রত্যেক দলই কিছুদিন পর তাদের প্রতিষ্ঠার সময়কার মূল লক্ষ্য ভুলে যায়। তারা যে দেশের সমস্যা সমাধান ও জনগণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই চিন্তা ভুলে ক্ষমতার খেলায় মত্ত হয় এবং এখানেই তাদের সব চেষ্টা ব্যয় করে। ফলে দিনশেষে সব দলই—নেতারা যেমনই হোক—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুতুলে পরিণত হয় এবং এদের মাধ্যমে তাদের সব চক্রান্ত বাস্তবায়ন হয়।

একসময় জনগণের সামনে এসব ধোঁকার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। কিন্তু শুরুতে এই খেলা ভালোই জমে উঠেছিল। যা এই উম্মাহর সত্যিকার নেতৃত্ব-শূন্যতার ফলে আরও চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল।

অন্যদিকে দ্বীনের আলিমগণ কি ইসলামের মূল বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেছে, তাওহিদের বিষয়ে?

তারা কি বলেছে, যে তাওহিদ গ্রহণের আদেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, যা দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রেরিত হয়েছেন এবং মহান কিতাব নাজিল হয়েছে, তা হলো, আল্লাহর সত্তা, সিফাত, নামসমূহ ও কর্মসমূহের একত্ববাদের দৃঢ় বিশ্বাস করা। সব ইবাদত

---

৩২৯. বাস্তবতা হলো, গণতন্ত্রের মূল দেশেও তা মূলত পুঁজিবাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যা জনগণের কাছে সমাজতন্ত্রের ঢেউ আসার পূর্বে স্পষ্ট হয়নি। বিস্তারিত জানার জন্য 'আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ে 'গণতন্ত্র' অধ্যায় দেখুন।

tauhiderdak.com

কোনো অংশীদারহীন শুধু তাঁকেই পেশ করা। শুধু তাঁর শরিয়াহ দ্বারা শাসন করা এবং তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন না করা। এ তিনটির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তাওহিদ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তা ইসলাম ভঙ্গকারী শিরক হয়ে যাবে?

সেই যুগের নামধারী আলিমরা যেমন মিশরের মুহাম্মাদ আব্দুহু ও রশিদ রেজার মতো ব্যক্তিরা কি মানুষের সামনে তাওহিদকে সেই চিত্রে উপস্থাপন করেছে, যা সালাফগণ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জেনেছেন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন? না তারা বিপরীত কাজ করেছে এবং উম্মাহকে ইসলামবিরোধী শাসনের অনুগত করেছে এই বলে যে, এটা এখন 'জরুরত'; তাই তা গ্রহণের সমস্যা নেই। তারা কুফরি আইনের শাসনকারী শাসকের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেছে। তারা উম্মাহর সংকল্পকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, যে সংকল্প জাগ্রত হলে এর পক্ষে এই কুফরি অবস্থাকে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল।

মুহাম্মাদ আব্দুহু ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুদের বৈধতা এবং সংসদে ইসলামবিরোধী আইন প্রণয়নে সহায়তামূলক ফতোয়া দিয়েছে। রশিদ রেজা মানুষকে কুফরি আইনে শাসনকারী শাসকের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেছে। সে তার এক আশ্চর্য ফতোয়ায় কিছু ইসলামি সঠিক বিষয়ের সাথে বহু ভুল বিষয় একত্রিত করেছে,

'আল্লাহর বিধান সামগ্রিক ও সার্বজনীন। যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সরাসরি নসে বর্ণিত বিধান এবং যা দলিল ও গবেষণার মাধ্যমে ন্যায় হিসেবে জানা গেছে। সুতরাং "যা ন্যায়, তা-ই আল্লাহর বিধান"—যা কোনো এক বিজ্ঞজন বলেছে।'[৩৩০]

'কিন্তু যখন নিশ্চিত প্রমাণিত ও দলিলরূপে কোনো নস পাওয়া যাবে, তখন তা ছেড়ে অন্যদিকে যাওয়া বৈধ হবে না। তবে যদি বিপরীত কোনো নস পাওয়া যায়, যা এর ওপর প্রাধান্যতার দাবি রাখে, যেমন প্রয়োজনের সময় নিষিদ্ধতা উঠে যাওয়ার নস।'

হিন্দুস্তানের পাঞ্জাবের মুফতি মৌলভি নুরুদ্দিন আমাদের শাইখকে (মুহাম্মাদ আব্দুহু) কিছু প্রশ্ন করে। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল ইংরেজদের আইনে শাসনের মাসয়ালাসংক্রান্ত। তখন উসতাজ প্রশ্নটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, যেন আমি এর

.....

৩৩০. এটা হচ্ছে প্রথম ভুল। কারণ, ন্যায় এমন শব্দ, যা আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নত অনুযায়ী না হলে যার কোনো ভিত্তি থাকে না। যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়া 'আর-রিসালাতুস সানিয়া আশারা' কিতাবে লেখেন, যে আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করে নিজে যা ন্যায় মনে করে, তা দিয়ে মানুষকে শাসন করা বৈধ মনে করে, সে কাফির। কেননা, এমন কোনো জাতি নেই, যারা ন্যায়ের শাসনের আদেশ করে না। তবে তাদের ধর্মে ন্যায় হচ্ছে তা-ই, যা তাদের নেতারা মনে করে।

tauhiderdak.com

উত্তর দিই। এটা হিন্দুস্তানে ইংরেজ আইনে শাসনের প্রশ্নের জবাব (যা মানারের সপ্তম খণ্ডের ৭৭ নং ফতোয়া হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে) :

'হিন্দুস্তানে ইংরেজ আইনে শাসন'

৭৭নং প্রশ্ন : ইংরেজদের নিকট চাকরি করা কোনো মুসলিমের জন্য কি ইংরেজ আইনে বিচার প্রার্থনা করা বৈধ, যা আল্লাহর আইনের বিপরীত? (এই ফতোয়া তখন দেওয়া হচ্ছে, যখন হিন্দুস্তানের আলিমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত এবং যখন তারা হিন্দুস্তানকে দারুল হারব ঘোষণা করেছিলেন)

জবাব : এই প্রশ্নে বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড়ো একটি সমস্যা উঠে এসেছে। যেমন আইন রচনাকারীদের বিধান, এই আইনে শাসনকারীদের বিধান এবং দারুল হারব ও দারুল ইসলামের মাঝে পার্থক্য।[৩৩১] আমরা অনেক মুসলিমদের দেখি, যারা রাষ্ট্রীয় আইনে ফায়সালাকারী আঞ্চলিক আদালতের বিচারকদের কাফির বলে এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে—

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই কাফির।'[৩৩২]

যা এসব আইনে ফায়সালাকারী বিচারকের কুফরি আবশ্যক করে, তেমনই আইন তৈরিকারী মন্ত্রী-এমপিরাও কাফির হয়ে যায়। কারণ, তারা নিজেদের জ্ঞানের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন না করলেও তাদের অনুমতিতেই এ আইন পাস হয়েছে এবং তারা বিচারকদেরকে এই আইন বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছে।

কিন্তু ইসলামি কোনো প্রসিদ্ধ ফকিহ আয়াতের এই বাহ্যিক অর্থের কথা বলেননি; বরং কেউই কখনো বলেনি। কারণ, আয়াতের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর বিধানে ফায়সালা করেনি এমন সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়; চাই সে আল্লাহর বিধানের বিপরীত কিছু দ্বারা ফায়সালা করুক বা না করুক।[৩৩৩] অথচ এমন কুফরির কথা কোনো মুসলিম দূরে

.....

৩৩১. এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কুফরি আইনের শাসনের ভিত্তিতে দারুল হারব ও দারুল ইসলামের মধ্যে পার্থক্য।

৩৩২. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৪৪।

৩৩৩. এটা দ্বিতীয় ভুল। কারণ, এখানে শাইখ যে বাহ্যিক সুরত ধরে নিয়েছে বরং যার ভিত্তিতে আয়াতকে বাহ্যিক অর্থ থেকে অন্যদিকে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছে, এমন সুরত কেউ বলেননি। কেননা,

tauhiderdak.com

থাক; এমনকি খারিজিরাও বলেনি। যারা গুনাহের কারণে ফাসিক ব্যক্তিকে কাফির বলে, যার মধ্যে আল্লাহর আইনের বিপরীত কিছু দ্বারা শাসন রয়েছে।[৩৩৪]

আহলে সুন্নাহর ইমামগণ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইখতিলাফ করেছেন। কেউ বলেছেন, এটা ইহুদিদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন সাইদ বিন মানসুর, আবুশ শাইখ, ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে ইবনে মারদুইয়া ﵀। তারা বলেন, আল্লাহ তাআলা সুরা মায়িদার তিনটি আয়াত (অর্থাৎ যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানে ফায়সালা করে না, তারা কাফির, জালিম, ফাসিক) শুধুই কাফির ইহুদিদের জন্য নাজিল করেছেন। মুসলিমদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আবার কেউ বলেছেন, যেই আয়াতে কুফরির হুকুম এসেছে, তা মুসলিমদের জন্য; দ্বিতীয় যেখানে জুলুমের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা ইহুদিদের জন্য এবং তৃতীয়, যাতে ফিসকের হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা খ্রিষ্টানদের জন্য। যা আয়াতের পূর্বাপর থেকে স্পষ্ট। আবার কেউ সবগুলোর মধ্যে ব্যাপকতা করেছেন, যা হুজাইফার বক্তব্য দ্বারা শক্তিশালী হয়। এটা আব্দুর রাজ্জাক, ইবনে জারির ও হাকিম থেকে বর্ণিত এবং হাকিম তা সহিহ বলেছেন। এই দলটি আয়াতের দুটো ব্যাখ্যা করেছেন—

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বর্ণিত কুফর শব্দ দ্বারা রূপক অর্থে কাঠিন্য বোঝানো হয়েছে, শরয়ি অর্থে নয়, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এর পক্ষে দলিল হিসেবে তারা ইবনে মুনজির ও হাকিম থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এনেছেন, যাকে ইমাম

এটা শুধুই কাল্পনিক বিষয়, যার কোনো বাস্তবতা নেই। কারণ, এমন কোন মানুষ নেই, যে কোনো ফায়সালা গ্রহণ করে না। তবে যদি একেবারে ইচ্ছাশক্তিহীন বা কোনো কাজই করতে সক্ষম না হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কর্ম করছে, সে অবশ্যই নিজের মধ্যে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, যার ভিত্তিতে সে এই কাজটি করছে। এই বিধানটি যদি এমন হয়, যেখানে আল্লাহর আদেশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে, তাহলে সে মুসলিম আর যদি সে আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। উদাহরণস্বরূপ প্রয়োজনের খাতিরে আম দলিলের বিপরীত করা আল্লাহর বিধানের বিরোধী ফায়সালা হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা, আম দলিলের বিপরীত জরুরতের বিধান আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত নসেই বর্ণিত হয়েছে। তবে জরুরত অবশ্যই শরিয়তের নীতিমালার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। যাতে তা মানুষের প্রবৃত্তির খেলার বস্তুতে পরিণত না হয়; ফলে তা শয়তানের একটি ফাঁদ হয়ে যাবে।

৩৩৪. এটা তৃতীয় ভুল। কেননা, আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের বিপরীত শাসন করা কখনোই শুধু গুনাহ নয়, যা এখানের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। বিচারক হতে পারে কোনো আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ বা ঘুষ খেয়ে আল্লাহর আইনের বিপরীত ফায়সালা দিয়েছে অথবা সঠিক নিয়তের সাথে ভুল তাবিল করেছে, এসব অবস্থায় তার কাজটি গুনাহ হবে; কিন্তু যদি স্বয়ং আল্লাহর আইনের বিপরীত অন্য কোনো আইনকে উৎস বানায় অথবা মানুষের আইনকে আল্লাহর আইনের ওপর প্রাধান্য দেয়, এ দুটি অবস্থায় তা স্পষ্ট শিরক হবে।

tauhiderdak.com

বাইহাকি তার সুনানে সহিহ বলেছেন। ইবনে আব্বাস ﵄ এই তিনটি আয়াতের মধ্যে কুফরের ব্যাপারে বলেছেন, 'এটা সেই কুফর নয়, যার কথা তোমরা বলছ। এটা এমন কুফর নয়, যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়; বরং তা কুফর দুনা কুফর (ছোটো কুফর)।'[৩৩৫]

আবার কেউ বলেছেন, এখানে কুফরের জন্য একটি শর্ত রয়েছে, যা মূলত একটি সাধারণ মূলনীতি। তা হলো, কেউ যদি আল্লাহর বিধানের শাসনকে অস্বীকার করে বা এটাকে প্রত্যাখ্যান করে এই বিশ্বাসে যে, এটা জুলুম; অথচ সে জানে, এটা আল্লাহর বিধান অথবা এমন কোনো বিশ্বাসে, যা ইমান ও ইতাআতের সাথে একত্রিত হয় না, তাহলে সে কাফির হবে।

কেউ বলেছেন, কুফরের জন্য একটি শর্ত রয়েছে। তা হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে বা আল্লাহর আইনকে জুলুম মনে করে বিমুখ হয়ে এই বিধানে শাসন করবে না—যদিও সে জানে, এটা আল্লাহর হুকুম অথবা এমন কোনো বিষয় থাকে, যা তার ইমান ও আনুগত্যের সাথে একত্রিত হয় না—তাহলে কাফির হবে।[৩৩৬] এখানে যে সমস্ত প্রতিনিধি আইন তৈরি করে, তাদের ব্যাপারে সংশয় ও এর জবাব দেওয়া অনেক কঠিন। এটা চিন্তা করাও কঠিন যে, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অনুগত কোনো মুমিন বিশ্বাস করবে যে, তার কিতাবে তাকে কিছু বিধান ফরজ করে দিয়েছে, অতঃপর স্বেচ্ছায় তা পরিবর্তন করে অন্য কোনো বিধান প্রয়োগ করবে। কিতাবের বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে বা অন্য বিধানকে প্রাধান্য দিয়ে। আর একই

.....

৩৩৫. এখানে ইবনে আব্বাস ﵄ মাজলুম! তিনি এ কথাটি বলেছেন, যখন তাঁকে উমাইয়াদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করে না; সুতরাং তাদের ব্যাপারে হুকুম কী? অথচ কোনো আলিমই উমাইয়াদের কাফির বলেননি। কেননা, তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে শরিয়াহ দ্বারা শাসন করত। তবে তাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক কিছু বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা বা প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছুটা বিচ্যুতি হতো; কিন্তু তারা তাদের এই অবাধ্যতাকে আল্লাহর শরিয়তের বিপরীত আইন বা উৎস বানিয়ে ফেলেনি। তাই তাদের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ﵄ বলেছেন এটা এমন কুফর, যা কুফর থেকে নিম্ন। কিন্তু এমন শাসকের ব্যাপারে কি ইবনে আব্বাস ﵄ এই কথা বলতেন, যারা পূর্ণ শরিয়াহকে বিলুপ্ত করে এর পরিবর্তে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে?

৩৩৬. এই বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সুরা মায়িদার আয়াত নিয়ে। কেননা, সেখানে মুসলিম ইহুদি ও খ্রিষ্টান সমানভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে কেউ কেউ ধারণা করেছে যে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বিধান। অথচ এখানে প্রতিটি আয়াতে বলা হয়েছে (যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানে শাসন করবে না)। তাই এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে যা-ই হোক, এ বিষয়ে এটাই কুরআনের একমাত্র আয়াত নয়; বরং এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত রয়েছে, যাতে মতানৈক্যের কোনো সুযোগ নেই। যেমন সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং ২১; সুরা আন-নিসা, আয়াত নং ৬৫।

tauhiderdak.com

সাথে সে তার ইমান ও ইসলামের ওপর অবশিষ্ট থাকার বিশ্বাস করবে।[৩৩৭]

.....আমি বলি, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিধানের কিছু স্বয়ং দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ইবাদতের বিধান ও বিয়ে-তালাক। যা কোনোভাবে অমান্য করা বৈধ নয়। আর কিছু বিধান দুনিয়াবি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন শাস্তি, হদ ও নাগরিক আচরণবিধি।[৩৩৮] এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধান কম, অধিকাংশ ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল।[৩৩৯] আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হদ, এ ছাড়া বাকি সব শাস্তি শাসকের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া

.....

৩৩৭. এটা চতুর্থ ভুল। এখানে তাদের ইমানের ওপর দলিল দেওয়া বা তাদেরকে তাদের ইমানের ওপর দলিল দাবি করার পরিবর্তে—যেখানে এটাই স্পষ্ট যে আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করার কারণে কুফর হয়েছে—এখানে দলিলের ওপর যুক্তি দিয়ে এই সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, তারা মুমিন ও আল্লাহর দ্বীনের অনুগত। অতঃপর দলিলবিহীন এ সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে তারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর আইন পরিবর্তন করতে পারে এই কল্পনা করাও অসম্ভব বলে দিচ্ছে। যার ফলে স্বয়ং এই চতুর্থ ভুল থেকেই পঞ্চম ভুলের জন্ম নিয়েছে। তা হলো এই ধারণা করা যে, এসব মন্ত্রী-এমপি আল্লাহর বিধান পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে—যেহেতু স্বেচ্ছায় আল্লাহর আইন পরিবর্তন করা তাদের জন্য অসম্ভব—অথচ আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের শাসন করার জন্য শাসকরা কীভাবে বাধ্য হতে পারে? এ বাধ্যতা সঠিক হতে পারে শুধু এক অবস্থায়। তা হলো, কোনো মানুষকে তার ঘর থেকে জোর করে ধরে আনবে এবং ক্ষমতায় বসে কুফরি আইনে শাসন না করলে হত্যার হুমকি দেবে! এমতাবস্থায় সে হয়তো আল্লাহর কাছে মাফ পেতে পারে; যদিও এটি এমন ঘটনা, যা মানব ইতিহাসে কখনোই ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে ঘটা সম্ভব নয়। কেননা, শাসকরা স্বেচ্ছায় শাসনের সিংহাসনে বসে এবং সর্বদা যেকোনো কিছু প্রত্যাখ্যানের অধিকার রাখে। তাহলে কীভাবে বলা যায় যে, তারা বাধ্য। এখানে রশিদ রেজা যেসব শাসকের কথা বলছে, তারা বাস্তবে দুটি বড়ো অপরাধ করেছে। একটি হলো আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে। তারা তাঁর শরিয়াহকে বাতিল করে তদস্থলে জাহিলি আইন চালু করেছে, যা মানুষের বানানো। দ্বিতীয়ত তাদের প্রজাদের ব্যাপারে। তা হলো তারা তাদের আড়ালে রাখছে, যারা মূলত তাদের ওপর কুফরি আইন চাপিয়ে দিয়েছে। এভাবেই মূলত শত্রুরা এই উম্মাহর বিরোধিতা থেকে রক্ষার জন্য তাদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। যদি শাসকরা শত্রুদেরকে এভাবে ঢেকে রাখা থেকে বিরত থাকত, তাহলে অবশ্যই শত্রুদের ওপর ভয়াবহ হামলা হতো, যা আফগানিস্তানে ঘটেছে এবং সর্বশেষ বিজয় মুসলিমদেরই হতো। কিন্তু এখন শাসকদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে; তাই তাদের ব্যাপারে অসচেতন রয়ে গেছে। ফলে শত্রুরা যা ইচ্ছা দখল করে নিচ্ছে। অথচ শাইখ রশিদ রেজা এই সবকিছুকে হালকা করে দেখছেন। এমনকি তাকে কেবল গুনাহের গণ্ডিতেই আবদ্ধ করছে না; বরং তার কাজকে উম্মাহর স্বার্থে উপকার হিসেবে ঘোষণা করছে, যা সামনে আসবে!

৩৩৮. এটা ষষ্ঠ ভুল। কে বলেছে, হদ আল্লাহর হক নয়; বরং দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত?! কীসের ভিত্তিতে শাইখ বিয়ে-তালাক ও হদের মাঝে পার্থক্য করছেন? প্রথমটিকে বানাচ্ছেন দ্বীনের বিষয়, যা অমান্য করা বৈধ নয় আর দ্বিতীয়টিকে বানাচ্ছেন দুনিয়ার বিষয়। (শাইখের যুক্তি অনুযায়ী যার অমান্য করা বৈধ)।

৩৩৯. এটা সপ্তম ভুল। যদি এ বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত বিধানের পরিমাণ কম হয়, তাহলে এর ব্যাখ্যায় তো অনেক কিছু রয়েছে। কীভাবে রশিদ রেজার মতো একজন আলিমের পক্ষে এ ক্ষেত্রে শুধু কুরআনের কথা উল্লেখ করে সুন্নতে নববিকে ত্যাগ করা জায়িজ হতে পারে?! যেখানে এসব ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিধান রয়েছে। বরং কিছু ক্ষেত্রে সুন্নাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

tauhiderdak.com

রয়েছে সুদের শাস্তি। হাদিসে শত্রুভূমিতে হদ প্রয়োগে নিষেধ করা হয়েছে। অনেক ইমামগণ সেখানে সুদের বৈধতা দিয়েছেন; বরং আবু হানিফার মাজহাবে দারুল হারবে সকল প্রকারের বাতিল চুক্তি বৈধ বলেছেন।....[৩৪০]

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি যে, কাজায়াতের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধান অনেক কম।[৩৪১] তাই শাস্তিসম্পৃক্ত সবকিছু শাসকের ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল। এ ক্ষেত্রে (সংসদে বানানো) নাগরিক বিধানাবলি উত্তম; কেননা, এগুলো ইজতিহাদকৃত।[৩৪২] সুতরাং যেহেতু এসব ক্ষেত্রে কিতাবের অকাট্য বিধানের সংখ্যা কম এবং ন্যায়-ইনসাফ[৩৪৩] ও মাসলাহাত[৩৪৪] খুঁজে বের করা ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল; তাই আমরা মুসলিমদের মাসলাহাতের জন্য দারুল হারবে কোনো মুসলিমের শাসক হওয়া বৈধ বলেছি।[৩৪৫] এখান থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, মুসলিমদের

.....

৩৪০. এটা হচ্ছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ভুল। দারুল হারবে যুদ্ধকারী মুসলিমের ওপর হদ প্রয়োগ না করা; যাতে এর ফলে শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে শত্রুর সাথে মিলিত হতে উদ্বুদ্ধ করতে না পারে। এ বিধানের সাথে হিন্দুস্তান বা অন্য যেকোনো ভূমিতে আল্লাহর শাসন বাতিল করে জাহিলি আইনে মানুষকে শাসন করার সম্পর্ক কীভাবে হতে পারে?! কীভাবে যুদ্ধের সময় একজন মুসলিমের ওপর হদ প্রয়োগ না করার বিধানের দ্বারা সেই রাষ্ট্রে কুফরি আইন প্রচলনের বৈধতা দেওয়া যেতে পারে?! বরং সেখানে ইসলামি আইন প্রয়োগ করাকে ভুল সাব্যস্ত করা হতে পারে?! যদি আমরা এটা বলতাম যে, হিন্দুস্তানসহ অন্য যেকোনো ভূখণ্ডে মুসলিমরা জিহাদের মাধ্যমে কুফরি আইনকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়, সেখানে অনুগত হওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই, তাহলে এটা যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু যদি এটা বলা হয় যে, এমতাবস্থায় ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করা জায়িজ নয়, তাহলে আমি মনে করি, এটা এমন কথা, যা ইসলামের ইতিহাসে কেউ বলেনি।

৩৪১. এই বিষয়ে কুরআনে অবতীর্ণ বিধানের সংখ্যা কম হওয়ার যুক্তি, যার উত্তর আমরা দিয়েছি। কিন্তু এখানে নবম ভুল হলো, এমনটা ধারণা করা যে, যেহেতু এ সম্পর্কিত বিধান কম, তাই বিরোধিতা করতে সমস্যা নেই। আমরা যদি ধরে নিই যে, আল্লাহ তাআলা শুধু একটি বিধান নাজিল করেছেন আর বাকি সবকিছু ইজতিহাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তখন কি কোনো মুসলিমের এটা বলা জায়িজ হবে যে, যেহেতু সব বিধান ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল, তাই এই একটি বিধান ত্যাগ করে এখানেও ইজতিহাদ করে ফেলব?!

৩৪২. এটা দশম ভুল। কে তাকে এ রকম বিধানে শাসন করার বৈধতা দিল? নাকি কোনো মুসলিম যা কিছুই বাস্তবায়ন করবে, তা-ই কি বৈধ হয়ে যাবে; যদিও সেই ইংরেজদের বানানো হয়?

৩৪৩. আদল-ইনসাফের ব্যাপারে পূর্বে বলেছি যে, কোনো কিছু ন্যায়সংগত হওয়ার জন্য তা অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর নীতিমালার আলোকে হওয়া আবশ্যক।

৩৪৪. এখানেও সেই কথা, যা আদলের ব্যাপারে বলা হয়েছে। অর্থাৎ মাসলাহাত যদিও এর ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল, তবে অবশ্যই তা শরিয়তের নীতিমালার আলোকে হতে হবে।

৩৪৫. এই স্পর্শকাতর বিষয়ে তার কোনো শরয়ি দলিল নেই। দলিল ছাড়াই তিনি বৈধতার হুকুম দিয়েছেন শুধু মাসলাহাতের যুক্তি দিয়ে। অথচ আমরা বলেছি মাসলাহাত অবশ্যই শরিয়তের নীতির আলোকে হতে হবে। সুতরাং শরিয়তের নীতি অনুযায়ী না হলে কোনো আইন গ্রহণ করা বৈধ নয়।

tauhiderdak.com

উপকার ও মাসলাহাতে মানবরচিত আইনের শাসন করতে সমস্যা নেই।[৩৪৬] কিন্তু যদি এই আইন মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকর ও জুলুম হয়, তাহলে এই আইনের শাসন করবে না এবং এই আইনের অধীনে চাকরি করবে না।[৩৪৭]

মোটকথা, দারুল হারব ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠার স্থান নয়।[৩৪৮] তাই এখানে বাসকারীরা যথাসাধ্য ইসলামের বিধানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে, যার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা হওয়া।[৩৪৯] বিশেষ করে যদি সে প্রশাসন অন্য সকল জাতির তুলনায় ন্যায়ের নিকটবর্তী হয়, যেমন ইংরেজ প্রশাসন।[৩৫০]... হিন্দুস্তানে মুসলিমদের এই অধঃপতন ও মূর্তিপূজকদের থেকে পিছিয়ে থাকার কারণ হলো তারা প্রশাসনিক চাকরি থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।[৩৫১] (ফতোয়া সমাপ্ত)

যখন আলিমের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মানুষকে কুফরি শাসনের আনুগত করবে এবং তা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আবশ্যকীয় জিহাদ থেকে বিরত রাখবে। নিজেরা এগিয়ে এসে মানুষকে সত্য বিষয়গুলো জানাবে না, যা আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসুলে বর্ণিত হয়েছে। অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সত্যের আদেশ ও মন্দের নিষেধ করবে না, যাতে হক প্রতিষ্ঠিত হয়; যদিও তারা বিপদের সম্মুখীন হোক... এ ছাড়াও তারা মানুষকে বাস্তব তাওহিদ শিক্ষা দেবে না—যা আল্লাহ তাআলা আকিদা, শরিয়াহ ও ফরজ ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করে নাজিল করেছেন। এবং মানুষ যে অনৈসলামিক পরিবেশে বাস করছে, তার সঠিক ইসলামি চিত্র তুলে ধরবেন না এবং তা থেকে মুক্তির উপায় বলে দেবেন না...

.....

৩৪৬. এখানে আবারও তিনি আল্লাহর আইন ছাড়া কুফরি আইনে শাসন করার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে দলিল ছাড়া হুকুম দিয়ে দিচ্ছেন। তিনি নিজের দলিলহীন পূর্বের মতের ভিত্তিতে এখানে বলে দিচ্ছেন যে, দারুল হারবে কোনো মুসলিমের শাসক হতে সমস্যা নেই।

৩৪৭. কিন্তু প্রশ্ন হলো এটা জুলুম কি না, তা কে নির্ধারণ করবে? যিনি মাসলাহাত নির্ধারণ করবেন, তিনিই জুলুম নির্ধারণ করবেন। আর তিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ তাআলা। যিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা শাসন করবে, সে কাফির।' সুতরাং এখানে কার এমন দুঃসাহস আছে, যে বলবে, কুফরি আইন কিছু ক্ষেত্রে জুলুম আর কিছু ক্ষেত্রে উপকারী?

৩৪৮. একই কথা সাইয়িদ আহমাদ খান-সহ অন্যান্য অনেক ভ্রান্তরা বলেছে।

৩৪৯. পূর্বেই বলেছে যে, দারুল হারব ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠার জায়গা নয়, যাতে মুসলিমদেরকে কাফির-মুরতাদ শাসকদের অনুগত করানো যায়। অতঃপর যখন মুসলিমরা সরকারি চাকরি নেওয়া শুরু করেছে, তখন আবার বলছে যে, তাদেরকে অবশ্যই এসব চাকরি নিতে হবে; যাতে ইসলামি আইনকে শক্তিশালী করা যায়। এটা কী ধরনের দ্বিমুখিতা?!

৩৫০. এখানে মন্তব্যের কোনো প্রয়োজন নেই।

৩৫১. অথচ ইংরেজ সরকারই মুসলিমদেরকে সরকারি চাকরি থেকে বাধা দিয়েছে, যাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, এটা ন্যায়ের নিকটবর্তী।

tauhiderdak.com

অন্যদিকে যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে তৈরি সেক্যুলার নেতারা জাতির নেতৃত্বের আসনে উঠে আসবে। তারা জনগণের অধিকারের পক্ষে কথা বলবে, অত্যাচারী শাসকের সামনে দাঁড়াবে, জাতিকে তাদের মন্দ অবস্থা থেকে মুক্তির আহ্বান করবে এবং তাদেরকে স্বাধীনতা উন্নতি ও সভ্যতার পথ দেখাবে...

যখন আলিম ও সেক্যুলারদের অবস্থা এমন হবে, তখন কি আমরা জনগণের ধর্মহীন নেতাদের পেছনে ছুটতে শুরু করা এবং তাদের দ্বারা কঠিনভাবে প্রভাবিত হতে দেখে আশ্চর্য হব?

আমাদের এসব কথা জনগণের অবস্থার বৈধতা দেওয়ার জন্য নয়; বরং শুধু তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য। কেননা, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা আমাদের নেই। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ - وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

> 'বরং মানুষ নিজেই তার সবকিছু দেখতে পাবে; যদিও সে তার (খারাপ কাজ ঢাকার জন্য) অজুহাত পেশ করতে চাইবে।'[৩৫২]

যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দেবে, সবাই আল্লাহর সামনে মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা এবং তাদের ভ্রষ্ট কার্যক্রমের জন্য জিজ্ঞেসিত হবে।

তবে দায়িত্বের ক্ষেত্রে সবাই সমান নয়। প্রথমে শাসক, অতঃপর আলিমগণ, আর সর্বশেষ আসবে জনগণের পালা।

.....

৩৫২. সুরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত নং ১৪-১৫।

tauhiderdak.com

ইউরোপীয় সংবিধান ও মূলনীতি আমদানি

পতনকালে মুসলিম-সমাজে ভয়াবহ এক পরিণতি ঘটে, যা তখন থেকেই এই উম্মাহর জীবনের একটি অংশ হয়ে যায়। তা হলো, মুসলিমদের জন্য সংবিধান ও মূলনীতি ইসলামের শত্রুদের থেকে ধার করে আনা।

এ বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে খারাপ ও ক্ষতিকর ছিল। এটাই ছিল উম্মাহর জীবনের প্রথমবার, যখন তারা ইসলামের বাইরে থেকে আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আইন আমদানি করেছে।

মুসলিমদের ইতিপূর্বেও প্রশাসনিক কার্যক্রম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালনা করা এবং বস্তুগত উন্নতির লক্ষ্যে বহু কিছুর প্রয়োজন হয়, যা তাদের রাষ্ট্রকে আবশ্যকীয় উপযুক্ত দক্ষতার সাথে উন্নতি করার জন্য দরকার ছিল।

তখন তারা এসব নিয়ম-শৃঙ্খলা ও গঠনাবলি পারস্য ও বাইজেন্টাইন থেকে গ্রহণ করেছে; কিন্তু এই গ্রহণের ফলে তাদের মাঝে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। কারণ, এই গ্রহণের বিষয়টা দুটি মূলনীতির ভিত্তিতে হয়েছে,

প্রথমত, এ উম্মাহ তখন শত্রুদের থেকে সভ্যতার প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণের সময় নিজেদের তুচ্ছ বা পরাজিত মনে করেনি; বরং তারা ইমানের বলে বলীয়ান হয়ে নিজেদের মর্যাদাবান ভাবত।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

> 'তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং বিষণ্ন হয়ো না। (প্রকৃত) ইমানদার হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[৩৫৩]

অর্থাৎ তারা মুমিন এবং শত্রুরা কাফির হওয়ার ফলে। কারণ, মুমিনদের অর্থনৈতিক বা সামরিক অবস্থা যেমনই হোক, তার ইমানের কারণে সে সর্বদা ওপরে থাকে। অন্যদিকে কাফিররা তাদের কুফরি ও রবের হিদায়াত থেকে বিমুখতার কারণে নিকৃষ্ট

৩৫৩. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৩৯।

tauhiderdak.com

থাকবে, তাদের বস্তুগত ও সামরিক শক্তি যত বেশি হোক। সুতরাং মুমিনরা এসব সভ্যতার উপাদান এর মালিকদের কাছ থেকে নিচ্ছে তাদের সামনে মানসিকভাবে অনুগত হওয়া ও শত্রুকে বড়ো ভাবা ব্যতীত। কেননা, তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে থেকে এই মর্যাদার উপযুক্ত নয়।

দ্বিতীয়ত, এ উম্মাহ তাদেরকে গ্রহণের সময়ে শুধু তা-ই গ্রহণ করেছে, যা তাদের প্রয়োজন ছিল। তারা শত্রুর কাছে সভ্যতার যত নিয়মনীতি ও বস্তুগত উপকরণ ছিল সব গ্রহণ করেনি; বরং শুধু সেগুলো নিয়েছে, যার প্রতি তারা প্রয়োজন অনুভব করেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, যখন তারা এসব নিয়মনীতি বা বস্তুগত উপকরণ গ্রহণ করেছে, তখন এসবের সাথে মিশ্রিত থাকা আদর্শ-বিশ্বাস গ্রহণ করেনি। কারণ, তাদের আদর্শ ও নিয়মনীতি জাহিলি চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা কখনো একজন মুসলিমের জন্য উপযুক্ত নয়। আর মুসলিমদের জন্য এর কোনো প্রয়োজনও নেই। কেননা, তাদের ধর্ম এসব থেকে অমুখাপেক্ষী; বরং তাদেরকে এসব গ্রহণ না করার আদেশ করা হয়েছে। অন্যথায় তা হবে জাহিলিয়াতে প্রত্যাবর্তন।

অন্যদিকে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রের নীতিমালা আইন-বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। আর মুসলিমদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও থেকে আইন গ্রহণ করা চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না, তারাই কাফির।'[৩৫৪]

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ

'নাকি তাদের কতিপয় শরিক (তাগুত) আছে, যারা তাদের জন্য এমন কোনো দ্বীন প্রবর্তন করে দিয়েছে, আল্লাহ যার অনুমতি দেননি?'[৩৫৫]

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ

৩৫৪. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৪৪।
৩৫৫. সুরা আশ-শুরা, আয়াত নং ২১।

tauhiderdak.com

> 'আর আপনি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে তাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন, তাদের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দেবেন না এবং তাদের থেকে সাবধান থাকবেন; যাতে তারা আপনাকে আল্লাহর নাজিলকৃত কতিপয় বিধান থেকে দূরে সরাতে না পারে।'[৩৫৬]

কাফিরদের আদর্শ ও মূল্যবোধ হয়তো আল্লাহ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের অনুরূপ হবে। মুসলিমরা যা শুধুই আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রহণ করে, অন্য কোনো উৎস থেকে নয়। কিন্তু যদি তা আল্লাহর নাজিলকৃত বিষয়ের বিপরীত হয়, তাহলে তো তা গ্রহণ করা কুফরি, অবাধ্যতা ও ফিসক।

সুতরাং কোনো মুসলিম সভ্যতার উপকরণের শুধু সেগুলোই গ্রহণ করবে, যা তাদের জন্য প্রয়োজন। যেমন সেসব সাংগঠনিক ও বস্তুগত উন্নতির মাধ্যম, যেগুলো ইসলামের বিশ্বাস ও জীবনবিধান বিরোধী কোনো আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। অন্যদিকে মুসলিমরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়মনীতি এবং মানবিক আদর্শ-মূল্যবোধ কাফিরদের থেকে গ্রহণ করে না। কেননা, এগুলো দ্বীনের অংশ, যা একজন মুসলিম শুধুই তার রবের কাছ থেকে গ্রহণ করে।

কিন্তু শেষ যুগে এসে গ্রহণের সময় তাদের আত্মিক, মানসিক ও বিশ্বাসগত অধঃপতন এবং কুফফারদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের ফলে তাদের সীমানা-প্রাচীর ভেঙে পড়ে। ফলে তখন তারা পশ্চিমাদের থেকে সভ্যতার উপকরণ থেকে কী গ্রহণ করা উচিত এবং কী ছাড়া উচিত, তা পার্থক্য করতে সক্ষম হয়নি।

এটা সত্য যে, তারা বহু ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের থেকে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু স্বয়ং পশ্চিমারাও তো তাদের সব প্রয়োজনীয় জিনিসের অধিকারী ছিল না; বরং তাদেরও এমন অনেক বিষয় ছিল, যেখানে তারা হোঁচট খেয়েছে। কিন্তু পশ্চিমাদের বস্তুগত শক্তির বিশালতার ফলে এই ঘাটতি দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়নি।

নিঃসন্দেহে পশ্চিমা বিশ্বে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি ঘটেছে, তাদের শৃঙ্খলাপদ্ধতি অনেক চমৎকার, কর্ম ও অবদানে তাদের ধৈর্যশক্তি অনেক বেশি, যেকোনো বাধার মুখে তাদের টিকে থাকার মানসিকতা রয়েছে; চাই গবেষণার ক্ষেত্রে হোক বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। এ সবই মুসলিমদের জন্য চূড়ান্তভাবে আবশ্যক ছিল। কেননা, তারা এসব ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল; অথচ পূর্বে তারা সর্বক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল,

.....

৩৫৬. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৪৯।

tauhiderdak.com

যখন তারা ইসলামকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল।

মুসলিমদের জন্য আবশ্যক ছিল তাদের থেকে এসব কিছু শিক্ষা ও আত্মস্থ করার জন্য কঠিন মেহনত করা। কেননা, এটা তাদের জন্য প্রয়োজন ছিল।

একই সাথে পশ্চিমাদের মাঝে বহু মানসিক, চিন্তাগত ও চারিত্রিক ভ্রষ্টতা ছিল। যা কোনো বুদ্ধিমান মানুষের জন্যই গ্রহণ করা উচিত নয়, সেখানে একজন মুসলিম তা গ্রহণ করা তো অনেক দূরের ব্যাপার। যাকে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ নিয়ামত দান করেছেন এবং তার জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাকে এক পবিত্র, দৃঢ়, স্বচ্ছ, সুউচ্চ, সব ধরনের মন্দ ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন।

তেমনই পশ্চিমাদের নিকট যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আইন-বিধান রয়েছে, তাতে ভালো-মন্দের মিশ্রণ রয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ সবই আল্লাহর বিধানের বিপরীত আইন, যা কুফরি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যা হলো, মানুষকে রব ও সৃষ্টিকর্তার গোলাম বানানোর পরিবর্তে অপর মানুষের গোলাম বানানো, তাদের প্রণীত আইনের আনুগত্যের মাধ্যমে। তাই এটা জাহিলিয়াত। যদিও এর আংশিক কিছু বিষয় আল্লাহর নাজিলকৃত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন কিছু অধিকার ও দায়িত্ব। তবে একজন মুসলিম এগুলো শুধুই তার রবের বিধান থেকে গ্রহণ করবে, অন্য কোনো উৎস থেকে নয়।

এই আলোচনা থেকে একজন মুসলিমের সামনে পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে অবস্থান কী হবে, তা স্পষ্ট হয়। তা হলো, তাদের সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, বস্তুগত অগ্রগতি, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, কঠোর কর্মপ্রচেষ্টা, গবেষণা ও বাস্তবায়নের আগ্রহ—এসব কিছু গ্রহণ করবে এবং এসব ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। এ ছাড়া বাকি সবকিছু ত্যাগ করবে এবং তা থেকে সতর্ক থাকবে।

কিন্তু বাস্তবে উলটোটা ঘটেছে। তারা বিভিন্ন উপকারী বিষয় গ্রহণ করেছে ঠিক, তবে তা হয়েছে ধীরগতিতে। অন্যদিকে মন্দ বিষয়ের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেছে এবং এমনভাবে সেগুলো আয়ত্ত করে নিয়েছে, যেন এগুলো তাদের জন্য পাথেয়। তাদের কুফরি আইনের এমনভাবে অনুকরণ করেছে; যার ফলে আল্লাহর বিধান পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

এটাই হলো, তখনকার মুসলিমদের বাস্তব অবস্থার বর্ণনা।

tauhiderdak.com

তারা তাদের গাফিলতি ও জাহালাতের ফলে ধারণা করেছে, পশ্চিমা সভ্যতা হচ্ছে একটি একক বস্তু। যা পুরোটাই গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় কিছু গ্রহণ করে কিছু ছেড়ে দিলে কোনো ফায়দা নেই। এটাই পশ্চিমা চিন্তার দিকে আহ্বানকারীরা মানুষকে বুঝিয়েছে। যারা হয়তো ইহুদি-খ্রিষ্টান বা তাদের দোসর। তাদের এই স্লোগান দুর্বল মুসলিমদের মাঝে অনেক সাড়া ফেলে।

এখানে ইহুদি ও খ্রিষ্টান পশ্চিমা আহ্বায়কদের স্বার্থ স্পষ্ট। তারা মুসলিমদের এই বুঝ দিতে চায়, কারণ এটা তাদেরকে পশ্চিমাদের গোলাম বানানোর ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। এবং যা তাদের পূর্ণ আনুগত্য ও ইসলাম থেকে পূর্ণরূপে দূরে সরানোর জন্য যথেষ্ট। যে ইসলামকে তারা সবচেয়ে বেশি ভয় ও ঘৃণা করে। যখন মুসলিমরা তাদের দ্বীনের বিশ্বাস, কার্যক্রম, চিন্তাধারা, আখলাক, শাসনব্যবস্থা ও রীতিনীতিসহ সব মূল উপাদান থেকে বিচ্যুত হবে, তখন তাদের মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কিছুই বাকি থাকবে না এবং তাদের মাঝে কোনো প্রতিরোধশক্তি থাকবে না। তাদেরকে পূর্ণ মানসিক গোলাম বানিয়ে ফেলা যাবে। আর এটাই তাদেরকে সামরিকভাবে দমন করে রাখা থেকে অধিক কার্যকরী ও দীর্ঘস্থায়ী।

সাম্রাজ্যবাদীরা সামরিকভাবে দমনের নীতি এত দিন ফলো করেছে; কিন্তু এর ফলাফল সর্বদা নিশ্চিত নয়। কেননা, স্বয়ং তাদের উপস্থিতি পরাজিতদের উত্তেজিত করে একের পর এক বিদ্রোহের দিকে ধাবিত করে। কিন্তু যদি পরাজিত ও মানসিকভাবে গোলাম হয়ে যায়, তাদের আত্মপরিচয় বিলীন হয়ে যায় এবং সর্বদা এই অনুভূতি কাজ করে যে, তারা বিজয়ী শক্তির অনুগত, তাহলে ইহুদি-খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যবাদীরা অধিক নিরাপদ থাকবে এবং দীর্ঘ সময় অবস্থানের স্বপ্ন দেখবে; এমনকি তারা সে রাষ্ট্র থেকে বের হয়ে গেলেও তাদের সেনারা ভূমি দখল করে রাখবে।[৩৫৭]

আর তাদের মধ্যে অনেকেই নিজেকে স্বার্থের বিনিময়ে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সেই স্বার্থ হোক ক্ষমতা বা প্রসিদ্ধি বা হারাম মাল অথবা কুপ্রবৃত্তি পূরণ; তারা সর্বদা এর বিনিময়ে শত্রুদের দেওয়া দায়িত্ব পালন করে। সেই দায়িত্ব হলো, মুসলিমদেরকে ইহুদি-খ্রিষ্টান প্রভুদের গোলাম বানানো। এ কাজে তাদের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে, মুসলিমদের এটা বলা যে, তারা যেন পশ্চিমা অসভ্যতার

.....

৩৫৭. এ জন্যই ক্রোমার বলেছে, 'সাদা ব্যক্তিরা, যাদেরকে প্রভুর দয়ায় দেশে বসানো হয়েছে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সর্বোচ্চ সাধ্য দিয়ে খ্রিষ্টান সভ্যতার ভিতকে মজবুত করা; যাতে এটাই মানুষের মাঝে সম্পর্কের মূল ভিত্তি হয়ে যায়।'

tauhiderdak.com

ভালো-মন্দ-টক-মিষ্টি সব গ্রহণ করে। আবার তাদের মধ্যে অনেকে আছে, নিঃস্বার্থ গোলামি করে। তারা মানসিকভাবে পরাজয়ের ফলে এসব কাজ করে। তারা আত্মিক পরাজয়ের ফলে ধারণা করে যে, সে পশ্চিমাদের আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে মুসলিমদের সামনে সমস্যা থেকে মুক্তির পথ বাতলে দিচ্ছে। আর এভাবেই সর্বশেষ ভাড়াটে এজেন্ট ও গাফিল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার পরিণতি সমান হয়ে যায়।

অন্যদিকে দুর্বল মুসলিমদের মাঝে তাদের আহ্বান অনেক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। যার কারণ দুটি, প্রথমত, পরাজিতরা বিজয়ীদের অনুকরণের দিকে ধাবিত হয়, যা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত বিষয়। দ্বিতীয়ত, পরাজিত দুর্বলদের জন্য অনুকরণ করাই সহজ; কারণ এটা তাদেরকে যাচাই-বাছাই করার কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আর যাচাই-বাছাই করার কাজ মূলত দুর্বল গোলামরা করে না; বরং এটা করে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনিবরা।

সুতরাং মুসলিমদের আকিদাগত অধঃপতন ও আত্মিক শূন্যতার ফলে, এই পরাজিত মানসিকতার কারণে তাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার এই আদেশ বাস্তবায়িত হয়নি—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

> 'তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং বিষণ্ণ হয়ো না। (প্রকৃত) ইমানদার হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।'[৩৫৮]

পশ্চিমা সভ্যতার ভালো-মন্দ-টক-মিষ্টি সব গ্রহণ করার স্লোগান ছিল মূলত বাতিল। কেননা, বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে চারিত্রিক অধঃপতনের কোনো সম্পর্কই নেই। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বলবে না যে, মানুষ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য চারিত্রিকভাবে খারাপ হতে হবে। মূলত ইউরোপে এসব ভ্রষ্ট চিন্তাধারা জন্ম নিয়েছে ভিন্ন কিছু কারণে। তা হলো, পূর্বে সেখানে গির্জা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্র থেকে গির্জার নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত করা ছাড়া বিজ্ঞানের উন্নতির আর কোনো পথ ছিল না। পরবর্তী সময়ে মানুষের জীবন থেকে গির্জার প্রভাব এবং জাহিলি বিকৃত ধর্ম, যা মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, এর নিয়ন্ত্রণ যখন শিথিল হয়ে যায়, তখন বিজ্ঞানের উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু এর বিপরীতে ইউরোপ যখন আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ছুড়ে ফেলেছে এবং ধর্মের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে, তখন তার মানবিক বৈশিষ্ট্য ও আখলাক-চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের

৩৫৮. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৩৯।

tauhiderdak.com

মস্তিষ্কে মানুষের মতো আচরণ, জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদির ব্যাপারে পশুর মতো চিন্তা জন্ম নেয়। এর ফলে তাদের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। বুদ্ধিমানরা যে বিপদ আগেই টের পেয়ে মানুষকে সতর্ক করেছে। আর অন্যরা তা বাস্তবে ঘটার পর দেখতে পেয়েছে। ফলে তারা এখন নিজেদের জন্য মুক্তির পথ খুঁজছে।

পুরো বিশ্বে ইউরোপীয়দের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তারা এই ভয়াবহ মানবিক ও চারিত্রিক অধঃপতনে নিমজ্জিত। এটা আল্লাহ তাআলার এক নীতির বাস্তবায়ন, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

'তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের সামনে প্রতিটি (আনন্দের) জিনিসের দরজা খুলে দিলাম। এভাবে তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা নিয়ে আনন্দিত, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করি। তখনই তারা নিরাশ হয়ে যায়।'[৩৫৯]

একই সময়ে এখানে অন্যান্য ইলাহি নীতিরও বাস্তবায়ন ঘটছে, যার মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই; বরং সবগুলো সম্মিলিতভাবে ঘটছে,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যারা দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য চায়, আমি তাদেরকে সেখানে তাদের কাজের পুরোপুরি ফল দিয়ে থাকি, সেখানে তাদেরকে (কোনো কিছু) কম দেওয়া হয় না। ওদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছু নেই। এখানে তারা যা কিছু করেছে, তা নিষ্ফল হয়েছে এবং তারা যেসব কাজ করত, তা বাতিল।'[৩৬০]

৩৫৯. সুরা আল-আনআম, আয়াত নং ৪৪।

৩৬০. সুরা হুদ, আয়াত নং ১৫-১৬।

tauhiderdak.com

এভাবেই তারা তাদের শত অনিষ্টতা সত্ত্বেও জমিনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কারণ তাদের অনিষ্টতা নয়; বরং তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের ইতিবাচক প্রচেষ্টার ফলে, যেগুলো তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যয় করেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নীতি অনুযায়ী দুনিয়ায় তাদের প্রতিদান দিয়েছেন। অতঃপর সর্বশেষ তাদেরকে আবারও সেই নীতি অনুযায়ী ধ্বংস করবেন; কারণ তারা তাঁর পথে প্রতিষ্ঠিত নয়।

এটাই হচ্ছে ইউরোপের ইতিহাস।

তা ছাড়া বিজ্ঞান ও বস্তুগত উন্নতির জন্য ধর্ম ও চরিত্র ত্যাগ করার আবশ্যকীয়তার দাবি হচ্ছে চরম পর্যায়ের মিথ্যা, যার কোনো অস্তিত্ব নেই; বরং এটা সেসব গোলাম মেনে নিয়েছে, যাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মাধ্যমে অনুগত করা হয়েছে। ফলে তারা রবকে ভুলে গেছে এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

> ‘তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে; যার ফলে আল্লাহও তাদেরকে তাদের নিজেদের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য।’[৩৬১]

যার ফলে পশ্চিমা এই স্রোত, যা মানুষের জীবনকে পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে তোলার আহ্বান করত, তা সব বিষয়ে ইউরোপের অনুকরণের দিকে নিয়ে যায়। ফলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি ও বস্তুগত উন্নতিতে তাদের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই পা পিছলে যায়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও বস্তুগত উন্নতি অনেক ধীর হয়ে যায়, যা বারবার হোঁচট খাচ্ছিল। ফলে যেই অগ্রগতি মুখলিস ব্যক্তিরা আশা করেছিল এবং যদি উম্মাহ চারিত্রিকভাবে অধঃপতনে না ডুবে তাদের সব সংকল্প একত্রিত করে চেষ্টা করত, তাহলে যে উন্নতি হওয়া সম্ভব ছিল, তেমনটা হয়নি। অন্যদিকে জাপানিরা যখন তাদের উন্নতির সংকল্প করেছে, তখন পশ্চিমাদের সব জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করেছে; এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তাদের ডিঙিয়ে গেছে, তবে নিজেদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাস পরিবর্তন করা ব্যতীতই (যদিও তা ছিল পৌত্তলিক জাহিলি বিশ্বাস)। অথচ মুসলিমরা আকিদাগত বিচ্যুতি ও আত্মিক শূন্যতার শিকার না হলে তারাই এমন উন্নতির অধিক যোগ্য ছিল।

.....

৩৬১. সুরা আল-হাশর, আয়াত নং ১৯।

tauhiderdak.com

মূলকথা, শত চেষ্টা করার পরেও বিস্তৃত পরিসরে বিজ্ঞান ও বস্তুগত ক্ষেত্রে ব্যর্থতা রয়ে যায়। সেই সাথে মুসলিম-বিশ্বে চারিত্রিক ও ধর্মীয় ভ্রষ্টতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, এটাই তাদের চরিত্র হয়ে যায়। অতঃপর এ দুটোর সাথে যুক্ত হয় ইউরোপ থেকে আইন ও আদর্শ আমদানি করে তা মুসলিম উম্মাহর জীবনে বাস্তবায়ন করা। এবং এতে কোনো সমস্যা বা অপরাধ মনে না করা বা এই কাজকে দ্বীনের বিরোধিতা বা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণ মনে না করা।

মুসলিম-জাতির এ অবস্থায় পৌঁছার কারণ ছিল তাদের স্বভাবজাত মূল উৎস ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে ইউরোপীয় পশ্চিমা সভ্যতা তাদের জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া। যে বিচ্যুতি কোনো শিথিলতা ও বাধাহীনভাবে প্রায় ২০০ বছরের অধিক সময় ধরে চলমান থাকে; বরং এর তীব্রতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উম্মাহকে রাজনৈতিকভাবে ধ্বংসের জন্য পশ্চিমাদের প্রচেষ্টা দুটি ধাপে বিভক্ত; যদিও দ্বিতীয় ধাপটি প্রথম ধাপের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল। কারণ, যদি প্রথম ধাপের কার্যক্রম না হতো, তবে দ্বিতীয় ধাপে তাদের কাজের রাস্তা খোলা থাকত না।

প্রথম ধাপটি সামগ্রিকভাবে ২য় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত, যে সময় ক্রুসেড শক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের হাতে। এ সময় এই দুটি শক্তি মূলত ইসলামের সাথে যুদ্ধ ও মুসলিম উম্মাহকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টায় নেতৃত্ব দিত। দ্বিতীয় যুগ শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন ইহুদি-খ্রিষ্টান শক্তির নিয়ন্ত্রণ আসে আমেরিকার হাতে। তখন তারা ইসলামের সাথে যুদ্ধের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়; যদিও এ যুদ্ধে সর্বদাই সকল শত্রু একজোট ছিল, প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এই যুদ্ধ করে যেত।

প্রথম ধাপে তাদের আগ্রাসন ও চক্রান্তের মাধ্যম ছিল জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র। যে চক্রান্ত বাস্তবায়ন করত দেশীয় রাজনৈতিক দলগুলো, যাদেরকে পশ্চিমারা তাদের স্বার্থ বাস্তবায়ন ও পুরো জাতিকে পশ্চিমাকরণের লক্ষ্যে তৈরি করেছিল।

এ ধাপে তারা ইসলামের সাথে হিংস্র রক্তাক্ত যুদ্ধ করেনি; যদিও শেষ দিকে কিছুটা হয়েছে। এ সময় তাদের যুদ্ধ ছিল ধীরপন্থায় (তবে যা নিশ্চিত কার্যকরী)। যেখানে মাধ্যম ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন, শিক্ষা-সিলেবাস ও মিডিয়া, নারীকে রাস্তায় বের করে এনে তাদের চরিত্র নষ্ট করা এবং তাকে নিজের ও পুরুষের জন্য ফিতনার কারণ বানানো, আল্লাহর আইন বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন ও তাদেরকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করে মানুষকে এটা বুঝিয়ে দেওয়া যে, এটা হচ্ছে একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান...

tauhiderdak.com

ইত্যাদি বিষয়গুলো আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি।

এ সময় চক্রান্তকারীরা দ্বীনের ওপর সরাসরি আক্রমণ করেনি; বরং তারা প্রাচীন মধ্যযুগীয় প্রথার নামে আক্রমণ করত। যার মাধ্যমে একই সাথে ইসলামকে ধীরে ধীরে সংকুচিত করে ফেলা হয় এবং একসময় তা মানুষের জীবনের বাস্তবতা থেকে পূর্ণরূপে বের হয়ে শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরিণত হয়।

যখন ইসলামি শরিয়াহ-শাসন বিলুপ্ত হয়, তখন মানুষ আবেগি হয়ে বলতে থাকে, এটা কুফর। তখন মানুষকে বলা হয়, ইসলামি শরিয়াহর শাসন বিলুপ্তি হলেও সমস্যা নেই (কারণ, এটা শাসকের জন্য ইজতিহাদ)। তবে তোমরা মুসলিম থাকবে, যতদিন তোমরা নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ পালন করবে।

অতঃপর শাসকদের মাধ্যমে উম্মাহর ওপর শয়তানি বিভিন্ন মাধ্যম যেমন নারী-ইস্যু, প্রচার-মিডিয়া, নাটক-সিনেমা ইত্যাদি দ্বারা মানুষকে ধারাবাহিকভাবে নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ থেকেও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাদের বলা হয়, যদিও তোমরা নামাজ পড়ো না, রোজা রাখো না; কিন্তু এতে সমস্যা নেই। তোমরা মুসলিম থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা শুধু মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলছ।

মানুষকে এই ধারণা দেওয়া হয়, তোমরা আল্লাহর শরিয়াহর শাসন এবং ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন না করেও এখনো মুসলিম আছ। যার ফলে ইসলাম তার বাস্তবতা থেকে পরিবর্তিত হয়ে পশ্চিমা গির্জার ধর্মের মতো হয়ে যায়, যেখানে বান্দার সাথে রবের শুধু আত্মিক সম্পর্ক থাকবে, বাস্তব জীবনে যার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে এই অবস্থা তৈরির জন্য শক্তিশালী এক চিন্তার দরকার ছিল।

শত্রুরা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে ইরজায়ি চিন্তার ওপর। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই ইরজায়ি চিন্তাধারা পশ্চিমা ক্রুসেড যুদ্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের পূর্বে কখনো ইসলামি শরিয়াহর শাসন ও নামাজ ত্যাগ করা পর্যন্ত পৌঁছেনি। কেননা, মুসলিমরা তাদের শত দুর্বলতা সত্ত্বেও কখনো আল্লাহর শরিয়াহর বাস্তবায়ন বা নামাজ আদায় করা ব্যতীত নিজেদের মুসলিম হিসেবে কল্পনা করত না।

তবে সর্বাবস্থায় মুসলিমদের সামনে পিচ্ছিল গিরিখাত ছিল এবং পেছন থেকে কোনো ধাক্কা খেলেই তাতে পতিত হওয়ার উপক্রম ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন এসে এই ধাক্কাটি দেয়। ফলে মুসলিমরা এই খাদে পতিত হয়, যেখানে ইরজায়ি চিন্তাধারা তাদেরকে আরও গভীরে ঠেলে নিয়ে যায়।

tauhiderdak.com

এর শুরু হয় পশ্চিমাদের গড়া সেসব বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে, যারা পত্রপত্রিকায় বলত, ধর্ম হচ্ছে অনেক মর্যাদাপূর্ণ বিষয়, তবে এর স্থান শুধুই অন্তর। একে রাজনীতির সাথে মিশ্রিত করা উচিত নয়। কেননা, রাজনীতি হচ্ছে নিকৃষ্ট, তাই ধর্মকে রাজনীতি দ্বারা নোংরা করা উচিত নয়।

কিছু নামধারী আলিম এসে বলে, আল্লাহ তাআলা রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের লানত করেছেন। আর কিছু ব্যক্তি বলে, ধর্ম আল্লাহর জন্য, রাষ্ট্র সবার জন্য।[৩৬২]

দ্বীনের বিচ্যুতি ও সংকোচন হয়ে একসময় আধুনিক শিক্ষিতদের কাছে এই দ্বীন পশ্চিমা গির্জার মতো ধর্মে পরিণত হয়। যেখানে বান্দা ও রবের মাঝে সম্পর্ক হবে শুধুই অন্তরে, বাস্তব জীবনের এর কোনো প্রভাব থাকবে না। তারা বলতে শুরু করে, দ্বীনের সাথে রাজনীতির কী কাজ? দ্বীনের মধ্যে আবার অর্থনীতি কী? দ্বীনের সাথে সামাজিক বিষয়ের কী সম্পর্ক? দ্বীনের সাথে নারীর পোশাক ও চাকরির কী সম্পর্ক? ইত্যাদি জীবনের সব বিষয়ের সাথে দ্বীনের কী সম্পর্ক?

তারা সর্বদাই ইউরোপের ঘটনা দ্বারা দলিল দিত।

কারণ, সেখানে সব বিষয়ে ধর্মীয় ব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ করত; তাই তাদের জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। সর্বত্র জুলুম ছড়িয়ে পড়ে, যা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের অবস্থা। অতঃপর ধর্মীয় ব্যক্তিরা যখন দুনিয়ার জীবনের সব বিষয়ে অনুপ্রবেশ করা থেকে বিরত থাকে, তখন সার্বিক অবস্থা স্থিতিশীল হয়। ইউরোপ উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে সভ্যতার উন্নতি ও আধুনিকায়ন ঘটে।

ইউরোপের সাথে তুলনার জন্য তারা ইসলামেও ধর্মীয় যাজক শ্রেণি আছে দাবি করে মানুষকে বলে, দুটো ধর্ম একই। হয়তো আমরা রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিকতা, নারী-ইস্যুসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করব; অথবা আমরা মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনযাপন করব। ফলে আমরা কোনো আধুনিকায়ন ও উন্নতি করতে সক্ষম হব না, যতক্ষণ না এ দ্বীনকে তার পবিত্র দায়িত্ব অর্থাৎ আবেগ-অনুভূতি পরিশুদ্ধ করার মাঝে সীমাবদ্ধ করব এবং ধর্মীয় ব্যক্তিদেরকে জীবনের সেসব বিষয় থেকে বিরত রাখব, যেখানে তাদের কোনো কাজ নেই।

.....

৩৬২. রাজনীতি আসলেই নোংরা ছিল; কেননা, তা আল্লাহর পন্থা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছিল না। কিন্তু আলিমদের কাজ ছিল এ রাজনীতিকে আল্লাহর পন্থায় ফিরিয়ে আনা, অর্থাৎ ইসলামি শরিয়াহ-শাসন বাস্তবায়ন করা। রাজনীতি নোংরা ও নিকৃষ্ট তার দোহাই দিয়ে একে দ্বীন থেকে দূরে সরানো নয়।

tauhiderdak.com

আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য ক্রুসেডাররা তাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে, প্রথমত শিক্ষা-সিলেবাসের মাধ্যমে ইসলামকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়ে পরিণত করে। অতঃপর মিডিয়ার মাধ্যমে একে শুধু কিছু মৌসুমি উৎসবে পরিণত করে, যার বাইরে অন্য কোনো বিষয়ে ধর্মের কথা বললে মানুষ তা গ্রহণ করত না। কেননা, ধর্ম তখন তার নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে কথা বলছে। এ ছাড়া ছিল প্রাচ্যবিদদের সংশয়, সেক্যুলারদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তাধারা, রাজনীতি, সমাজের নেতৃত্ব প্রদান, ইউরোপকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে নেওয়া এবং সেখানে ঘটা সবকিছু সঠিক মনে করা।

অবস্থা যেমনই হোক, ক্রুসেড-ইহুদি জোটের ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই রূপে চলতে থাকে, যা ছিল 'ধীর; কিন্তু নিশ্চিত কার্যকরী'। ফলে একসময় তারা হঠাৎ মুসলিম-বিশ্বে ইসলামি জাগরণে অবাক হয়ে যায়, যা তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল।

এখানে আমরা ইসলামি জাগরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না, এটা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য রেখে দিচ্ছি। তবে এখানে ঘটনার ধারাবাহিকতায় আমরা এতটুকু বলব, ইসলামি আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটে এবং রক্তাক্ত সংঘাতের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনের ক্ষমতা শেষ হয়। তবে তাদের তৈরিকৃত এজেন্টের হাতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও ইসলামি আন্দোলন নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে।

আর তখন আমেরিকা এসে প্রাচীন ইউরোপীয় উপনিবেশ বিলুপ্ত করে ইসলামি অঞ্চলে তার অবস্থান প্রতিষ্ঠা করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পতাকা হাতে তুলে নেয়। তাদের যুগে রাজনীতির খেলা একেবারে চূড়ান্তভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়। তারা ইসলামের সাথে যুদ্ধের জন্য নতুন দুটি মাধ্যম ব্যবহার করে, যা পূর্বে কখনো ব্যবহৃত হয়নি। প্রথমটি হলো সামরিক অভ্যুত্থান ও দ্বিতীয়টি হলো সমাজতন্ত্র।

tauhiderdak.com

সামরিক বিদ্রোহ ও সমাজতন্ত্রকে ইসলামের সাথে যুদ্ধে ব্যবহার করা

আমেরিকা বিশ্বমোড়ল হওয়ার পর মুসলিমদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিষ্টতা সৃষ্টির জন্য এ দুটি পদ্ধতিকে ভালোভাবে ব্যবহার করে। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে সামরিক বিদ্রোহকে কাজে লাগানো এই অঞ্চলে তাদের জন্য নতুন কিছু ছিল না। কেননা, তাদের সামনে আতাতুর্কের হাতে তুরস্কের পতনের অভিজ্ঞতা ছিল। সেখানে মূল চক্রান্ত করেছিল বৈশ্বিক ইহুদিরা। যেন সেই ইসলামি রাষ্ট্রের পতন হয়, যা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিয়ে আসছে।

এখানে আতাতুর্ক নিজেই দাওনামা ইহুদি হোক, যারা খিলাফত বিলুপ্তির পেছনে মূল কার্যকরী শক্তি ছিল, অথবা ভিন্ন কেউ। (কারণ, তার বাবার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। আহমাদ রেজা নামে যাকে তার বাবা বলা হয়, সে মূলত তার মায়ের স্বামী, বাবা নয়।) মোটকথা, সে যে-ই হোক, সে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আদায় করেছে। সে শুধু খিলাফত বিলুপ্ত করে ক্ষান্ত হয়নি, যা সেদিন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়েছিল; বরং মুসলিমদের হিংস্রভাবে দমন করে এবং হাজারো আলিম ও সাধারণ ব্যক্তিকে হত্যা করে। আরবি অক্ষর নিষিদ্ধ করে ল্যাটিন অক্ষরে তুর্কি ভাষা লেখার আদেশ দেয়; যাতে ভবিষ্যৎ-প্রজন্মকে ইসলামি ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। আরবি ভাষায় আজান নিষিদ্ধ করে। মানুষকে ক্যাপ পরতে বাধ্য করে; যাতে নামাজ পড়া কঠিন হয়। মুসলিম নারীদের হিজাব নিষিদ্ধ করে। মোটকথা বাস্তব জীবনে দ্বীনের সকল প্রভাব বিলুপ্ত করে। ইসলামি শরিয়াহ ও আদালত থেকে শুরু করে সবকিছুর ওপর আঘাত করেছে।

অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চক্রান্তের সময় ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সামনে এই অভিজ্ঞতা ছিল মূল পুঁজি। মিশরে আতাতুর্কের মতো যাকে এনেছে, সে ছিল জামাল আব্দুন নাসের। যে একই লক্ষ্যে একই দায়িত্ব পালন করেছে; যদিও দুই জনের কাজের মাধ্যমে কিছুটা ভিন্নতা ছিল।

জামাল আব্দুন নাসেরের যুগে ইসলামি আন্দোলন দমনে কঠিন নির্যাতন ও গণহত্যা শুরু হয়। মুসলিমরা এমন আজাবের শিকার হয়, ইতিহাসে যার নজির শুধু পাওয়া

tauhiderdak.com

যায় আন্দালুস থেকে ইসলাম ধ্বংসের জন্য গঠিত অনুসন্ধান আদালতে। এ অঞ্চলে শাসনের জন্য সামরিক ব্যক্তিদেরকে পশ্চিমারা নির্দিষ্টভাবে এই লক্ষ্যেই বাছাই করে। তেমনই সামরিক শাসনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, শক্তির মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনগণকে অনুগত করা; যাতে তারা ইসরাইলের সাথে সন্ধি মেনে নেয়।

তবে এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের সাথে যুদ্ধে আমেরিকা কীভাবে সমাজতন্ত্রকে ব্যবহার করেছে, তা নিয়ে আলোচনা করা।

অনেক বোকা ব্যক্তি মনে করে, এ অঞ্চলে সমাজতন্ত্রের প্রসারের পেছনে ছিল রাশিয়া। যা প্রমাণের লক্ষ্যে তারা বলে যে, তখন রাশিয়া এ অঞ্চলে নিঃসন্দেহে অনেক গভীরে অনুপ্রবেশ করে ফেলেছিল।

অথচ এই খেলাটি এতটাই নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করা হয়; যাতে মানুষ এই ধারণা করতে থাকে; যদিও এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাবসায়িক অনুষদের ব্যাচলরের ছাত্রদের জন্য মাস্টার্সের সিলেবাসে একটি বই ছিল। যার নাম ছিল 'তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির ধাপসমূহ', এর লেখক ছিল 'ওয়াল্ট রস্টো'। সে ছিল আমেরিকার হোয়াইট হাউসে অবস্থানকারী দুই ইহুদি ভাইয়ের একজন। তার কথার সারাংশ হচ্ছে,

এই অঞ্চলটি (মধ্যপ্রাচ্য[৩৬৩]) সমাজতন্ত্রের শিকার। কেননা, এখানে রয়েছে শাসনের অনিষ্টতা, বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে বিশাল পার্থক্য, মানুষের গড় আয়ের অনেক স্বল্পতা। তাই অবশ্যই মানুষের জীবিকা স্তর বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে পার্থক্য কমিয়ে আনা এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি বন্ধ করা আবশ্যক ছিল। আর কোনো রাষ্ট্রে শক্তিশালী অর্থনীতি গঠন করা ভারী শিল্প ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করা কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা, এটা থেকে দ্রুত লাভ অর্জিত হয় না; বরং বহু বছর লস খেতে হয়। যা কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই এই কাজটি অবশ্যই কোনো রাষ্ট্রকে করতে হবে।

.....

৩৬৩. মধ্যপ্রাচ্য পরিভাষাটি বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের একটি নির্দিষ্ট শব্দ, যা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ অঞ্চলে ইসরাইলের অস্তিত্বে কোনো ঘৃণা সৃষ্টি না করা। কারণ, এটা যদি ইসলামি অঞ্চল বা অন্তত আরব অঞ্চল নামে ভূষিত করা হতো, তাহলে এখানে কীভাবে ইসরাইলের অস্তিত্ব সম্ভব? কিন্তু যখন একে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হবে, যার কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই, তখন ইসরাইলের অস্তিত্ব কোনো ঘৃণা সৃষ্টি করবে না।

tauhiderdak.com

যার মাধ্যম হবে সাধারণ রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক খাত তৈরি করা, যা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে সকল ব্যক্তিগত খাতকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। আর এই সময়ের মাঝে অবশ্যই শক্তিশালী আঞ্চলিক নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে, যাদের পাশে জনগণ এসে ভিড় করবে। যাতে তাদের দৃষ্টি রাশিয়ার দিকে ধাবিত না হয়। যখন সে জাতির মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে, বিভিন্ন শ্রেণির মাঝে পার্থক্য কমে আসবে, তখন আবারও স্বাধীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক পুঁজিবাদ ফিরিয়ে আনা হবে আর ততদিনে জনগণ সমাজতন্ত্রের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে একে ঘৃণা করা শুরু করবে।

তাদের এই চক্রান্তের সাথে কি বাস্তবতার কোনো বৈপরীত্য আছে?!

তবে এখানে এমন একটি বিষয় রয়েছে, যা ওয়াল্ট রস্টো যখন হোয়াইট হাউজ থেকে এ অঞ্চলের জনগণের জন্য সমাজতন্ত্র আমদানি করছিল, তখন তার কল্পনায় আসেনি। যেহেতু সে এই অঞ্চলে বসবাস করেনি, তাই সে তার অফিসের টেবিলে বসে বিভিন্ন কিছু কল্পনা করছিল, যার সাথে বাস্তবতার সম্পর্ক নেই।

তা হলো, এই অঞ্চলে সমাজতন্ত্র আসার পর স্পর্শকাতর কারখানা ও সংস্থাগুলো জাতীয়করণ করা হয়। ফলে এখানের কর্মচারীরা সব রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তায় পরিণত হয়, যেভাবে পূর্বের শাসনকালে ছিল। তা ছাড়া সমাজতন্ত্রে সর্বদা এমন একটি শ্রেণি থাকে, যারা কোনো কাজ করে না; বরং তাদের চিন্তা থাকে বিভিন্ন গোয়েন্দাসংস্থা ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের নৈকট্যশীল হয়ে নিজ সাথি ভাইদের ওপর গোয়েন্দাবৃত্তি করা এবং রিপোর্ট লেখা।

যার ফলে সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্রীয় জিডিপির পরিমাণ বাড়েনি এবং দুর্নীতির সমাধান হয়নি; বরং চূড়ান্তভাবে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেউলিয়া হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে যায়। প্রতিবার যা ঋণের মাধ্যমে সমাধান করা হয়। যেই ঋণ অধঃপতনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

তবে এখানে মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, সমাজতন্ত্রের এই বিস্তৃতির পেছনে হোয়াইট হাউজের নির্দেশনা রয়েছে। তবে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্র প্রচার ছিল না; বরং এখানে আরেকটি বিষয় আছে, যা ছাড়া পুরো চিত্রটি স্পষ্ট হবে না।

সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য জনগণের উন্নতি করা ছিল না; বরং তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আরও ভয়াবহ। তা হলো, ইসলামের সাথে যুদ্ধ।

tauhiderdak.com

পশ্চিমাদের কাছে তখন ইসলামের সাথে যুদ্ধের জন্য চারিত্রিক অনিষ্টতা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যম ছিল না।[৩৬৪] কিন্তু সমাজতন্ত্রের হাতে ছিল।

সমাজতন্ত্র মানুষকে বলে, এটা হচ্ছে একটি আকিদা বা বিশ্বাস। আর বিশ্বাস সর্বদা মানুষের অন্তরে জাদুর মতো কাজ করে; যদিও তা বাতিল। কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষের ফিতরাতের মধ্যে বিশ্বাসের প্রতি টান সৃষ্টি করেছেন। ফিতরাত যখন সুস্থ থাকে, তখন আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়, যিনি আসমান-জমিন ও মানুষের স্রষ্টা—

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

'(স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রভু আদম-সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করে এনেছিলেন এবং তাদের থেকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তখন তারা বলেছিল, "হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।"'[৩৬৫]

কিন্তু যখন ফিতরাত নষ্ট হয়ে যায়, তখন মানুষ গাইরুল্লাহর বিশ্বাসের দিকে ধাবিত হয় এবং শিরকে পতিত হয়।

সমাজতন্ত্র তার অবস্থাদৃষ্টে মানুষকে বলে, তোমরা তোমাদের আকিদা ছেড়ে এই আকিদা গ্রহণ করো; কেননা, এটাই সঠিক আকিদা।

বাহ্যিকভাবে সমাজতন্ত্রকে মানুষের কাছে বিশেষত যুবকদের কাছে মনে হয়, এটাই জীবনের জন্য উত্তম লক্ষ্য। অন্যদিকে পশ্চিমা সংস্কৃতি বিকৃত ও নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সেখানে শুধু বস্তুগত উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোনো উত্তম লক্ষ্য নেই, যার জন্য মানুষ বাঁচবে। এটা এমন লক্ষ্য, যা মানুষের অন্তর তৃপ্ত করে না; এমনকি বর্তমান জাহিলিয়াতে মানুষের ভ্রষ্ট অন্তরও নয়। মূলকথা, ইউরোপ ও আমেরিকার যুবকদের কাছে সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে এটাই মনে হয়; যদিও সমাজতন্ত্রের শাসনের অধীনে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি কঠিন অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে বসবাস করে।

.....

৩৬৪. হ্যাঁ, সামরিকভাবে দমন-নির্যাতন তো আছেই। তবে এখানে আদর্শিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্র উদ্দেশ্য নিয়েছি।

৩৬৫. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ১৭২।

tauhiderdak.com

এ জন্যই সমাজতন্ত্র ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পথভ্রষ্ট নিকৃষ্ট পশ্চিমা সভ্যতার তুলনায় অধিক কার্যকরী। তা ছাড়া কমিউনিস্টরা তাদের চিন্তাগত গঠনের দিক থেকেও ইসলামের ওপর আক্রমণ ও দ্বীনের বিরোধিতায় অধিক কঠোর ও হিংস্র।

তাই তাদেরকে স্বয়ং আমেরিকার কর্তৃত্বের অঞ্চলে সমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচালনার ক্ষেত্রগুলোয় বসানো হয়। যেমন সাংবাদিকতা, মিডিয়া, টিভি-সিনেমা, নাটক, বই ইত্যাদি; যাতে তারা এসব ক্ষেত্রে থেকে ইসলামের সাথে যুদ্ধ করতে পারে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া উচিত।

এটা কীভাবে সম্ভব যে, আমেরিকা তার প্রধান শত্রুকে নিজ ইচ্ছায় তার নিজ কর্তৃত্বের অঞ্চলে ব্যবহার করবে। শুধু তা-ই নয়; বরং তাদেরকে এই লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা দেবে এবং নিজেদের দোসরদেরকে পর্যন্ত তাদের সাহায্য করার আদেশ দেবে?

অন্যদিকে এটা কীভাবে কল্পনা করা যায় যে, রাশিয়া এই খেলায় প্রবেশ করবে, যেখানে নিয়ন্ত্রণ তার হাতে নেই এবং সর্বশেষ ফায়দা তার হবে না; বরং তার শত্রু আমেরিকার হাতে যাবে?

যুক্তির বিচারে এটা একটি বিশাল বৈপরীত্য।

কিন্তু রাজনীতির বিচারে এটি স্বাভাবিক বিষয়। এটা মুসলিমদের জন্য ইতিহাসের এক স্পষ্ট নিদর্শন। বিশ্ব রাজনীতি এখন তাদেরকে চরকির মতো ঘুরাচ্ছে। কারণ, তারা বন্যার পানিতে থাকা খড়কুটার মতো। তাদের নিজেদের কোনো অক্ষ নেই; এমনকি কোন অক্ষকে কেন্দ্র করে থাকবে, তা বাছাই করার ক্ষমতাও তাদের নেই।

এখানে আমেরিকার অবস্থা বোঝার জন্য এই ঘটনাটি লক্ষ করুন—

তুরস্ক নিঃসন্দেহে আমেরিকার কর্তৃত্বের অঞ্চলে রয়েছে; কিন্তু একসময় আমেরিকা সেখানের যুবকদের মাঝে ইসলামি আন্দোলনের অস্তিত্ব টের পায়। ফলে ইসলামি আন্দোলনকে দমনের জন্য সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। অতঃপর তাদের স্বভাবগত নীতি অনুযায়ী সামরিক শক্তিকে সে অঞ্চলে এই দায়িত্ব পালনের আদেশ করে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে সাইপ্রাস যুদ্ধে স্বয়ং তুর্কি সামরিক বাহিনীর মধ্যে ইসলামি চেতনা জাগ্রত হয়ে যায়। যখন গ্রিস ট্যাংকগুলো মুসলিমদের গ্রামগুলো অবরোধ করে সেখানে খাবারপানি ও ওষুধ প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দেয়। ফলে সেখানে মহামারি ব্যাপক

tauhiderdak.com

আকার ধারণ করে। তখন তুর্কি বাহিনী ইসলামি চেতনা নিয়ে ক্রুসেড আক্রমণের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়ায়।

তখন আমেরিকা ব্যর্থ হয়। কারণ, সামরিক বাহিনী হচ্ছে ইসলামি আন্দোলন দমনের জন্য তাদের সবচেয়ে উত্তম অস্ত্র। কিন্তু যদি স্বয়ং বাহিনীর মধ্যে ইসলাম জাগ্রত হয়, তখন কী করার থাকে? তাই আমেরিকা তুর্কি প্রশাসনকে আদেশ দেয়, যেন তুর্কিতে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম উন্মুক্ত করে দেয়; যদিও পূর্বে তারা কঠিন বাধাগ্রস্ত ছিল। যাতে তারা ইসলামকে বাধা দিতে সাহায্য করতে পারে। তখন প্রকাশিত পত্রিকার তথ্যমতে কিছু মন্ত্রী এই আদেশের পক্ষে অবস্থান নেয় আর কেউ কেউ এই আদেশ প্রত্যাখ্যান করে। ফলে বিরোধীদেরকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অন্যদিকে রাশিয়ার অবস্থান স্পষ্ট হয় এই ঘটনা থেকে—

নব্বইয়ের দশকে চীন ও রাশিয়ার মাঝে যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব হয়, সেখানে দুই পক্ষের মাঝে বহু পালটাপালটি অভিযোগ চাপানো হয়। চীন রাশিয়াকে সবচেয়ে কঠিন যে অভিযোগ দিয়েছিল, তা হলো, তারা লেলিন-স্টালিনের আদর্শের সাথে গাদ্দারি করেছে। কারণ, তারা এমন প্রশাসনকে সাহায্য করছে, যারা আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যেমন মিশরের সরকারসহ এ অঞ্চলের আরও কিছু সরকার। রাশিয়া তাদের জবাব দেয় যে, তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ নয় যে, এসব প্রশাসন আমেরিকার অক্ষে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তারা মনে করে যে, এসব রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান করা এখান থেকে বাইরে থাকার তুলনায় উত্তম।

এটাই হচ্ছে খেলা। আমেরিকা কমিউনিস্ট কার্যক্রমকে তার কর্তৃত্বের অঞ্চলে ইসলামের সাথে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করে। তাদের হাতে মিডিয়া তুলে দেয়; যাতে তারা এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে এই শর্তে যে, তারা খেলার সীমার বাইরে বের হবে না এবং এই অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করবে না। কিন্তু যদি তারা নিজেদের ব্যাপারে ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে এই ধারণা করে যে, তারা অত্র অঞ্চলের সত্যিকারের শক্তির অধিকারী হয়ে গেছে এবং এর ভিত্তিতে কমিউনিস্ট বিপ্লব করে, তখন আমেরিকা এসে তাদের ধরে ধরে জবাই করবে—যেভাবে ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়া ও ১৯৭০ সালে সুদানে করেছে। কারণ, এই দুই অঞ্চলে কমিউনিস্টরা নির্ধারিত খেলার নিয়ম ভঙ্গ করেছিল। এ ছাড়া অন্যসব জায়গায় তারা শুধু আমেরিকার অনুমতি নয়; বরং তাদের নির্দেশনায় ইসলামের সাথে যুদ্ধ করে।

tauhiderdak.com

রাশিয়া এখানে তার দ্বিতীয় স্তরের অবস্থান মেনে নিয়েছে; কারণ, এটা তার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চল নয়। যে অঞ্চলগুলো তার ও আমেরিকার মাঝে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বণ্টিত হয়েছিল।[৩৬৬] এটা ছিল অতিরিক্ত কার্যক্রম, যা রাশিয়া দুই পক্ষের স্বার্থেই করত। কেননা, ইসলাম দুই পক্ষেরই শত্রু। তাই এই লক্ষ্যে দুই পক্ষের যে কেউ যদি কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করত, তখন অন্যপক্ষ সহযোগিতা ও সমর্থন করত। তেমনই রাশিয়া ভারতের সাথে চুক্তি করে আমেরিকার (ও তার ব্যক্তিগত) স্বার্থে পাকিস্তানকে বিভক্ত করেছে। তা ছাড়া বর্তমানে আফগানিস্তানে ইসলামের বিরুদ্ধে হিংস্র ও কঠিন যুদ্ধ করছে তার নিজ ও একই সময়ে আমেরিকার স্বার্থে।[৩৬৭]

এই খেলার জয়-পরাজয় নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কেননা, তা সর্বাবস্থায় ইসলামের শত্রুদের পক্ষেই যাবে। যারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে পরস্পর কঠিন যুদ্ধ করে। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে এসে নিজেদের ব্যক্তিগত সংঘাত ও পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে যায়। অতঃপর ইসলামের সাথে যুদ্ধ ও ইসলামকে ধ্বংসের লক্ষ্যে এক সারিতে এসে দাঁড়ায়।

বরং এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তের মাধ্যমগুলো বোঝা। 'কমিউনিস্ট যুগে' ইসলামের ওপর তাদের আক্রমণ ছিল অনেক কঠোর নিকৃষ্ট এবং পূর্বের তুলনায় অনেক বিস্তৃত।

কমিউনিস্টরা সরাসরি দ্বীনকে আক্রমণ করতে থাকে। অথচ পূর্বে এই আক্রমণ ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে করা হতো এবং সরাসরি ধর্ম নয়; বরং বিভিন্ন প্রথাকে আক্রমণ করা হতো। এখন স্বয়ং ধর্ম তাদের কাছে পশ্চাৎপদতা হয়ে যায়, যা ধ্বংস করে

.....

৩৬৬. আমেরিকা ও রাশিয়ার মাঝে অলিখিত চুক্তি হয়। যার মূল বক্তব্য হচ্ছে, আমেরিকা পূর্বপ্রাচ্যকে রাশিয়ার জন্য আর রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যকে আমেরিকার জন্য ছেড়ে দেবে; যদিও এখানে সেখানে কিছু অনুপ্রবেশ হয়েছে, তবে সেগুলো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।

৩৬৭. এসব কথা সেই সময় লেখা হয়েছে, যখন সবকিছু আমেরিকা ও রাশিয়ার মাঝে এভাবে চলমান ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্টদের পতনের পর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং আমেরিকা সাময়িকভাবে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নেয়। বর্তমানে এই অবস্থাও পরিবর্তনের দিকে। বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে আমেরিকার প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে এবং চীন ও রাশিয়ার আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতি একটি টার্নিং পয়েন্টে আছে। এখানে বিশ্বের প্রতিটি পক্ষই একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরির জন্য নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি অমীমাংসিত ও পরিবর্তনমুখী একটি অবস্থানে আছে। তবে অবশ্যই ইতিহাসের সেই যুগটাতে সার্বিক অবস্থা কীভাবে চলমান ছিল, তা উপস্থাপন করা জরুরি; যাতে সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বর্তমানের পথ চলতে পারি। তা ছাড়া খেলার চিত্র সময়ের পরিবর্তন হলেও ইসলামের সাথে শত্রুতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কখনোই পরিবর্তন হয়নি।

tauhiderdak.com

দেওয়া উচিত। অথচ পূর্বে ধর্মীয় ব্যক্তিদের কিছু চিন্তাধারাকে পশ্চাৎপদতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো এ বলে যে, এগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে ধর্মের সাথে যুক্ত করেছে।

এ ছাড়া সরাসরি ধর্ম নিয়ে কটূক্তি, আল্লাহ তাআলা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে মন্দচর্চা হতে থাকে।

কমিউনিস্টরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিছু সামগ্রিক দাবি করে, যেগুলোকে তারা ধর্মের ব্যাপারে কমিউনিস্ট দর্শন বা মতাদর্শ হিসেবে প্রসার করে। যাতে সর্বক্ষেত্রে ধর্ম নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায়। অতঃপর একসময় ধর্মের আসল চিত্র বিকৃত করার পর তা বিলুপ্ত করে দেওয়া যায়। মুসলিম-বিশ্বের কমিউনিস্টরা তাদের একই দাবি ও স্লোগান ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এগিয়ে আসে। যেমন, দ্বীন হচ্ছে তুচ্ছ বিষয়। মানুষের জীবনে দ্বীনের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। আধুনিকায়নের স্রোতে ধর্ম পৃথিবী থেকে মুছে যাবে... ইত্যাদি।[৩৬৮]

কমিউনিস্টদের হাতে ইসলামের ওপর আক্রমণ একই সাথে চিন্তাগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। তাদের মূল যুক্তি ছিল আধুনিকায়ন। যার ভিত্তিতে চিন্তা-চেতনা, সামাজিকতা ও রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে ধর্ম একটি পশ্চাৎপদ বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যা ধ্বংস করে ফেলা অবশ্যক।

তখন মূল বিষয় এটা ছিল না যে, ইসলামে কিছু চিন্তাধারা বা কিছু বিধান বা কিছু অবস্থান রয়েছে, যা আধুনিক-মনস্করা মেনে নিতে পারবে না, যে অবস্থা পূর্বে ছিল; বরং এখন বলা শুরু হয় যে, স্বয়ং ধর্মই হচ্ছে সমস্যা, যা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে একে মানুষের অন্তর থেকে মুছে দেওয়া, যথাসম্ভব মুসলিমদের নিঃশেষ করে ফেলা এবং যত মানুষকে সম্ভব ধর্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা আবশ্যক।

এই লক্ষ্যেই কমিউনিস্টদের সাথে মুসলিম-বিশ্বের শাসকদের জোট গড়ে ওঠে। মুসলিমদের জবাই করা ও ইসলামের সাথে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে। তারা যদিও এসব কাজের মাধ্যমে আমেরিকার স্বার্থ বাস্তবায়ন করছিল; কিন্তু একই সাথে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা হচ্ছিল। ইসলামবিরোধী বুদ্ধিজীবীরাও এসব সরকারের সাথে জোট করে। কারণ, তারা এসব শাসকের উপস্থিতিকে তাদের জন্য ইসলামি আন্দোলনের শক্তির হাত থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে মনে করে।

.....

৩৬৮. 'বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদসমূহ' বইয়ে 'সমাজতন্ত্র' অধ্যায়ে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

tauhiderdak.com

রাজনীতির এ খেলা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য হত্যাকারীদের ব্যাপারে মিথ্যা কিছু বীরত্বের তকমা লাগানো আবশ্যক ছিল। যখন তারা শিকারকে জবাই করবে, তখন যাতে এই বীরত্বের ছায়ায় তাদের অপরাধ ঢেকে যায়। যেমন আতাতুর্ক ছিল পরিকল্পিত বীর, যে খিলাফতের রাজধানীতে ইসলামকে জবাই করেছে এবং খিলাফত ধ্বংস করে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছে। মিশরের জামাল আব্দুন নাসেরকে অসংখ্য বীরত্বের তকমা লাগানো হয়; ফলে সে এর আড়ালে ইসলামি আন্দোলন ধ্বংস করে ইসরাইলকে নিরাপদ করেছে।

পুরো মুসলিম-বিশ্বে এমন বহু নকল বীরকে শাসনে বসানো হয়েছে, যারা মিথ্যা বীরত্বের ছায়ায় ইসলাম ধ্বংসের কাজ করেছে। আমরা তাদের ইতিহাস বর্ণনা করতে চাই না; বরং আমরা শুধু ইসলামের শত্রুদের মুসলিম-জাতিকে ধ্বংস করা এবং ইসলামকে মুছে দেওয়ার জন্য যে চক্রান্ত করে এসেছে, তা ধারাবাহিকভাবে জানার চেষ্টা করছি। আমরা তাদের চক্রান্তের কৌশলগুলো বোঝার চেষ্টা করছি, যেগুলো তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

আমরা অধ্যায়ের শেষে এসে পুরো আলোচনার সারসংক্ষেপ বের করছি। তা হলো, সামরিক যুদ্ধ বা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন অথবা মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত করতে শত্রুরা সর্বদা তাদের সমস্ত কৌশল ব্যবহার করে আসছে। কারণ, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনো আপনার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।'[৩৬৯]

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

'তারা (কাফিররা) তোমাদের সাথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের পারলে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নেয়।'[৩৭০]

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

৩৬৯. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১২০।

৩৭০. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ২১৭।

tauhiderdak.com

'তারা কোনো মুমিনের সাথে আত্মীয়তা বা চুক্তির মর্যাদা রাখে না। আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।'[৩৭১]

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ

'অনেক আহলে কিতাব তাদের কাছে সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরও নিজেদের ঈর্ষাবশত তোমাদেরকে ইমান গ্রহণের পর আবার কাফির বানাতে চেয়েছে।'[৩৭২]

وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا

'আপনার কাছে আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাজিল করা হয়েছে, নিশ্চয়ই তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে।'[৩৭৩]

অন্যদিকে শত্রুদের চক্রান্তের ফলে মুসলিমদের যে পরিণতি হয়েছে এবং তাদের ওপর যে হীনম্মন্যতা-দুর্বলতা চেপে বসেছে, এর দায়ভার শুধু তারাই বহন করবে। তারা দুনিয়ার জীবনে বা আখিরাতে রবের সামনে এই যুক্তি দিতে পারবে না যে, শত্রুরা তাদেরকে ধ্বংসের উপক্রম করেছিল এবং তাদেরকে চূড়ান্ত আক্রমণ করেছে; অথচ তাদের সামনে কোনো পথ খোলা ছিল না।

কারণ, শত্রুদের চক্রান্ত যত ভয়াবহ এবং যত অনিষ্টকর ও নিকৃষ্ট হোক, তা আজ বা কালের কোনো বিষয় নয়; বরং এই দ্বীন নাজিলের সময় থেকেই এই শত্রুতা চলে আসছে। কোথাও বন্ধ হলে অন্য কোথাও প্রজ্বলিত হয়।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নাজিলকৃত কিতাবে শত্রুদের অবস্থান ও তাদের চক্রান্ত এবং সর্বদা মুসলিমদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা সম্পর্কে জানানোর পর বলেছেন,

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

৩৭১. সুরা আত-তাওবা, আয়াত নং ১০।
৩৭২. সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং ১০৯।
৩৭৩. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৬৪।

tauhiderdak.com

'(তবে) তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।'[৩৭৪]

আয়াতে বর্ণিত ধৈর্য ও তাকওয়া কোনো তাবিজ নয়, যা মুসলিমরা গলায় পরিধান করলে কুফফারদের চক্রান্ত প্রতিহত হবে। তেমনই সবর ও তাকওয়া অন্তরের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় নয়, যা মানুষ আবেগ-অনুভূতির মাধ্যমে চর্চা করলে শত্রুর চক্রান্ত প্রতিহত হবে।

বরং সবর ও তাকওয়া হলো বিশাল এক শক্তি, যা ইতিবাচকতা ও কার্যকারিতা দ্বারা তাদের চক্রান্তকে প্রতিরোধ করে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায়।

মুসলিমদের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাদের জীবনের সব চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের মতো সবর ও তাকওয়ার বুঝও নষ্ট হয়ে গেছে। এটা তাদের নিকট নেতিবাচক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে, যা বাস্তবতার কিছুই পরিবর্তন করে না।

আমরা যদি সবর ও তাকওয়ার কাঙ্ক্ষিত মূল অর্থ এবং কীভাবে এ দুটো আঁকড়ে ধরা শত্রুদের চক্রান্তকে প্রতিরোধ করবে, তা বুঝতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে শত্রুরা কী চায়? তারা চায় মুসলিমদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে অথবা দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়ে ফেলতে।

তাহলে এখানে সবরের অর্থ হবে, এই দ্বীনের ওপর সবর করা। এই দ্বীনের সকল দায়িত্ব ও চাহিদাগুলো বাস্তবায়ন করে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকা। শত্রুরা যা-ই করুক, দ্বীনকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা। তাকওয়ার অর্থ হবে, আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধকে ভয় করা। যা অর্জিত হবে শুধুই আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। যখন এভাবে সবর ও তাকওয়া অর্জিত হবে, তখন শত্রুরা আমাদের কী করতে পারবে!! কীভাবে তারা আমাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে?

তারা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করেছে, তাদের আল্লাহর আদেশ পালনে ঘাটতি করার ফলে। এই ঘাটতি হতে পারে শক্তি প্রস্তুত থেকে বিরত থাকা, যে প্রস্তুতির আদেশ আল্লাহ দিয়েছেন। যাতে আল্লাহর ও মুসলিমদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা সম্ভব হয়। অথবা হতে পারে শক্তি প্রস্তুতের জন্য অর্থব্যয়ের যে আদেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

.....

৩৭৪. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১২০।

tauhiderdak.com

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

'তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পারো শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরও আতঙ্কিত রাখবে। যাদেরকে তোমরা চেনো না, আল্লাহ চেনেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা পুরোটা তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।'[৩৭৫]

অথবা এই ঘাটতি হতে পারে আমল ত্যাগ করা এবং শুধু অন্তরের ইমানের ওপর ভরসা করার দ্বারা।

অথবা হতে পারে জমিনকে আবাদ করা, জমিনের দিকে দিকে ঘুরে বেড়ানো এবং আল্লাহর নিয়ামত অর্জনের চেষ্টা ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা। এ ধারণায় যে, এভাবে দুনিয়া ত্যাগ করা মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী এবং আখিরাতে সফল করবে।

অথবা হতে পারে আল্লাহর আদেশকৃত ন্যায় ও ইনসাফ ছেড়ে দেওয়া; চাই তা হোক শাসন পরিচালনায় বা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বা সমাজে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে অথবা পুরুষ ও নারীর মাঝে পারিবারিক সম্পর্কে।

অথবা হতে পারে আল্লাহর নিষেধকৃত বিচ্ছিন্নতা ও দলাদলির কারণে।

অথবা হতে পারে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করার কারণে, যারা তাদের ব্যাপারে কোনো সম্পর্কের পরোয়া করে না।

অথবা হতে পারে, মুসলিমরা তাদের শেষ কয়েক শতাব্দীতে যে বিদআত, অপরাধ, কুসংস্কৃতি ও জাহিলিয়াতে লিপ্ত হয়েছে। যার ফলে আল্লাহ তাআলার অপরিবর্তনীয় রীতি তাদের ওপর বাস্তবায়িত হয়েছে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ যে সতর্কবাণী দিয়ে গিয়েছিলেন, তা আঘাত করেছে,

'সাওবান ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

.....

৩৭৫. সুরা আল-আনফাল, আয়াত নং ৬০।

tauhiderdak.com

«يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ»، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»

'খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্রিত হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে।' এক ব্যক্তি বলল, 'সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে?' তিনি বললেন, 'তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুটার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রতি আতঙ্ক দূর করে দেবেন এবং তিনি তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ভরে দেবেন।' এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, ওয়াহান কী?' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।'[৩৭৬]

ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় সেই সতর্কবাণী বাস্তবায়িত হয়, যা একই সাথে এই উম্মাহর আমানত বহনে অবহেলার কারণেও হয়েছিল, যেভাবে উহুদের দিন ঘটেছে, তেমনই একই সময়ে মুসলিমদের অপরাধের কারণেও এটা ঘটেছে,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ

'কী ব্যাপার! যখন তোমাদের ওপর একটি বিপর্যয় এল—যার দ্বিগুণ বিপর্যয় ইতিপূর্বে তোমরা (প্রতিপক্ষের জন্য) ঘটিয়েছিলে—তখন তোমরা বললে, "এটা কোথা থেকে এল?" (তাদেরকে) বলুন, "এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকেই এসেছে (তোমাদের কৃতকর্মের ফলেই এসেছে)।" নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। যেদিন দুটো দল (উহুদের

৩৭৬. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং ৪২৯৭।

tauhiderdak.com

যুদ্ধক্ষেত্রে) মিলিত হয়েছিল, সেদিন তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছিল।'[৩৭৭]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে আসা ব্যতীত মুসলিমদের মুক্তির আর কোনো পথ নেই। তারা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ইবাদত করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর থেকে চক্রান্তের প্রভাব দূর করে দেবেন এবং তাদেরকে সেই খিলাফত ফিরিয়ে দেবেন, যার ওয়াদা তিনি করেছেন। যা তাদের জন্য বাস্তবায়ন করেছিলেন, যখন তারা দ্বীনের পথে অবিচল ছিল। অতঃপর ছিনিয়ে নিয়েছেন, যখন তারা শর্ত ভঙ্গ করেছে—

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা বানাবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলিফা বানিয়েছিলেন; তিনি তাদের জন্য যে (ইসলাম) ধর্মকে পছন্দ করেছেন, তা তাদের জন্য অবশ্যই সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভয়ের পর এর পরিবর্তে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করবে না।'[৩৭৮]

.....

৩৭৭. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৬৫-১৬৬।

৩৭৮. সুরা আন-নুর, আয়াত নং ৫৫।

tauhiderdak.com

উপসংহার

মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের একটি ধারাক্রম আমাদের সামনে উপস্থিত। ইতিহাসে দীর্ঘ এক পরিক্রমায় নানামাত্রিক সংকট ও আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহ আজ এক অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহ আজ সেই পরিস্থিতি ও অবস্থার দিকেই যাত্রা করেছে, যেদিকে তারা চার বা তারও অধিক শতাব্দী আগে যাত্রা শুরু করেছিল। যেদিন থেকে মুসলিমরা আন্দালুস থেকে বিতাড়িত হয়েছে, সেদিন থেকেই এই যাত্রার সূচনা। আন্দালুস থেকে মুসলিমদের বিলুপ্তির পর খ্রিষ্ট-বিশ্ব মুসলিম-বিশ্বের সাথে নতুন এক ক্রুসেড যুদ্ধে এগিয়ে আসে। এই যুদ্ধ কেবল সামরিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনকেই এই যুদ্ধের প্রধান ময়দান বলা যায়।

একে একে প্রতিটি মুসলিম-দেশে ইউরোপীয় উপনিবেশ কায়িম হয়। ধ্বংস হয়ে যায় ইসলামি শাসন ও সমাজকাঠামো। যা আজও পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলিম-বিশ্ব মনে করতে লাগল যে, তারা ইউরোপীয় উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয়ে গেছে। কিন্তু এটা ছিল ভয়াবহ এক বিভ্রম ও ধ্বংসাত্মক আত্মতুষ্টি। অথচ তাদের সবচেয়ে বড়ো পরাধীনতাটা তখন থেকেই শুরু হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা, মিডিয়ামাধ্যম, সেক্যুলার নেতৃত্ব, সেক্যুলার শাসনব্যবস্থা, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, নারী-স্বাধীনতাসহ এমন কিছু মাধ্যম ইউরোপীয়রা এখানে প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেল, যেগুলো মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে সর্বদিক থেকেই পরাধীন করে রেখেছে। কিন্তু নির্মম পরিহাস হলো, প্রথম উপনিবেশকে মুসলিমরা পরাধীনতা হিসেবে দেখলেও রেখে যাওয়া পরবর্তী আধুনিক উপনিবেশকেই মুসলিমরা স্বাধীনতা বলে বিশ্বাস করে আছে। পরাধীনতাকে যখন পরাধীনতা হিসেবে না দেখা হবে; বরং এটাকেই স্বাধীনতা হিসেবে বিশ্বাস করা হবে, সংকটকে যখন সংকট হিসেবে না দেখে উন্নতির সোপান হিসেবে দেখা হবে, তখন আসলে উত্তরণের পথে হাঁটা অসম্ভব হয়ে যায়। এই অবস্থা থেকে আসলে কোনো জাতি উত্তরণ হতে পারে না। মুসলিম-জাতি আজ এই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

তাই মুসলিম-বিশ্বের জন্য সর্বপ্রথম জরুরি হলো, তারা যে সংকটে আছে এবং এই সংকট থেকে উঠে দাঁড়ানো যে তাদের জন্য ওয়াজিব—এই বোধ জাগ্রত করা।

tauhiderdak.com

পাশাপাশি তারা তাদের প্রধান সংকট যে বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো—এই সচেতনতা তৈরি করা।

আমরা যেই অধঃপতনে বসবাস করছি, এই অধঃপতন কয়েক বছরের তৈরি নয়; বরং এই অধঃপতন কয়েক শতাব্দীর তৈরি। তাও এমন পক্ষ থেকে এই অধঃপতনের চিহ্ন আঁকা হয়েছে, যারা আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই আক্রমণ করেছে এবং সবগুলোর কাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন এক রূপ দান করেছে। আমাদের পরিবারব্যবস্থাকে নারী-স্বাধীনতার নামে ধ্বংস করে দিয়েছে, আমাদের সমাজকাঠামোর রক্ষণশীলতাকে ধ্বংস করে লিবারেল সমাজে পরিণত করেছে, যেখানে আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের আমলকে উগ্রবাদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আমাদের শাসনব্যবস্থা থেকে আল্লাহর দ্বীনের অস্তিত্বকে মুছে দিয়ে সেক্যুলারিজমকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের উম্মাহকেন্দ্রিক ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করে সেখানে জাতীয়তাবাদের প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদে রূপান্তর করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে দ্বীন থেকে মুক্ত করে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা (সেক্যুলারিজম) দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, কত গভীর ও সুপ্রসারিত এক অধঃপতনে আমরা বসবাস করছি। এখান থেকে উত্তরণের জন্য শর্টকার্ট কোনো পথ নেই। এক সুদীর্ঘ, দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ ত্যাগ ও কুরবানির পথে আমাদের হাঁটতে হবে। যেই পথের শেষ হবে বিদ্যমান প্রতিটি কাঠামোকে আংশিক সংস্কারের মাধ্যমে নয়; বরং পরিপূর্ণ বিলুপ্ত করে ইসলামের কাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে। আর তা তখনই সম্ভব হবে, যখন উম্মাহ আধুনিক জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক এক জিহাদ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। সেই জিহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য আমাদেরকে কাজের ময়দানে নামতে হবে। (মুহাম্মাদ কুতুবের চিন্তায়) সেই কাজের ময়দানের সারসংক্ষেপ হলো :

১. দাওয়াত

পূর্বেও আমরা বলে এসেছি, ইসলাম আজ অপরিচিত হয়ে গেছে, যেভাবে ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত অবস্থায়। এই গুরবত বা অপরিচিতি তৈরি হয়েছে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের জাহালাত বা অজ্ঞতার কারণে। ইমান, আকিদা, আমল, চিন্তা-চেতনা প্রতিটি বিষয়েই মানুষ আজ অজ্ঞতায় বসবাস করছে। দ্বীন সম্পর্কে এই জাহালাতই হলো শত্রুদের প্রধান একটি প্রবেশদ্বার। আমাদেরকে এই প্রবেশদ্বার বন্ধ করতে হবে। দ্বীনের ব্যাপারে মানুষের যেই জাহালাত আর গাফলাত সেটাকে দূর করতে হবে। আর এর জন্য জরুরি হলো ব্যাপক দাওয়াতি কর্মসূচি।

tauhiderdak.com

সকল শ্রেণির মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পৌঁছতে হবে এবং তাদের সাথে দাওয়াতি সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। কারও কাছে একবার দাওয়াত নিয়ে যাওয়া এখানে ফলপ্রসূ নয়; বরং মানুষের কাছে আমাদেরকে এমনভাবে পৌঁছতে হবে যে, যেন তার সাথে দাওয়াতের সম্পর্ক তৈরি হয়। যেই সম্পর্কের চেইনে মানুষ যুক্ত থাকবে, বিচ্ছিন্ন হবে না।

২. তারবিয়াত

তারবিয়াত শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ। আমাদেরকে নববি তারবিয়াতি কর্মসূচির মাধ্যমে মুসলিম-প্রজন্মকে দ্বীনের ওপর প্রতিপালন করতে হবে এবং দ্বীনের জন্য প্রশিক্ষিত ও যোগ্য বানাতে হবে। এই তারবিয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য থাকবে, মুসলিমদের ভেতর যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করা এবং মুসলিম-সমাজের সদস্যদেরকে দ্বীনের জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষিত করে তোলা। তারবিয়াতের মাধ্যমে যদি আমরা কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব ও প্রজন্ম গড়ে তুলতে না পারি, তবে বিদ্যমান অধঃপতন থেকে আমাদের মুক্তি সম্ভব নয়।

৩. বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই

দ্বিতীয় ধাপের ক্রুসেডের প্রধান অঙ্গন ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন। উপনিবেশ আমলে ইউরোপীয়রা আমাদের সবচেয়ে বড়ো ক্ষতিসাধন করতে পেরেছে এই বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনেই। এবং দ্বিতীয় ধাপের ক্রুসেডের হামলার ধ্বংসশীল অবস্থা থেকে আজ শতাব্দীরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও আমরা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারিনি এবং পতন থেকে উঠে দাঁড়াতে পারিনি। এর অন্যতম কারণ হলো, বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব ও অধঃপতন। ক্রুসেডাররা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মাধ্যমে আমাদের চিন্তা-চেতনা থেকে ইসলামকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেখানে তাদের রচিত বিভিন্ন মতবাদকে সেট করে দিয়েছে। আর আমরা নিজেদের মনমগজে সেগুলোকে নিয়েই বসবাস করছি। যার দরুন আমাদের জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডগুলোও তাদের আঁকা ছকেই আটকে থাকছে। তাই আমাদের মজবুত এক বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে নামতে হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক এই লড়াইয়ে আমাদের পন্থা হবে আক্রমণাত্মক, প্রতিরক্ষামূলক নয়। প্রতিরক্ষামূলক অবস্থা দুদিক থেকে দুর্বল ও ক্ষতিকর। প্রথমত, প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান পশ্চিমা চিন্তার ভিতকে প্রশ্নবিদ্ধ ও ভেঙে দিতে পারে না; বরং তাদের তৈরি চিন্তাগত

ভিতকে ভিত্তি মেনেই বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই পরিচালনা করে। দ্বিতীয়ত, প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার সাথে আপস করতে শেখায় এবং ইসলামকে ক্রুসেডারদের চাপিয়ে দেওয়া চিন্তার আলোকে সংস্কার ও বিকৃতির পথে নিয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহ এই উভয় অভিজ্ঞতারই নির্মম শিকার হয়েছে।

তাই বুদ্ধিবৃত্তিক এই লড়াইয়ে আমাদেরকে আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। এই আক্রমণাত্মক অবস্থানের দুটি দিক। প্রথম দিক হলো, ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও একমাত্র সত্য হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে প্রাসঙ্গিক করে তুলে ধরতে হবে। এ ক্ষেত্রে উপস্থাপনায় প্রজ্ঞার ছাপ থাকবে; কিন্তু কোনো প্রকার সংযোজন, বিয়োজন ও বিকৃতি থাকতে পারবে না। দ্বিতীয় দিক হলো, আমাদের মনমগজে পশ্চিমা যেসব মতবাদ বসবাস করছে, সেগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে। সেগুলোর অসারতা ও অসত্যতাকে ইসলামের আলোকে বয়ান করতে হবে। আঘাত করতে করতে আমাদের চিন্তার দালান থেকে সেগুলোকে বিদায় করতে হবে।

আল্লাহর সুন্নাহ তাঁর গতিপথেই চলবে। একদিন মুসলিমরা তাদের দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে শক্তির ঘাঁটিতে অবস্থান করবে। জাহিলিয়াতের মুখোমুখি হয়ে তারা পবিত্র জিহাদ চালিয়ে যাবে। আল্লাহ মুমিন মুজাহিদদের সাহায্য করবেন তাদের থেকে অধিক সংখ্যক মুশরিকদের বিরুদ্ধে।

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ

‘তোমাদের জন্য সেই দুই দলের (ঘটনার) মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। (তাদের মধ্যে) একটি দল আল্লাহর পথে লড়াই করছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল কাফির। তারা নিজেদেরকে খোলা চোখে তাদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এর ভেতর চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।’[৩৭৯]

.....

৩৭৯. সুরা আলি ইমরান, আয়াত নং ১৩।

tauhiderdak.com

সাদা চামড়াদের আদর্শের দিন শেষ। অর্থনৈতিক অক্ষমতা, বস্তুগত আর জ্ঞানগত শক্তির অভাবের কারণে নয়। তাদের সভ্যতা মানবজীবনের জন্য সুস্থ, সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ পাথেয় বিনির্মাণে অক্ষম। এই পাথেয় পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই সরবরাহ করতে পারে। ঐতিহাসিক ক্রমধারা ইসলামের এক উত্থানের দিকেই যাত্রা করছে। অন্যদিকে বস্তুবাদী সভ্যতা অধঃপতনের পথ ধরে বসে আছে। আগামীর বিশ্ব ইসলামের। এটাই আল্লাহর সুন্নাহ ও কদর ইনশাআল্লাহ। আর আল্লাহর কদরের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই জগতে।

كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

'আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসুল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।'[৩৮০]

وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'নিজ কাজে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান; কিন্তু বহু লোক জানে না।'[৩৮১]

---

৩৮০. সুরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত নং ২১।

৩৮১. সুরা ইউসুফ, আয়াত নং ২১।

tauhiderdak.com

বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা আজ এক নিগৃহীত জাতি! আপন ভূমিতেও তারা আজ চিরশত্রুর নানান ষড়যন্ত্রের জালে বন্দী! ইসলামের সোনালি প্রজন্মের আদর্শ ও চিন্তাচেতনা থেকে বিচ্যুত হতে হতে তারা আজ অধঃপতনের চরম অবস্থায় নিপতিত! নিজেদের এই করুণ অবস্থার কথা আজকের মুসলিমরা স্বীকার করলেও তাদের অনেকেই কিন্তু ভাবে না, কেন আমাদের এই অধঃপতন!? আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো আসলে কী, যার ফলে আমরা এমন অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন!? আর কোনসব গুণের কারণে ইসলামের সোনালি যুগের আলোকিত মানুষগুলো পৃথিবীর বুকে সম্মানজনক অবস্থান লাভ করতে পেরেছিলেন? দ্বীনের পতাকাকে সুউচ্চে উড্ডীন করে মহান রবের বিধানমতেই পৃথিবী শাসন করেছেন?... কেন তাঁদের সাথে আজ আমাদের অবস্থার এত বিস্তর ফারাক?!

হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, আমরা যখন এই পার্থক্যটা অনুধাবনের চেষ্টা করব, আমাদের অধঃপতনের কারণগুলো জেনে নিজেদের সংশোধনের জন্য যথার্থ পথ-পদ্ধতি অবলম্বন করব, তখনই আমরা অধঃপতন থেকে উত্তরণ লাভের দিশা পাব। তো কীভাবে আমাদের অধঃপতন হলো, আমাদের ত্রুটি কোথায়, কারা আমাদের অধঃপতন কামনা করে, মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের ক্ষেত্রে বহিরাগত শত্রুরা কীভাবে কাজ করেছে এবং আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রগুলোকে টার্গেট করে ধ্বংস করেছে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই উঠে এসেছে বক্ষ্যমাণ বইটির পাতায় পাতায়...

tauhiderdak.com
RIHAMA PUBLICATION